DISCOURSE ON THE BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE

(WITH A BRIEF ACCOUNT OF THE LIVES OF THE FAMOUS BENGALI AUTHORS TOGETHER WITH SHORT CRITICISMS ON THEIR WORKS)

BY

RAMGATI NYAYARATNA.

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব।

(বিখ্যাত বাঙ্গালাগ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচনা সমেত)

শ্রীরামগতিন্যায়রত্নপ্রণীত।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৩০।

Price 3 *Rupees.* মূল্য ৩, তিন টাকা।

উৎসর্গপত্র।

পরমার্চ্চনীয়

৺হলধর চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য

পিতৃঠাকুরমহাশয়চরণেষু—

পিতঃ!

পূজ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, হিতৈষী ও আত্মীয়জনকে লোকে প্রিয়বস্তু দানকরিয়াথাকে। তোমার ন্যায় পরমপূজ্য, পরমশ্রদ্ধাস্পদ, পরমহিতৈষী ও পরমাত্মীয় ব্যক্তি জগতে আমার কেহই ছিল না। অতএব আমার অনেকপরিশ্রমের বস্তু এই 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'খানি তোমার স্বর্গীয়চরণোপান্তে সমর্পণ করিলাম ইতি। তাং ১২ই আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৯৫।

ত্বদীয় বৎসলপুত্র

শ্রীরামগতি দেবশর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, দেখিয়া ইহার কিয়দংশের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্ব্বে প্রচারিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে অবশিষ্টাংশের কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামে প্রকাশকরিয়া উভয় ভাগেরই অপর সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম। এই সমগ্র গ্রন্থ ৪টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষা কোন সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রথম পরিচ্ছেদে তদ্বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। বাঙ্গালা অক্ষরের সময়নিরূপণপ্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদঙ্কিত সমগ্রবিবরণী লিথোগ্রাফে মুদ্রিতকরিয়া এক এক খণ্ড এই পুস্তকমধ্যে নিবেশিত করিতে আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহাহইলে, সেই সময়ে এদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠকগণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসনখানি আর এক বার হস্তগত করিতে পারিলামনা! মজীলপুরের জমীদার শ্রীযুত বাবু হরিদাসদত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উহার একটী প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরণকরিয়াছেন, গ্রন্থের শেষভাগে আমরা উহা অবিকল মুদ্রিতকরিলাম। ত্রিবেণীর ৺ হলধরচূড়ামণিমহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠকরিয়াছিলেন। তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেননাই—অবুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যোজনা করিয়া দিয়াছেন। সন তারিখের স্থল অস্পষ্টই রহিয়াছে। এইরূপে উহার রচনা অনেক বিকৃত হওয়ায়, স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে অর্থ বুঝিতে পারা যায়না—এই জন্যই আমরা উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলামনা, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ যতদূর পারেন, উহার অর্থকরিয়া লইবেন। ঐ তাম্রশাসনে যে 'খাড়ীমণ্ডলী' শব্দ দেখিতে পাওয়ায়, অদ্যাপি সুন্দরবন মধ্যে ঐ খাড়ীপরগণা ও খাড়ীগ্রাম বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথমভাগ প্রচারিত হইলে পর কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র এবং কয়েকজন বিজ্ঞমহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্তকরিয়াছেন, তাহা আমাদের এই সামান্য পুস্তকের পক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহবর্দ্ধকই হইয়াছে। তবে কোন কোন মহাশয় ভাষার সময়নিরূপণ ও রূপান্তরতাপ্রাপ্তিবিষয়ে স্থলবিশেষে আমাদের মতের প্রতিকূলেও কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরাও যেমন কেবল যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ওবিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছি, প্রতিকূলবাদীরাও তাহাই করিয়াছেন। যেহেতু অন্য কোনরূপ প্রমাণদ্বারা উহাতে কিছু প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই। হইতে পারে যে, তাঁহাদের যুক্ত্যাদি আমাদের যুক্ত্যাদি অপেক্ষা প্রবল, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও আমাদের বিবেচনায় তাহা কোন মতে বোধহইলনা। অতএব আমরা নিরপেক্ষ পাঠক মহাশয়দিগকে মধ্যস্থ মানিলাম, তাঁহারা এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে আমরা আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন নামে তিনটী কালের কল্পনা করিয়াছি, এবং প্রথম হইতে চৈতন্য দেবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কালকে আদ্যকাল, চৈতন্যদেব হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপর্য্যন্ত কালকে মধ্যকাল এবং ভারতচন্দ্র হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কালকে ইদানীন্তনকাল নামে অভিহিত করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আদ্যকালোৎপন্ন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ, তাঁহাদের রচিত গীতসমূহের সঙ্ক্ষিপ্ত সমালোচন এবং ঐ কালে বাঙ্গালাভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল, বোধহইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক, বিদ্যাপতিবিরচিত গীতশ্রবণ এবং গোবিন্দ দাসকর্ত্তৃক চৈতন্যলীলাবর্ণন—এই উভয়ের প্রদর্শনদ্বারা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন লোক ছিলেন। অতএব সে বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় যাহা শুনিতেপাওয়াযায়, তাহা তত বিশ্বাসার্হ হয়না। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস উভয়ের ভণিতিযুক্ত ২। ৪টী কল্পিত গীত, যাহা শুনিতে পাওয়াযায়, অনেকে এই উপাখ্যান বলিয়া তাহার সমাধান করেন যে, 'রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিত্ব নিঃসৃত হইতনা। রাজা এই বিষয়

অবগত হইয়া সন্দেহভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহরুদ্ধ করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন; বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তরব্যপদেশে ঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে শূলে দেন, বিদ্যাপতি শূলবিদ্ধহৃদয় হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্দ্ধরচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর বহুকাল পরে (কাহারও মতে ১৪৮৯ শকে) গোবিন্দদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ সকল গীতার্দ্ধের পূরণ করেন, এই জন্য ঐ সকল গীতে উভয়ের ভণিতি দেখিতে পাওয়াযায়' ইত্যাদি—

যাহাহউক এই পরিচ্ছেদে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তসংক্রান্ত অধিক কথা বলিতেপারিনাই—যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও অনুমানমাত্রমূলক। কিন্তু গত ১০ই পৌষের সোমপ্রকাশে কোন পত্রপ্রেরক এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, "জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শুটির নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণজাতীয় ভবানন্দ রায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক হয়। উহাঁর প্রকৃত নাম বসন্তরায় —বিদ্যাপতি উপাধিমাত্র। উহাঁর রচিত পদাবলীর নাম বসন্তসুকুমার কাব্য। চণ্ডীদাসের ১৩২৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস বাইচী—ইহাঁরা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহাঁর রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামনি" ইত্যাদি— যাহাহউক, পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগের এই সকল উক্তি কতদূর প্রামানিক, তাহা আমরা জানিনা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কাহারও পদ্যরচনার কথা আমরা এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিনাই—কিন্তু ঐ কালে যে, আর কাহারও পদ্যরচনা ছিলনা, সে কথাও বলি নাই। প্রসিদ্ধ 'খনার বচন' সকল ঐ কালের পদ্য। যেরূপ প্রসিদ্ধি তাহাতে খনা রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নান্তর্গত মিহিরের পত্নী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময় প্রায় ২০০০ বৎসর হইল। এ প্রসিদ্ধি যদি সত্য হয়, তবে তৎকালোৎপন্না খনা যে, বাঙ্গালাভাষায় বচনরচনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব বোধহয়, এক্ষণকার প্রচলিত

খনার বাঙ্গালাবচনসকল খনার রচিত নহে—কাহারও কর্ত্তৃক সংস্কৃত বা প্রাকৃতাদি হইতে ভাষান্তরিত। কিন্তু সেই ভাষান্তরও যে, অল্পকালের নহে তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা এক ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়াছি যে, ১৩১৪ [১৪৯২ খৃঃ অ] শকে লিখিত এক বাঙ্গালা পুস্তকে খনার বচনার্থ সকল প্রকাশিত আছে—যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহারও বহুদিন পূর্ব্বে খনার বচন সকল প্রচলিত ছিল, বলিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্তবিবরণ, মধ্যকালোৎপন্ন কবি বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাসকবিরাজ, কৃত্তিবাস, (বা কীর্ত্তিবাস) কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ—কেতকাদাস, কাশীরামদাস, রামেশ্বরভট্টাচার্য্য ও, রামপ্রসাদসেন ইহাঁদের যথালব্ধ জীবনবৃত্ত ও ইহাঁদের রচিত চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থসকলের সমালোচনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে শিবসঙ্কীর্ত্তনের সমালোচনাশেষে আমরা কহিয়াছি "রামেশ্বররচিত আর কোন গ্রন্থ আছে বা ছিল কি না? তাহার সন্ধান পাওয়াযায় নাই" কিন্তু এখন্ আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহার রচিত একখানি সত্যনারায়ণ পুঁথি আছে। সেখানি শিবসঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষাও অধিক প্রচলিত এবং তাহাতেও অনুপ্রাসচ্ছটা প্রচুরপরিমাণে আছে।

রামপ্রসাদসেনের বিদ্যাসুন্দরসমালোচনাবসরে আমরা প্রাণরামচক্রবর্ত্তিপ্রণীত কালিকামঙ্গল পাই নাই লিখিয়াছিলাম, এবং ঐ পুস্তকের সন্ধান পাইবার বাসনায় কয়েকসপ্তাহ ব্যাপিয়া এডুকেশনগেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বাসনাপূরণ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি যে, গত ৫ই মাঘ হইতে ৪ সপ্তাহের এডুকেশনগেজেটে একজন পত্রপ্রেরক কালিকামঙ্গলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তবে ১৫৮৮শকে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলরচনার কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কালিকামঙ্গলরচনা সমাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সমগ্রভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু যখন্ এপর্য্যন্তও সে পুস্তক দেখিতে পাই নাই, তখন্ তদ্বিষয়ে এখনও কিছু বলিতে পারিলামনা।

চতুর্থ বা শেষপরিচ্ছেদে ইদানীন্তনকালপ্রাদুর্ভূত ভারতচন্দ্ররায়, দুর্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায়, নিধিরামগুপ্ত, রামবসু, হরুঠাকুর, মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কার, রামমোহনরায়, মদনমোহনতর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত,

দাশরথিরায়, ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারদত্ত, মাইকেলমধুসূদন দত্ত, ভূদেবমুখোপাধ্যায়, রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধুমিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ-বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি (লোকান্তরগত ও জীবিত) কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থকার মহাশয়ের বিস্তৃত বা সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে; বাঙ্গালাভাষার বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে; বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারের কথাও যথাস্থলে অভিহিত হইয়াছে; এবং পরিশেষে যে সকল গ্রন্থকারের বিষয়ে আমরা এক্ষণে বিশেষরূপে কিছু বলিতে পারিলাম না, তাদৃশ কতিপয় মহাশয়ের নামাবলীও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সমালোচনা পাঠকরিলে সমালোচ্যগ্রন্থদর্শনে পাঠকদিগের ইচ্ছা জন্মিতে পারে, কিন্তু অমুদ্রিত গ্রন্থের সমালোচনা করিলে তাঁহাদের সে ইচ্ছা সকলস্থলে চরিতার্থ হইতে পায়না। এই জন্য যে সকল গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সমালোচনা করিয়াছি, সমালোচনার বিশেষযোগ্য হইলেও অমুদ্রিত বলিয়া অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। মুদ্রিত গ্রন্থাদিও যে, অনেকেই অস্পৃষ্ট রহিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে 'শিশুবোধক' নামক পুস্তকখানি দেশমধ্যে বড়ই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় ইহা অতিশয় সমাদৃত ছিল। ইহাতে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষয়িক নানাবিধ জ্ঞানগর্ভক বিষয়ের উপদেশ আছে। শুভঙ্করদাস নামক (বোধহয়) কোন কায়স্থের রচিত অঙ্ক ও নানারূপ হিসাববিষয়ক আর্য্যা সকল ইহাতে নিবিষ্ট আছে এবং কবিকঙ্কণরচিত গঙ্গা-বন্দনা, কবিচন্দ্ররচিত কলঙ্কভঞ্জন ও দাতাকর্ণ, অযোধ্যারামকৃত গুরু-দক্ষিণা, এবং প্রহ্লাদচরিত ও চাণক্যশতক নামে কয়েকটী পদ্য আছে। পূর্ব্বে কেবল সেইগুলি অভ্যাস করিয়াই অনেকে বাঙ্গালাভাষায় কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। নিশ্চিত সময় বলিতে পারা না যাউক, কিন্তু ভাষাগত কোন কোন শব্দদর্শন করিলে, এদেশে মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার পর যে, শুভঙ্করের আর্য্যাসকল রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়।

ইদানীন্তনকালের মধ্যে কত কত মহাশয় যে, নানাবিষয়ক রচনা

করিয়া বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহার সঙ্খ্যা করা দুষ্কর। তন্মধ্যে কলিকাতার ঠনঠনেনিবাসী ৺লক্ষ্মীকান্তবিশ্বাসের ও শোভাবাজারনিবাসী ৺গঙ্গানারায়ণলস্করের পাঁচালী, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত তাঁবা গ্রামনিবাসী ৺পরমানন্দঅধিকারীর তুক্ক, মুর্শীদাবাদান্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাসী ৺রূপঅধিকারীর চপ্, বর্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপীগ্রামনিবাসী ৺রঘুনাথরায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও ৺নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয়ক গীত, উলুসে-গোপালনগরনিবাসী ৺মধুসূদনকাইনের কীর্ত্তন, বাঁশবেড়ে নিবাসী ৺শ্রীধরকবিরত্নের আদিরস সংক্রান্তগীত, ৺গোপালেউড়ে, শ্রীগোবিন্দচন্দ্রঅধিকারী, ৺বদনচন্দ্র অধিকারী, ৺নীলকমলসিংহ, ৺দুর্গাচরণষড়িয়াল, ৺মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত—এসকলও বাঙ্গালাভাষার পুষ্টিসাধনপক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই। আমরা বাহুল্যভয়ে এসমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।

অতঃপর আমার উপকারপ্রাপ্তিজন্য কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিবার অবসর। আমি এই পুস্তক সঙ্কলনবিষয়ে কত মহাশয়ের নিকট—কত বিষয়ে—কতরূপ যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং সেই সমস্ত সাহায্যদাতৃমহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতাস্বীকার করা একপ্রকার অসাধ্যব্যাপার। অতএব আমি বিনয়াঞ্জলিসহকারে একেবারে সাধারণ্যে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তকসম্পর্কে যে কোন মহাশয় যে কোন বিষয়ের জন্য আমার যে কিছু সাহায্য করিয়াছেন, আমি তদর্থ তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব; কখনও তাঁহার কৃত উপকার বিস্মৃত হইব না। কিন্তু এস্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুরনিবাসী পরমস্নেহাস্পদ শ্রীযুক্তবাবুরামদাসসেনের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ; কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সঙ্ঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছু মাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। তিনি এ পর্য্যন্ত বিলাপতরঙ্গ, কবিতালহরী ও কবিতাকলাপ নামে ৩ খানি পদ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই প্রধানপ্রধান সাময়িকপত্রে স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশকরিতেছেন। তিনি নিজ ভবনে একটী

উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয়করিতে পাওয়াযায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই পুস্তকের রচনাসময়ে আবশ্যক-বোধে যখন্ যে বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতে চাহিয়াছি, রামদাসবাবু আহ্লাদ ও আগ্রহসহকারে তখনই সেই পুস্তক আমাকে প্রদান করি-য়াছেন। অধিক কি, রামদাসবাবুর ঐ পুস্তকালয় নিকটে না থাকিলে বহরম্পুরে থাকিয়া এই পুস্তক রচনাকরা আমার পক্ষে কতদূর কঠিন হইত, তাহা বলিতে পারিনা।

পরিশেষে বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকট আমার বিনয়বচনে নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে, আমি এই গ্রন্থপ্রণয়নের জন্য সংবাদ সংগ্রহে সাধ্যমত যত্নকরিতে ত্রুটি করিনাই, কিন্তু এ প্রকার গ্রন্থ যেরূপ হইলে লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে, সেরূপ করিতে পারিয়াছি, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। ইহাতে বিস্তর ভ্রম—বিস্তর অসঙ্গতি —ও বিস্তর দোষ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিধ পুস্তকরচনাপক্ষে ইহা এক প্রকার প্রথম উদ্যম, অন্ততঃ এ অনুরোধেও যদি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই সকল ভ্রমাদি মার্জ্জনাকরেন এবং উপ-দেশবাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়াদেন, তাহাহইলে তাঁহাদের নিকট অপরিসীম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। ইত্যলম্।

বহরম্পুর কালেজ।
১২ই আষাঢ় সংবৎ ১৯৩০। } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য

বিষয়ক প্রস্তাব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যে ভাষাতে এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে ইহারই নাম বাঙ্গালা ভাষা। কোন্ সময়ে যে এই ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার নির্ণয় করা অতি দুষ্কর। যদি প্রাচীন কালের একজন বৃদ্ধ লোকের দেখা পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতাম, কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিহাসকে ঐরূপ প্রাচীন পুরুষ বলিয়া লোকে গণনা করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেরূপ ইতিহাসের একান্ত অসদ্ভাব।

অনেকে অনুমান করেন বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষা একদাই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে; সে অনুমান সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সমুদয় বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে। কামধেনু তন্ত্রে লিখিত আছে—

" অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্ব মুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু দক্ষিণরেখিকা ॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্ক শাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ ॥

ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তি রিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তি রিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণে মেতৎ কথিতম্" ইত্যাদি।

'এক্ষণে আমি ককারের তত্ত্ব নিরূপণ করিব। উহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা মহেশ্বর, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকারা অর্থাৎ আকুঁড়ি কুণ্ডলী নামক দেবতা এবং মধ্যস্থ শূন্য সদাশিব। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামা-নামে ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জেষ্ঠা নামে বিষ্ণুশক্তি এবং দক্ষিণ কোণে বিন্দু নামে রুদ্রশক্তি অবস্থিত আছেন। ককার ত্রিকোণ' ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনা বাঙ্গালা ককার ব্যতিরেকে দেবনাগরের ককারে কখন সঙ্গত হয় না। কারণ উহা (क) ত্রিকোণ নহে। তন্ত্রে অপরাপর বর্ণেরও এইরূপ বিবরণ আছে। সুতরাং স্মৃতি ও রামায়ণাদির ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রকে অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা অক্ষরও অতি প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তন্ত্রের ভাষা ও বর্ণিত বিষয়াদির পর্য্যালোচনা করিয়া এক্ষণে অনেকেই তন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গ্রন্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহাই হউক কোন কোন তন্ত্র খুব আধুনিক হইতে পারে কিন্তু সকল তন্ত্রই যে তত আধুনিক তাহা বোধ হয় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 'দীক্ষাতত্ত্ব' নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। দীক্ষা

তান্ত্রিক সংস্কার—বৈদিক নহে। ঐ পুস্তকে তিনি বীর-তন্ত্র যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন আকবর সাহের সমসাময়িক—অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত—বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রঘুনন্দনের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকিলে তিনি অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব মধ্যে দীক্ষা-তত্ত্ব লিখিতে যাইতেন না। আমাদের দেশে—যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, সেখানে—যে অতি অল্পকালের মধ্যেই কোন গ্রন্থ বিশেষরূপে প্রচলিত হইবে তাহা সম্ভব-পর নহে। অতএব রঘুনন্দনের অন্ততঃ ৫।৬ শত বৎসর অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে যে তন্ত্র-শাস্ত্রের সুতরাং তন্ত্রবর্ণিত বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়া-ছিল তাহা এক প্রকার স্থির হইতেছে।

সুন্দরবনস্থ ভূমির মধ্যহইতে কখন২ যে সকল তাম্র-ফলক পাওয়া যায়, তাহার একখানি দর্শন করা গিয়াছে। উহা রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাধিকারকালে কোন ব্রাহ্ম-ণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দপত্র স্বরূপ। উহা কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকে লিখিত। কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগর নামক গ্রামের কোন জমীদার উহা পাইয়াছিলেন; উহার অক্ষর এরূপ নূতনপ্রকার যে, অনেকে উহা পাঠ করিতে পারেন নাই। সেই অক্ষর না দেবনাগর না বাঙ্গালা।

কতকগুলির দেবনাগরের, ও কতকগুলির বাঙ্গালার সহিত সাদৃশ্য আছে। অতএব অনুমান হয় উহা দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর উৎপন্ন হইবার সন্ধিকালে লিখিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইল, অতএব এক প্রকার স্থির করা যাইতে পারে যে, ঐ সময়েই দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দেবনাগর হইতেই যে বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অদ্যাপি দেখা যায়—

ग	घ	ङ	ड	थ	न	प	म	य	श
গ	ঘ	ঙ	ড	থ	ন	প	ম	য	শ

প্রভৃতি বর্ণগুলি উভয় বর্ণমালাতেই প্রায় অবিকল এক রূপ। দেবনাগর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দেশ ব্যাপক ও অতি প্রাচীন বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা কেবল এই দেশেই প্রচলিত এবং আধুনিক বলিয়াই উহাকে সকলে জানে, সুতরাং বিপরীত অনুমান সঙ্গত হয় না। এক্ষণকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহাই যে প্রাচীনকালের বাঙ্গালাঅক্ষর নহে তদ্বিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার

অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (বোধ হয় ত্রিহুটে) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ২ সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বিভিন্নপ্রকার; ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখাযায়—যথা অন্তঃস্থ বকার (র) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ৰ) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গালা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই. এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের সাবেক গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'করপারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।

যাহাহউক সর্ব্বপ্রথমেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা বর্ণমালা যুগপৎ সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। উপরিভাগে যেরূপ লিখিত হইল তাহাতে বোধ হয় অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে সুতরাং বাঙ্গালা ভাষাও ঐ সময়েই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত কথাই কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা—সুতরাং সেই অনুমানের ব্যাপ্তিগ্রহে যদি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে আমূলতঃ সমুদয়ই মিথ্যা হইয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধেরা অনুমানকে প্রমাণ বলিয়াই গণ্য করেন

না—স্থতরাং অগণ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় নিশ্চয় করিতে যাওয়া খুব ভাল কাজ হইল না, বুঝিয়াও উপায়ান্তরাভাবে নিম্নলিখিত বিষয়েও আবার তাহারই অনুসরণ করিতে হইল।

সে বিষয়টী এই—বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে?—ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া কহিয়া থাকেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ইরাণ দেশে (প্রাচীন পারস্থে) এক প্রকার ভাষা ছিল, তাহা ইউরোপে যাইয়া রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক লাটিন, গ্রীক, জর্ম্মন্ প্রভৃতি এবং আসিয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ প্রকারে সংস্কৃত ও জেন্দ (প্রাচীন পারস্থ) ভাষার উৎপাদন করিয়াছে। উক্ত সমুদয় ভাষাকে এক্ষণে সাধারণতঃ এরিয়ান্ অর্থাৎ আর্য্যভাষা কহে। আর্য্যভাষা সকলের বর্ণমালা, উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন, ধাতু, উপসর্গ প্রভৃতির অনেকাংশে চমৎকার-জনক সাদৃশ্য আছে—এরূপ সাদৃশ্য যে, অনেক স্থলে বোধহয় যে, একই কথা কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় বলিয়াই কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ শুনায়। প্রফেসর্ বপ্, মাক্স মুলর্, মিউর্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ভূরি২ প্রমাণসহকৃত বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব ইহার প্রামাণ্যার্থ,মাদৃশ অদূরদর্শী লোকের বৃথা বাগাড়ম্বর কেবল ধৃষ্টতা প্রকাশ মাত্র। অতএব তদ্বিষয়ে বিরত হইয়া কেবল উদাহরণ

স্বরূপ কয়েকটী আর্য্যভাষার একবিধ কথা নিম্নভাগে প্রদর্শন করিলাম।

সংস্কৃত।	জেন্দ্।	গ্রীক্।	লাটিন্।
প্রথমা	ফ্রাথিমা	প্রোত্ম	প্রাইমা
দ্বিতীয়া	বিত্যা	দিউতেরা	”
তৃতীয়া	থ্রিত্যা	ত্রিতা	”
ষষ্ঠী	”	হেক্তা	সেক্ষ্টা
সপ্তমী	হপ্তমা	হেব্দমা	সেপ্তিমা
অহম্	আজেম্	”	”
ত্বম্	তুম্	”	তু
দন্তম্	”	অদন্ত	দেন্তেম্
নক্তম্	”	নক্তম্	নক্তম্
নামন্	নাম	অনমা	নোমেন্
মাতৃ	মাদর্	মাতর্	মাতর্
পিতৃ	পদর্	পাতর্	পাতর্
ভ্রাতৃ	ব্রাদর্	ফ্রাতিয়া	ফ্রাতর্
দুহিতৃ	দোখ্তর্	থুগাতর্	”
দ্বি	দো	দুও	দুও
পঞ্চন্	পঞ্চ	পেন্চি	”
দশন্	”	দেকী	দেশেম্
ইত্যাদি	ইত্যাদি		

এই সমস্ত ভাষাকে প্রধানভাষা অথবা ইঙ্গরেজিতে ক্লাসিক্যাল্ ল্যাঙ্গোএজ্ কহে। ইঙ্গরেজি স্বয়ং ক্লাসিক্যাল্ নহে। উহা লাটিন্ গ্রীক্ সাক্সন্ প্রভৃতি নানা ভাষার সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটী উদাহরণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, উহাতেও সংস্কৃতসম শব্দের বহুল অন্তর্নিবেশ আছে—যথা।

সংস্কৃত	ইঙ্গরেজি	
স্থা	ষ্টে	Stay.
গো	কৌ	Cow.
উক্ষা	অক্স	Ox.
কেন্দ্র	সেণ্ট্র	Centre
ত্রিপদী	ত্রিপদ্	Triped.
হোরা	আউয়ার্	Hour.
মানব	মান্	Man.
নস্	নোস্	Nose.
ত্রিকোণ	ত্রিগণ্	Trigon.
দ্বৈধ	ডাউট্	Doubt.
স্বসৃ	সিষ্টর্	Sister.
দ্বিপদ	বাইপদ্	Biped.
নাভি	নেভেল্	Navel.
নাবী	নেবি	Navy.
নূ	নিউ	New.
ঘাস	গ্রাস্	Grass.
উপরি	অপর্	Upper.
বিবাদ	ডিবেট্	Debate

সংস্কৃত	ইঙ্গরেজি :	
রূঢ়	রুড্	Rude.
অন্তর	ইণ্টর্	Inter.
জ্ঞা	(ক্নো) নো	Know.
সর্প	সর্পেণ্ট্	Serpent.
অক্ষ	অক্জিল্	Axle.
দ্বার	ডোর্	Door.
মূষা	মৌস্	Mouse.
অন্ত্র	এণ্ট্রেল্স্	Entrails.
পথ	প্যাথ্	Path.
উলূক	আউল	Owl.

C. &c.

কোরাইওলেনস্, রোমিয়স্, জুলিয়স্, ব্রুটস্ ইত্যাদি স্থলে শেষে যে স্ কার দৃষ্ট হয়, অনেকে কহেন উহা সংস্কৃতের প্রথমাবিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন পদের অন্তভাগের অনুরূপ—অর্থাৎ সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমাবিভক্তির একবচনে স্ কারাগম হয়, যথা রাম শব্দে 'রামস্'; পরে ঐ সকার বিসর্গ হইয়া 'রামঃ' হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে কোরাইওলেন, রোমিয়, জুলিয় ও ব্রুট ইত্যাদি অকারান্ত শব্দই প্রথমে ছিল; পরে উহা প্রথমাবিভক্তিযুক্ত হইয়া ঐরূপ সকারান্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে সেই প্রথমান্তপদসকলই শব্দরূপে পরিগণিত হইয়াগিয়াছে। যাহাহউক, এ সকল দুর্বিগাহ বিষয়ে অবগাহন চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনেকে কহিয়াথাকেন যে, সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার জননী—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালা-ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না—'বোধহয়না'র অর্থ এই যে, বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে কিন্তু পরম্পরাসম্বন্ধে। সংস্কৃত গ্রন্থগণের মধ্যে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। বেদের সংস্কৃত দুরূহ, দুরুচ্চার্য্য ও শ্রুতিকটু। শ্রুতিকটু ভাষা সাধারণের প্রীতিকর না হওয়াতে রামায়ণ, সংহিতা, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য ও সুকোমল ভাষায় ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। এমন কি পশ্চাদুল্লিখিত গ্রন্থসকলের ভাষা ও বেদের ভাষা এরূপ বিভিন্ন যে, উহাকে যেন একভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। এক্ষণকার প্রচলিত ব্যাকরণসকল ও প্রচলিত সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদের ভাষাবোধে সম্যক্ অধিকারী হওয়াযায়না। প্রাচীন পাণিনীয় ব্যাকরণে বেদভাষাবোধার্থ 'বৈদিকপ্রক্রিয়া' নামে একটী পৃথক্ প্রকরণ আছে। বর্ত্তমানকালে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির তাদৃশ চর্চ্চা না থাকায় উহা সচরাচর অধীত হয় না এবং আধুনিক ব্যাকরণসমস্তে ঐ ভাগ একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুগ্ধবোধকার বোপদেবগোস্বামী সর্ব্বশেষে একটী সূত্র দিয়াছেন—

"বহুলং ব্রহ্মণি"

যদিদং লৌকিকপ্রয়োগব্যুৎপত্তয়ে লক্ষণ মুক্তং তদ্বৈদিক প্রয়োগঃ ব্যুৎপত্তৌ বহুলং জ্ঞেয়ং কুচিদ্বিহিতং নস্যাৎ, ক্বচিন্নিষিদ্ধং স্যাৎ, কচিদ্বাস্যাৎ কচিত্ততোঽন্যস্যাপীত্যর্থঃ—পূর্ব্বেভিঃ ব্রাহ্মণাস্ ইত্যাদৌ বেদসিদ্ধেঃ।"

'লৌকিক প্রয়োগ সিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল সূত্র কথিত হইল, বৈদিকপ্রয়োগে তত্তৎ সূত্রের অনেক বিপরীত কার্য্যও সম্পাদিত হইবে—অর্থাৎ কোন স্থলে বিহিত কার্য্যও হইবে না—কোন স্থলে নিষিদ্ধ কার্য্যও হইবে—কোন স্থলে বিকল্পে হইবে ইত্যাদি—যথা-পূর্ব্ব শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'পূর্ব্বৈঃ' না হইয়া 'পূর্ব্বেভিঃ; ব্রাহ্মণ শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'ব্রাহ্মণাঃ' না হইয়া 'ব্রাহ্মণাস্' ইত্যাদি—

যাহাহউক ইহা স্পষ্ট বোধহইতেছে যে, অতি দুশ্রব ও দুরুচ্চার্য্য বলিয়া বেদের ভাষা সাধারণের ব্যবহার্য্য হয় নাই এবং এমন কি স্ত্রী শূদ্রাদির যে, বেদপাঠে বা বেদাকর্ণনে অধিকার পর্য্যন্ত নাই, বোধহয় ভাষার কাঠিন্য ও তাহার অন্যতর কারণ হইতেপারে। ফলতঃ বেদের সংস্কৃত কঠিন বলিয়া যেরূপ সাধারণের ব্যবহারার্থ পুরাণাদির কোমল সংস্কৃত সৃষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপ উক্ত পুরাণাদির সংস্কৃতও জন-সাধারণের দুরুচ্চার্য্য বোধ হওয়াতে উহাহইতেও কোমলতর প্রাকৃতভাষার সৃষ্টি হইয়াথাকিবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধহইবে যে, উক্ত উভয় ভাষা

সর্ব্বাংশে অবিকল একরূপ। অর্থাৎ—ঐ দুই ভাষায়, কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া, রচনাপ্রণালী প্রভৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, কেবল স্থানে স্থানে শব্দবিশেষের বর্ণগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্টহয়। যথা প্রতিকূলঃ=পড়িউলঃ; রাজা=রাআ; চন্দ্রম্=চন্দম্; ভবন্তি=হোন্তি ইত্যাদি—

হেমচন্দ্র নামক প্রাচীনপণ্ডিত প্রাকৃত শব্দের এই অর্থ করেন—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃত-মূলকমিত্যর্থঃ।

'সংস্কৃত প্রকৃতি অর্থাৎ মূল, তাহা হইতে উৎপন্ন এই অর্থে প্রাকৃত—অর্থাৎ সংস্কৃতমূলক'। কিন্তু এ অর্থ আমাদিগের তাদৃশ প্রীতিকর বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ (Refined) এবং প্রাকৃত শব্দের অর্থ সাধারণ (Common) সংস্কৃত কোন সময়ে স্থল বিশেষে চলিতভাষা ছিল, যদি এরূপ স্থির করাযায়, তাহা হইলে ইহাও স্থির করিতেহইবে—উহা কেবল কৃতবিদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ লোকে উহার সম্যক্ উচ্চারণাদি করিতে পারিত না। প্রাকৃতলোকেরা ঐ সংস্কৃতকে অপভ্রংশিত করিয়া যে ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই 'প্রাকৃত ভাষা' নামে এক ভাষা হইয়া গিয়াছে।

কৃতবিদ্য ও সাধারণ লোকদিগের ভাষা যে অনেকাংশে

বিভিন্ন হয়, তাহার প্রামাণ্যার্থ অন্যত্র যাইতে হইবে না—আমাদিগের নিজের ভাষা এবং আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের এবং প্রতিবাসী ইতর জাতীয়দিগের ভাষার প্রতি অভিনিবেশসহকারে কর্ণপাত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ সকল ভাষার বাস্তবিক স্বরাদিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে—কেবল সততশ্রবণজন্য অভ্যাসবশতঃ আমাদিগের তাহা বুঝিতে ক্লেশ বোধহয় না। সংস্কৃত নাটকেও অবিকল এই ব্যবহার দৃষ্ট হয়—যেখানে রাজা, মন্ত্রী, তপস্বী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুরুষেরা সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, সেই স্থলেই তপস্বিনীভিন্ন স্ত্রীজাতি ও ভৃত্যপ্রভৃতি সাধারণ লোকেরা স্ব স্ব পদোচিত প্রাকৃতভাষায় কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে।

সংস্কৃত যেরূপ অতিপ্রাচীন বলিয়া প্রথিত, প্রাকৃত তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখমাত্রও নাই। ইহাতে বোধহয় তৎকালে উহার সৃষ্টিই হয় নাই। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, উহার সৃষ্টি ও ক্রমশঃ প্রবলরূপে প্রচলন আরম্ভ হইলে উহার ব্যাকরণেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। বররুচি, শাকল্য, ভরত, কোহল, বৎসরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাকৃতব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে বররুচি-কৃত ‘প্রাকৃতপ্রকাশ’কেই সর্ব্ব প্রথম প্রাকৃতব্যাকরণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

যেরূপ প্রসিদ্ধি তাহাতে বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় ১৯৩০ বৎসর হইল। সুতরাং প্রাকৃতপ্রকাশ যদি ঐ সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহাহইলে তাহার অন্ততঃ ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যে প্রাকৃতভাষার সবিশেষ প্রচার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। খৃষ্টের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজার অধিকারকালে এণ্টিওকস্ প্রভৃতি যে গ্রীক্ রাজাদিগের বিবরণ প্রস্তরাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার ভাষাও একপ্রকার প্রাকৃত—সুতরাং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুমান হইতেপারে যে, তৎকালে প্রাকৃতভাষাই দেশমধ্যে চলিত ভাষা ছিল, এবং তাহা হইলেই উহা যে, প্রদেশভেদে মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহা বিলক্ষণ সম্ভবপর বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র যে, অর্দ্দমাগধী বা পালীভাষায় লিখিত, উহাও একপ্রকার প্রাকৃত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ ভাষা প্রথমে পল্লীগ্রামের লোককর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল, এজন্য উহার নাম পালী হইয়াছে।

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত অনেক সহজ। সংস্কৃতে ষত্ব ণত্বের যে প্রকাণ্ড কাণ্ড আছে, প্রাকৃতে সে গোলযোগ কিছুমাত্র নাই—প্রাকৃতে সর্ব্বস্থলেই (সাধারণতঃ) এক দন্ত্য সকার, এক মূর্দ্ধন্য ণকার এবং এক বর্গীয় জকার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আধুনিক অপরাপর ভাষার ন্যায়

প্রাকৃতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই, কেবল একবচন ও বহুবচন। ইহার রচনাপ্রণালীও যে সহজতর, তাহা মহাকবি কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন—

দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥

কুমারসম্ভব ৭ম সর্গ।

'সরস্বতী দুইপ্রকার পদাবলী দ্বারা হরপার্ব্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। সংস্কৃত দ্বারা হরের এবং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধন অর্থাৎ প্রাকৃতদ্বারা পার্ব্বতীর।'

সে যাহাহউক, এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রাকৃতভাষাই বাঙ্গালার জননী; সংস্কৃত উহার জননী নহেন—কিন্তু মাতামহী। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কঠিন ও দুশ্রব ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না, এই জন্য সেই ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতাসম্পাদন করায় ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উঠে। ঐ শিথিলতাকরণ দুইপ্রকারে সম্পন্ন হয়—এক প্রকার সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়প্রকার বিপ্রকর্ষণ। নদ্যাদি শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ এবং 'ধর্ম্ম' শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। এই সম্প্রসারণ বিপ্রকর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা দুরুচ্চার্য্য ভাষার সুখোচ্চার্য্যতা সম্পাদিত

হয়—নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সময়ে, অনেক স্থলেই যে, সেই ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি
অহম্	অহম্মি	আমি
লবণ	লোণ	নূন
প্রস্তর	পত্থর	পাথর
শ্মশান	মসাণ	মশান
গৃহ	ঘর	ঘর
স্তম্ভ	খম্ভ	থাম্বা
চক্র	চক্ক	চাক বা চাকা
কার্য্য	কজ্জ	কাজ
অদ্য	অজ্জ	আজ
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা
বৎস	বচ্ছ	বাছা
কার্ষাপণ	কাহাবণ	কাহণ
হস্ত	হত্থ	হাত
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজুলী
দংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া
বহিঃ	বাহির	বাহির
বধূ	বহু	বৌ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ্
বৃদ্ধ	বুড্ঢ	বুড়া
জ্যেষ্ঠ	জেট্ঠ	জেঠা
ভক্ত	ভত্ত	ভাৎ
স্নান	হ্নাণ	নাহা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ্
উপাধ্যায়	উবজ্ঝাঅ	ওঝা
যষ্টি	লট্ঠী	লাঠী

ইত্যাদি।

ভাষার পরিবর্ত্তসময়ে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ কার্য্যই কেবল হইয়াথাকে তাহা নহে, অনেক স্থলে নূতন বর্ণের আগম—কোন স্থলে বর্ণবিশেষের লোপ এবং স্থলবিশেষে কোন কোন বর্ণের অন্যথাভাবও হইয়া থাকে। উপরিপ্রদর্শিত শব্দসকল মধ্যেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ প্রণালীবিদ্ধ নিয়মপদ্ধতি পাওয়াযায়, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়াযায় না। সুতরাং কি প্রণালীতে ও কি ক্রমে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে, তাহা নিরূপণকরা অতি দুরূহ ব্যাপার! বোধ-

হয় কেবল প্রাকৃতই বর্ত্তমান বাঙ্গালার উপাদান নহে। দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া থাকে, আমাদের শাস্ত্রকারেরাও সে কথা কহিয়াথাকেন যথা—

বাচোযত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তর মুচ্যতে ॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত ব্রহ্মমনুবচন।

"যেদেশে ভাষার বিভিন্নতা হয়—গিরি বা মহানদী যাহাতে ব্যবধান থাকে, তাঁহাকে দেশান্তর কহা যায়।" সুতরাং যৎকালে বঙ্গদেশে কোনরূপ প্রাকৃতভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, বোধহয় তৎকালে এদেশের জনসাধারণের ব্যবহারার্থ কোন এক আদিমভাষা ছিল। সেই ভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হইয়া এই বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্যাপি এই ভাষায় ঢেঁকি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে, তাহারা না প্রাকৃত, না সংস্কৃত, না পারসী, না আরবী। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার ক্রিয়া কারক বিভক্তি প্রভৃতি এপ্রকার ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোন মতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, একথা বলিতে পারা যায় না—অবশ্যই ভাষান্তরসহকৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা স্বীকারকরিতে হয়। এক ভাষা হইতে কিরূপে ও কি প্রণালীতে ভাষান্তরের সৃষ্টি হয়, তাহা নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রাচীন গ্রন্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালার খুব প্রাচীন গ্রন্থ একখানিও পাওয়া

যায় না। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বকাল হইতে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া সাধারণের পরমশ্রদ্ধাস্পদ হইয়া আছে। সংস্কৃতভিন্ন অপর ভাষাকে লোকে কেবল ব্যবহারিক ভাষা বলিয়া বোধকরিত; বিদ্যানুশীলনও পূর্ব্বে সাধারণতঃ এরূপ প্রবলপ্রচার ছিল না। সুতরাং যাঁহারা তৎকালে কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ করিতেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদিরচনা করিবার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য জন্মিত, তাঁহারা সেই শক্তি সংস্কৃত-গ্রন্থরচনে প্রয়োজিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন; সুতরাং কৃতবিদ্যদিগের কর্তৃক বাঙ্গালা অনাদৃত ও উপেক্ষিত হওয়াতে বহুকালপর্য্যন্ত ইহার বিলক্ষণ দুরবস্থা ছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী ও জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালার খুব প্রাচীন পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহাও ৩। ৪ শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের নহে; সুতরাং তদ্দারা ভাষার মূলানুসন্ধান হওয়া অসম্ভব। যাহাহউক ওরূপ অশক্য ব্যাপারে অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার ক্রিয়া কারকাদি যেরূপে প্রযুক্ত হয় এবং তাহারা যেরূপে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, কেবল তদ্বিষয়ের কয়েকটী স্থূল স্থূল কথা বলিয়া আমরা এপ্রকরণ পরিত্যাগ করিব।

সন্ধি—সংস্কৃতে যেরূপ পদদ্বয়ের অন্ত্য ও আদ্যবর্ণের পরস্পর মিলন হইয়া সন্ধি হয়, বাঙ্গালাতেও অবিকল সেইরূপ সন্ধির ব্যবহার আছে; সুতরাং এ অংশে বাঙ্গালা

সংস্কৃতের সম্পূর্ণরূপ অনুকারক। তবে কোন কোন প্রয়োক্তা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধি করেন না এবং তাহা না করাতেও বিশেষ দোষ হয় না।

সমাস—সমাসও সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিঙ্গ—সংস্কৃতে যে শব্দ যেলিঙ্গ, বাঙ্গালাতেও সেই শব্দকে সেইলিঙ্গ বলিয়াই ব্যবহার করাহইতেছে। তবে যে স্থলে শুনিতে কদর্য্যবোধ হয়, কেবল সেই স্থলেই লিঙ্গসূচক চিহ্নাদি দেওয়া হয় না।

কারক ও বিভক্তি—সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও কর্ত্তা কর্ম্ম করণ অপাদান সম্প্রদান অধিকরণ এই ছয় কারক ও সম্বন্ধপদ আছে এবং সেই সকল স্থলে যথাযথ প্রথমাদি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াথাকে। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই, কেবল একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি যোগ হইয়াথাকে। এই সকল বিভক্তির আকার কিছু ভিন্নরূপ। কর্ত্তায় 'রা' 'এরা' কর্ম্মে 'কে' 'দিগকে' করণে 'দ্বারা' 'দিয়া' অপদানে 'হইতে' অধিকরণে 'তে' ও সম্বন্ধে 'র' 'এর' 'দিগের' প্রভৃতি যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিভক্তির চিহ্ন যে, কোথা হইতে আসিল তাহা স্থির বলাযায় না।

ধাতু ও ক্রিয়া—বাঙ্গালায় যে সকল ক্রিয়াপদ দেখিতে পাওয়াযায়, তাহার ধাতুসকল প্রায়সমস্তই সংস্কৃত-মূলক। সেই সংস্কৃত ধাতুহইতে প্রাকৃতভাষায় যে ক্রিয়া জন্মে, সেই

ক্রিয়া অপভ্রংশিত হইয়া বাঙ্গালাক্রিয়াপদের উৎপাদন করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করাযায়। ইহার প্রামাণ্যার্থ প্রথমতঃ কয়েকটী সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ প্রদর্শন করা যাউক।—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা—ক্রিয়া
ভবতি	হোই	হয়
করোতি	করই	করে
বক্তি	বোলই	বলে
ক্রীণাতি	কিণই	কেনে
বর্দ্ধতে	বড্ঢই	বাড়ে
স্মরতি	সুমরদি	সুমরে
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে
কথয়তি	কহই	কহে
অস্তি	অচ্ছি	আছে
ক্ষিপতি	ফেলদি	ফেলে
পঠতি	পঢ়ই	পঢ়ে
পততি	পড়ই	পড়ে
মৃদ্নাতি	মলদি	মলে

ইত্যাদি।—

উপরিপ্রদর্শিত পদগুলির প্রতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধহইবে যে, 'হোই' প্রভৃতি প্রাকৃত ক্রিয়া হইতেই 'হয়' প্রভৃতি বাঙ্গালাক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগের বোধহয় যে 'হইতেছে' প্রভৃতিক্রিয়া একমাত্র ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু ভূ ও অস এই উভয় ধাতুর যোগে উৎপন্ন। অস ধাতুর সংস্কৃত ক্রিয়া 'অস্তি' হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় 'আছে' হইয়াছে। পরে ভূ ধাতুর অসমাপিকাক্রিয়া 'হইতে' ও অস ধাতুর সমাপিকাক্রিয়া 'আছে' এই দুই ক্রিয়া একত্র মিলিত হইয়া ও 'আছে' র আকারের লোপ হইয়া 'হইতেছে' ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। 'দেখিতেছে' 'করিতেছে' 'কিনিতেছে' এবং 'হইয়াছে' 'দেখিয়াছে' 'করিয়াছে' ইত্যাদি স্থলেও বোধ হয় ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াথাকিবে। অস ধাতুর অতীতকালিকা সংস্কৃতক্রিয়া 'আসীৎ' হইতে বোধহয় বাঙ্গালায় 'আছিল' ক্রিয়া জন্মিয়াছে। কিছু প্রাচীন পুস্তকে 'আছিল' ক্রিয়ার অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়াযায়। যথা—

'যখন আছিল সব ঘোর অন্ধকার' (জীবগোস্বামীর করচা)।

'আছিল দেউল এক পর্ব্বতপ্রমাণ' (শুভঙ্করের আর্য্যা)।

এক্ষণে আর 'আছিল' ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'ছিল' হইয়াছে। যাহাহউক, বোধহয় 'হইয়া' ও 'আছিল' এই দুইক্রিয়ার যোগে 'হইয়াছিল' ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াথাকিবে। 'করিয়াছিল' 'দেখিয়াছিল' প্রভৃতি স্থলে এবং 'হইতেছিল' 'করিতেছিল' ইত্যাদি স্থলেও ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াছে বলাযাইতেপারে। 'হউক' 'করিল' 'দেখিবে' 'কিনিতাম' ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল

ক্রিয়াপদ আছে, তৎসমস্তের মূলাকর্ষণ করিতে পারা যাউক বা না যাউক কিন্তু সকলই যে, ঐরূপ সংস্কৃতমূলক কোন না কোন ধাতু বা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র সমাপিকাক্রিয়া কিছু কম আছে। অনেক স্থলে ভাবক্রিয়াকে কর্ম্মপদ ও কৃ ধাতুর ক্রিয়াকে সমাপিকাক্রিয়াপদ করিয়া বাক্য নিষ্পন্ন করা যায়। যথা গমন করিতেছে, ভক্ষণ করিয়াছে, ক্রীড়া করিয়াছিল, বধ করিব ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এইরূপ অপর্য্যাপ্ততা ভাষার পক্ষে সুবিধা নহে। বাঙ্গালার এই অসুবিধা অনেকেই সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে 'হইতে' 'হইয়া' প্রভৃতি যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে বোধহয় 'হইতে' নিমিত্তার্থক তুমন্ত 'ভবিতুং' বা 'হোতুং' হইতে এবং 'হইয়া' অনন্তরার্থক ক্ত্বাজন্ত 'ভূত্বা' বা 'ভবিঅ' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখিতে, দেখিয়া; করিতে, করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াকেও ঐরূপে উৎপন্ন বলাযাইতেপারে। বিশেষতঃ ক্ত্বাজন্ত পদগুলির প্রাকৃত যাহা হয়, অনেক স্থলেই তাহা হইতে বাঙ্গালাকরা (প্রধানতঃ) কেবল এক আকারযোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা করিঅ—করিয়া, মিলিঅ —মিলিয়া, শুণিঅ—শুনিয়া, ভণিঅ—ভণিয়া ইত্যাদি।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা গেল, তদ্দারা

ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে, অথবা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করাগিয়াছে . যে, বাঙ্গালাভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ; কিন্তু প্রাকৃতের উপাদান উপকরণ প্রভৃতি সমুদয়ই সংস্কৃত, সুতরাং বাঙ্গালাও পরম্পরা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত-মূলক। ইহা যেরূপ প্রণালীতে ও যেরূপ ক্রমে সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, তাহা ও সঙ্ক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল। পরে কালক্রমে ইহার যেরূপ পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে, তাহাও যথাযোগ্য স্থলে ক্রমশঃ উল্লেখ করিবার চেষ্টা করাযাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল অর্থাৎ বল্লাল বা লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি বৈদ্য বংশীয় রাজাদিগের সময় অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেও বাঙ্গালাভাষার উপত্তি ও প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। সজীব প্রাণীমাত্রেই জন্মলাভকালে যদবস্থ থাকে, বয়স হইলে কখনই তদবস্থ থাকে না। আমরা যৎকালে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আমাদিগের তাৎকালিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা কতদূর পৃথগ্বিধ হইয়াছে, তাহা অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিতে গেলে

বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। ভাষা যদিও স্বয়ং সজীব প্রাণী নহে, কিন্তু সজীবপ্রাণীর সর্ব্বাপেক্ষা সারপদার্থ যে অন্তঃকরণ, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি, সজীবপ্রাণীর বাগিন্দ্রিয়েই ইহার চিরনিবাস এবং ইহা সজীবপ্রাণীকে নিয়ত পরিচালনকরিবার যন্ত্রস্বরূপ; সুতরাং ইহারও কৌমার, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা যে, একভাবেই যাইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া এদেশের যে ভাষা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ অত্রত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা আজিও যে, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেছি, তাহা কখনই নহে। কিন্তু সেই ভাষাই না হউক ভিন্ন ভাষাও নহে—যদি রামচন্দ্রনামক কোন দুইবর্ষবয়স্ক বালককে আমরা কিয়দ্দিন দেখিয়া তৎপরে একেবারে বিংশতিবৎসর পরে তাহাকে আবার দর্শনকরি, তাহা হইলে কখনই সেই রামচন্দ্র বলিয়া প্রথমে চিনিতে পারিনা—কিন্তু চিনিতে পারিনা বলিয়াই যে, সে ব্যক্তি সেই রামচন্দ্র নহে, তাহাও বলিতে পারাযায় না; কারণ সেইরামচন্দ্রনিষ্ঠ কতকটা অনন্যসাধারণ পদার্থ সর্ব্বক্ষণই তাহাতে বিদ্যমান আছে। সেইরূপ আমাদিগের কান্যকুব্জাগত পূর্ব্বপুরুষেরা যদি এই সময়ে একবার গাত্রোত্থান করিয়া উঠেন, তাহাহইলে তাঁহারা প্রথমতঃ আমাদিগের এই চলিত ভাষাকে অন্যবিধ ভাষা বলিয়াই

বোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ অনুশীলন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের সেই পূর্ব্ব-ব্যবহৃত ভাষাই—অন্য কিছু নহে; তবে সেই ভাষার শরীরে অনেকটা পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে এইমাত্র—মূল প্রকৃতির কিছু-মাত্র বিপর্য্যয় হয় নাই। জগতীস্থ সমস্ত বস্তুর ন্যায় ভাষাও নিয়ত পরিবর্ত্তশীল। সেইপরিবর্ত্তের অবস্থা বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামে অভিহিত হইয়াথাকে।

বাঙ্গালার উৎপত্তিকাল হইতে অদ্যপর্য্যন্ত সময়কে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে ভাষার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার নির্দ্দেশকরা অসঙ্গত বোধহয়না। আমা-দিগের বিবেচনায় প্রথম হইতে চৈতন্যচন্দ্রের উৎপত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪০৭ শক [১৪৮৫ খৃষ্ট অব্দ] পর্য্যন্ত এই সময়কে আদ্যকাল; তৎপরে চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্ররায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬৭৪ শক [১৭৫২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত সময়কে মধ্যকাল এবং তৎপরে ভারত-চন্দ্রের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সময়কে ইদানীন্তনকাল বলা সঙ্গত হইতে পারে। ঐ তিনকালের বাঙ্গালা-ভাষার অবস্থা যথাক্রমে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারাযায়। এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ বাঙ্গা-লার সেই বাল্যাবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আদ্যকাল

কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় বলিতে পারেনা। আমরা কোন্ পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি, এ সকল কথা অন্য কেহ বলিয়া না দিলে, আমরা কখনই জানিতে পারিতাম না। ভাষার পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, বাঙ্গালাভাষা প্রথমাবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহা বলিয়া দিবার লোক অর্থাৎ তাহা বলিয়া দিতেপারে এরূপ ইতিহাস কিছুই পাওয়াযায়না। সুতরাং কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই ওবিষয়ে যাহা কিছু বলাযাইতে পারে। যদি ঐ সময়ের লিখিত ২। ৪ খানি গ্রন্থ পাওয়া যাইত, তাহাহইলে ঐ অনুমান কিয়ৎপরিমাণে সপ্রমাণ হইত। কিন্তু আমরা যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—দেখিতেছি, সে সমস্তই প্রায় চৈতন্যদেবের উৎপত্তির পরকালীন গ্রন্থ—পূর্ব্বকালীন নহে। কেবল বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি গীতই চৈতন্যের পূর্ব্বকালে বিরচিত বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। যেহেতু বৈষ্ণবদাসসঙ্কলিত পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতাবলি শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন যথা—

জয় জয়দেব কবিনৃপতিশিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিলভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত ॥ (পদকল্পতরু ১৫)

যাহাহউক এই দুই জনকে লইয়া এবং ইহাঁদিগের রচনার উপরেই নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার প্রথমাবস্থার বিষয় নিঃশেষিত করিতে হইল, তদ্ব্যতিরেকে ঐ সময়ের আর কোন গ্রন্থই পাওয়াগেল না।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতিবিরচিত কোন পৃথক্ গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাই নাই, কেবল পদামৃতসমুদ্র, পদাবলী, পদকল্পতরু, প্রাচীনপদাবলী প্রভৃতি বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক গ্রন্থে তাঁহার ভণিতিযুক্ত গীতসকল দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল গীতের সঙ্খ্যা নিতান্ত অল্প নহে, সুতরাং বোধহয় তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থ অবশ্য ছিল।

বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিশ্চয় সংবাদ বলিতে পারাযায়না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনি চৈতন্যের শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে, চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং বিদ্যাপতি ১৩০০ শকে (১৩৭৮ খৃঃ অব্দে) অথবা তৎসন্নিহিত সময়ে অবস্থিত ছিলেন বলিতে হইবে।—

"কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে" ॥ (প, ক, ত, ২৬৫)।

" ভণয়ে বিদ্যাপতি অপরূপ মুরতি রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা "। (প, ক, ত, ২৮৩)

এই সকল তাঁহার রচিত পদাবলীতে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এইমাত্র বোধ হয় যে, তিনি শিবসিংহনামক কোন রাজার অধিকারমধ্যে অথবা তাঁহার সভাসদ্রূপে অবস্থিত ছিলেন। শিবসিংহের রাজমহিষীর নাম লছিমা বা লক্ষ্মীদেবী। বিদ্যাপতির সময়ে মুসলমানদিগের রাজ্য ছিল—সুতরাং শিবসিংহ যে, কোন্ দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাহা বোধহয়না। বীরভূম বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ইহার অন্যতম কোন প্রদেশের একজন বড় জমীদার ছিলেন, ইহাই বোধহয় এবং সেইজন্যই কোন্ ইতিহাসে তাঁহার নাম পাওয়াযায়না। ইহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে যে, পূর্ব্বোল্লিখিত চণ্ডীদাসের বাটী বীরভূম জেলার মধ্যে ছিল। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত আছে। তদনুসারে বীরভূমের সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয়না। যাহাহউক এস্থলে ইহাও প্রকাশকরা আবশ্যক যে, বিষ্ণুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় বিদ্যাপতির বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য ঐ প্রদেশে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল লোকপরম্পরায় এইমাত্র জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলার ছাত্না প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের এক সামান্য রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। রাজমহিষী

লছিমাদেবীর সহিত তাঁহার প্রসক্তি ছিল এবং ঐ মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিত্ব প্রতিভাত হইত, এই জন্য তিনি লছিমার নামেই ভণিতি দিয়া কবিতারচনা করিতেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা বলা যায়না। যাহাহউক বিদ্যাপতির গীতে যে রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথের নামোল্লেখ পাওয়াযায়, বোধহয় ইহাঁরা তাঁহার প্রিয় মিত্র ছিলেন।

বিদ্যাপতির রচনাদর্শনে বোধহয় তিনি বিলক্ষণ সংস্কৃত জানিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার অনেক পদ সংস্কৃত শ্লোকের ভাব লইয়া রচিত হইয়াছে দেখিতেপাওয়াযায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নভাগে একটী উদ্ধৃত করা গেল—

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী ॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ। মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ ॥
মোতিমবন্ধমৌলি নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ সিন্দূরবিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার। নহ ফণিরাজ উরে মণিহার ॥
নীলপটাম্বর নহ বাঘছাল। কেলিক কমল ইহ না হয় কপাল ॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ॥

এই গীতটী জয়দেবের নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের ভাবকেই বিপর্য্যস্তরূপে লইয়া যে, গ্রথিত তাহাতে বোধহয়, কাহারও সন্দেহ হইবে না—

হৃদি বিষলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥

বিদ্যাপতি, পদাবলীতে নিজ জাতিনির্দ্দেশ না করিলেও তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতাদর্শনেই একপ্রকার স্থির করিতে পারাযায় যে, তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণভিন্ন আর কেহই প্রায় সংস্কৃত জানিতেন না। বিদ্যাপতির গীত সকলই শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত। অন্যবিষয়ক তাঁহার কোন গীতাদি আছে কি না তাহা বলিতে পারাযায় না। বিদ্যাপতির নামসম্বলিত 'পুরুষপরীক্ষা' নামে একখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়। আমাদিগের বোধ হয়, উহা উক্ত রাজা শিবসিংহের সময়ে বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে বিরচিত হইয়াছিল—এক্ষণকার কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। কিন্তু কেহ কেহ কহেন তাহা নহে, বিদ্যাপতিই ঐ পুস্তক বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে গদ্যরচনার অসম্ভাবিতা ও ভাষাগতবিলক্ষণতা বিবেচনাকরিয়া সে কথায় আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস হয়না। বিদ্যাপতির অনেক গীতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির চিহ্ন পাওয়াযায়। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাবগভীর, রসাঢ্য ও মধুর—সমগ্র-ভাবে অর্থপরিগ্রহ না হইলেও শ্রবণবিবরে যেন মধুধারা বর্ষণ করে। এই পুস্তকেরই স্থানে স্থানে যেসকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেই একথা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইবে।

চণ্ডীদাস।

বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসেরও পৃথক্ কোন গ্রন্থ

দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার রচিত পদাবলী দেখিতেপাওয়াযায়। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—'নান্নুর' নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুল্লী-পুর থানার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ঐ গ্রামে বাশুলী নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্যদেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী; অপভাষায় ইহাঁকে বাশুলী বলে। প্রসিদ্ধি আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে ইহাঁর উপাসনা করিতেন, পরে ইহাঁরই উপদেশে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপরায়ণ হয়েন, এবং তদ্বিষয়ক নানা পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাসের স্বরচিত পদাবলীতে এই বৃত্তান্তের কতক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কি মোহনী জান বন্ধু কি মোহনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
বন্ধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়!
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

(প, ক, ত, ৮১৮)।

তথা—* * নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,—ইত্যাদি (প, ক, ত,৮৯১)॥

চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এই বলাযাইতেপারে যে, চৈতন্যের শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতির জন্মপরিগ্রহবিষয়ক অনুমান যদি স্থির হয়, তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতেহইবে। কারণ উহাঁরা দুইজনেই একসময়ে অবস্থিত ছিলেন ইহা প্রসিদ্ধ আছে। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গীতেও উহাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে যথা—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতিগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব্ চণ্ডীদাসগুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলিগেল॥
চণ্ডীদাস তব্ রহই ন পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুঁহু জন দুঁহু গুণ গায়ত দুঁহুহিয়ে দুঁহু রহু জাগি॥
দৈবহি দুঁহু দোঁহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।
দুঁহু দোঁহ নামশ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥ (প,ক,ত,২৪১০)
তথা—ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥ (ঐ ২৪১২)

ঐ সাক্ষাৎকারসময়ে উভয়ের কবিত্ব রসিকত্ব পাণ্ডিত্য প্রভৃতির প্রকাশক প্রশ্নোত্তরাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উহাঁদের সাক্ষাৎকারবিষয়ক উপাখ্যান কাল্পনিক বলিয়া বোধহয়না।

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়াযায়। মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিক্‌পত্নী প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্যস্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাব-গাম্ভীর্য্য ও বচনবৈচিত্র্য আছে, ইহাঁর গীতে সেরূপ অতি কম পাওয়াযায়। ইহাঁর রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক—বিশেষতঃ প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতিকর বোধহয়না। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনাকরিতেহইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐরূপ ছন্দোবন্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক-পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকীশক্তিসম্ভূত বলিয়া বোধহয়। তাঁহার রচিত যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে তৎপাঠেই পাঠকেরা এবিষয়ের প্রমাণ পাইবেন।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা যে, খুব প্রাচীন তদ্বি-ষয়ে কোন সংশয়ই নাই। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার আদি-রচনা—অর্থাৎ আদ্যকালে এইদুইজন ভিন্ন আর কেহই কোন বিষয়ে কোন রচনা করেন নাই—তাহা বলিতে পারা

যায় না; প্রত্যুত ইহাঁদিগের রচনাতে যেরূপ কিঞ্চিৎ পারিপাট্য লক্ষিত হয়, তাহাতে ইহাঁদেরও পূর্ব্বে যে, বাঙ্গালা রচনার কিছু অনুশীলন ছিল, কেহ কেহ কোন বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন—কালক্রমে সে সকলের লোপ হইয়াছে, অথবা অদ্যাপি স্থানেস্থানে আছে, আমরাই তাহার সন্ধান জানিতে পারিনাই, ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব।

যাহাহউক আদ্যকালে গদ্যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। এই পুস্তকের ২৮-পৃষ্ঠে উদ্ধৃত ১৫ সঙ্খ্যক পদে উল্লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস গদ্যময়ও গীত রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু সে গদ্য কখনও দেখাযায় নাই এবং গদ্যময় গীত কিরূপ হইতেপারে, তাহাও বুঝিতেপারাযায়না; এই জন্য ওলেখার উপরে আস্থা হইতেছে না। বিশেষতঃ ইহা এক সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধহয় যে, সকল দেশেই গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। গ্রীসদেশে লিনস্ অর্ফিয়স্ মিউজিয়স্ হোমর এবং ইটালী অর্থাৎ রোমে লিবিয়স্ এণ্ড্রোমিকস্ প্রভৃতি কবিগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতেও বেদ* সংহিতা রামায়ণ

* বেদকে আপাততঃ গদ্য বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত নামক তিন স্বরের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয়, অতএব উহাও পদ্য ও গীতগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।

প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। অতএব বাঙ্গালাতে যে, সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে চিত্তবিনোদনার্থ স্বরসংযোগে গান গাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই কবিত্বশক্তির প্রথম অঙ্কুর রোপণকরে। ঐ সকল গান প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না—বহুকালপর্য্যন্ত জনগণের রসনাবাসীই থাকে। পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিনস্ হোমরাদির রচনা এবং বেদ রামায়ণাদি সকলই ঐ রূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্যকালে পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির গীতময় রচনাই যে, প্রথমে প্রকাশিত হইবে, তাহাই সম্ভবপর বোধহয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে যে যে বাঙ্গালাগ্রন্থ অবলোকন করিলাম, তাহাতে আমাদের এই সংস্কার জন্মিয়াউঠিল যে, বীরভূম বাঙ্কুড়া ও বর্দ্ধমান এই তিন প্রদেশেই কবিত্বশক্তির প্রথম অঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছিল। কারণ, দেখাযাইতেছে যে, এক কৃত্তিবাস ভিন্ন প্রায় সমস্ত প্রাচীন কবিই উক্ত তিন প্রদেশের অন্যতমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এবং অদ্যাপি ঐ সকল প্রদেশেই রামায়ণ ও চণ্ডীর গায়ক এবং সঙ্কীর্ত্তনকারী অধিক দেখিতেপাওয়াযায়। অতএব দেখ, এক্ষণে আমরা যাঁহাদিগকে 'রেঢ়ো' লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াথাকি, তাঁহারাই একসময়ে অসামান্য

রসিকতা ও সহৃদয়তার আধার ছিলেন, তাঁহারাই আপন আপন চিত্তক্ষেত্রে বাঙ্গালাকাব্যবৃক্ষের বীজ প্রথমে বপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই নিকট বাঙ্গালাভাষা এত দূর ঋণী আছে এবং তাঁহাদিগেরই দোহাই দেওয়াতে অনেক দিনের সভ্য জাতি বলিয়া লোকের নিকট আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইতেছে!।

এক্ষণে আদ্যকালে ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিয়াদেখা আবশ্যক। বিদ্যাপতির যে কয়েকটী গীত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে, ও নিম্নে যে—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতিঅনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম্ রূপ নিহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরস না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক॥

প্রাচীন পদাবলী।

এই গীতটী উদ্ধৃত হইল ইহাতে—এবং তৎপ্রণীত এই রূপ অপরাপর গীতে নয়নপাত করিলেই আপাততঃ বিলক্ষণ এই প্রতীতি জন্মিবে (এবং অনেকের তাহাই জন্মিয়াছে) যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাভাষা হিন্দির সহিত অত্যন্ত মিশ্রিত ছিল—অন্যথা বাঙ্গালাগীতে হাম্, কৈছন, মোয়,

সোই, ঐছে ইত্যাদি ভূরি ভূরি হিন্দিশব্দ এবং হিন্দির ন্যায় বাঁকা বাঁকা ক্রিয়া কেন রহিল? কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ইহাও বিবেচনাকরিতেহইবে যে, বিদ্যাপতিরচিত গীতে যেরূপ হিন্দিমিশ্রণ আছে, যদি ঐ সময়ের দেশভাষাই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে তৎকালে যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তৎসমস্তেই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রণ থাকিত—কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইহাঁরা সমসাময়িক লোক। চণ্ডীদাসের যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এবং নিম্নে উদ্ধৃত—

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমাবিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণিতে লিখি॥
গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥ (প, ক, ত, ৭৮৬)

এই গীতে এবং এইরূপ সকল গীতেই হিন্দির ভাগ প্রায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অতএব বিবেচনা কর যে, যদি ঐ সময়ের ভাষাই ওরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত,

তাহা হইলে সমসাময়িক দুই কবির রচনা কখনও এরূপ বিসদৃশ হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপতিরও কোন কোন গীতে হিন্দির অংশ নাই—চণ্ডীদাসেরও ২।১টী গীতে হিন্দির অংশ বিলক্ষণ আছে এবং ইহাঁদিগের শতাধিকবৎসরপরবর্ত্তী গোবিন্দদাসপ্রভৃতির প্রায়সমস্ত গীতেই বিদ্যাপতির অপেক্ষাও অধিক হিন্দি আছে। নিম্নোদ্ধৃত গীত সকলে ইহা সপ্রমাণ হইবে—

"রাই জাগ রাই জাগ শুকসারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুক তুমি গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম্ কর সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই" ॥ (প, ক, ত, ৬৭১)

**** "তুহু একে রমণীশিরোমনি রসবতী কোন্ ঐছে জগমাহ।
তোহারি সমুখে শ্যামসঞে বিলসব কৈছন রস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরীবচন, শ্রবন ধরি সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষত হাসি মনে মান তেয়াগল উলসিত দোঁহে দোঁহা হেরি॥
*** দ্বিজ চণ্ডীদাস আবির জোগায়ত সকল সখীগণ সাথে"॥ঐ১৪৮৮।

"কাহে পুন, গৌরকিশোর।
অবনতমাথে লিখত মহীমণ্ডল নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥

কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু, জাগরে নিদ নাহি ভায়।
যোই পয়াশে পুন, তাক বদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে ধন্দন পানিতলে ধারই ছোড়ই দীঘ নিশাস॥
ঐছন'চরিতে তারল সব নর নারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস"(ঐ ১৮৩৩)।

অতএব এস্থলে বিবেচনা করিতেহইবে যে, এক সময়ের দুইজন কবির মধ্যে একের অধিকাংশ রচনাতেই হিন্দির অত্যন্ত মিশ্রণ কিন্তু কোন কোন রচনাতে প্রায় কিছুই নাই এবং দ্বিতীয়ের সমস্ত রচনাতেই হিন্দির সংস্রব প্রায় কিছুই নাই কিন্তু কোন কোনটীতে বিলক্ষণ আছে, সুতরাং ইহাদ্বারা ঐ সময়ের দেশভাষাই যে, ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্তকরা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়না। তবে উক্ত কবিদ্বয়ের ওরূপ বিসদৃশ রচনা কেন হইল? তদ্বিষয়ের মীমাংসা করা বা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আমরা দেখিতেছি যে, যেসকল রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই বিচার করাযাইতেছে, তৎসমস্তই রাধা কৃষ্ণের লীলাবর্ণনবিষয়ক সংগীত। বোধহয় উক্তরূপ সংগীত প্রথমে বৃন্দাবনের সন্নিহিত স্থানে এবং ব্রজ-ভাষাতেই বিরচিত হইয়াথাকিবে। বাঙ্গালাকবিগণ তাহা হইতেই ঐ প্রথা প্রথমে শিক্ষাকরেন এবং শিক্ষা করিয়া, যাঁহাদিগের ঐ ভাষা নিতান্ত মধুর বলিয়া বোধহয়, তাঁহারা ঐ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, কিছু দুর্ব্বোধ হইলেও ঐ ভাষার অনেক ক্রিয়া কারকাদি স্বদেশীয়ভাষার সংগীত-মধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ আবার

মাধুর্য্যবোধসত্ত্বেও কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া তদ্‌গ্রহণে তত যত্ন করেন নাই। অতএব গীতমধ্যে ব্রজভাষার শব্দগ্রহণ ঐচ্ছিক হওয়াতে এবং প্রত্যেক লোকেরই রুচি বিভিন্ন-প্রকার হওয়াতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা ওরূপ বিসদৃশ হওয়া অসঙ্গত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত গীতাবলীতে যে সকল হিন্দিসম শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল হিন্দিই নহে; উহার কতক খাটী প্রাকৃত ও কতক ব্রজভাষা—অথবা তাহাদেরই কোনরূপ অপভ্রংশ। দহসি, পারই, পুচ্ছসি, ধারই, হম্, সো, তুহ ইত্যাদি শব্দত অবিকল প্রাকৃত এবং ঐছন, যৈছন, তৈছন, কৈছন, হিয়া, ঈসা, যীসা, তীসা, কীসা, কাহে, ইত্যাদি শব্দ প্রাকৃতের অপভ্রংশ। তদ্ভিন্ন যাকর, কতিহুঁ, মোতিম, ভেল, রহই, চলুলহি, পন্থহি, গায়ত, পাওল, নথই, তহি, জানল, করল, ভাসল, নিহারনু, রাখনু, কাহু, না পেখ, তুহু, জগমাহ, বিলসব, জোগায়ত, জনু, লিখত—ইত্যাদি পদ সকলের একটীও খাটী হিন্দি নহে; বোধহয় এগুলি ব্রজভাষা হইবে। তবে এক্ষণকার কাহারও২ মতে হিন্দি ও ব্রজভাষা একই—অথবা ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর নিতান্তসম্পৃক্ত—হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু ভাষা তাহাহইতে স্বতন্ত্র। যদি এ মত গ্রাহ্য করাযায়, তাহাহইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রজভাষার শব্দ সকলকে হিন্দি বলিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। যাহাহউক ইহা দেখাযাইতেছে

যে, কৃষ্ণচরিতবর্ণনে ব্রজভাষামিশ্রিত রচনাই অনেকের অধিকতর প্রীতিকর হয়। বোধহয় ব্রজভাষার মাধুর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে, পবিত্রতাবোধও কিছু কারণ হইতেপারে। যে সকল কৃষ্ণপরায়ণ ভক্তেরা পরম পবিত্রবোধে ব্রজের মৃত্তিকাপর্য্যন্ত ভক্ষণকরিয়াথাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রজের ভাষাকে ওরূপ সমাদরকরা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের যে গীতটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার শব্দ অনেক আছে। গোবিন্দদাস চৈতন্যের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরেও জ্ঞানদাস, রাধামোহনদাস, কবিশেখর, রামানন্দ, প্রভৃতি যে সকল কবিগণ সঙ্গীতরচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনাতেও ব্রজভাষার কথা অনেক আছে—কিন্তু সেই সময়েই অথবা তাহারই সন্নিকটসময়ে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি, সঙ্গীতময় নহে এরূপ, যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়। সুতরাং ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, বিদ্যাপতির সময়েও কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতময় রচনাতে ব্রজভাষা বা হিন্দির সংস্রব যেরূপ অধিক ছিল, তৎকালের সাধারণভাষাতে সেরূপ ছিলনা। যে সময়ের ভাষাতে ব্রজভাষার সংস্রব কিছুমাত্র নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সে সময়েরও ২। ১ জন কবি, যখন্ সাধ করিয়া ব্রজভাষামিশ্রিত গীত লিখিতে-

গিয়াছেন, তখন্ ওবিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই। সে গীত এই—

"যতহুঁ নিরখত, অতহুঁ বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে"

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

"কাহে, সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র।

তবে এতাবতা এরূপ সিদ্ধান্ত করাযাইতেছে না যে, আমরা যাহাকে আদ্যকালে বলিতেছি তখন্ যেরূপ বাঙ্গালা ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ বাঙ্গালাই আছে। তাহা কখনও হইতে পারে না। যেমন আকরোত্থিত অসংস্কৃত বস্তুর গাত্র নিরীক্ষণকরিলে তাহাতে তদাকরিক অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ লক্ষিত হয়, সেইরূপ আদ্যকালের বাঙ্গালাতে তদাকরীভূত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অধিকসংস্রব লক্ষিতহইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। এইজন্যই পুচ্ছসি দহসি, করই হসই, বোলে, ইত্যাদি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ক্রিয়ার যোগ প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক দেখাযায়। ঐ সকল ক্রিয়া বোধহয় ব্রজভাষার নহে।

বাঙ্গালাভাষায় এক্ষণে যেরূপ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, আমাদিগের অবলম্বিত আদ্যকালের বাঙ্গালাতেও রজনীপ্রভাত, মৃগমদসার, নবজলধর, বন্দী, ধরণী, গুরুজন, মধুযামিনী, পুলক ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ

সকলই অধিকব্যবহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় সমাসঘটিত বড় বড় কথা ব্যবহৃত হইত না। বিশেষণও এক্ষণকার ন্যায়ই তখনও প্রায় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বিনিবেশিত হইত। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে তাহাতে যে, স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ-আ দিতেইহইবে, এরূপ কোন নিয়ম ছিলনা—মধুরতা ও শ্রুতিকটুতার অনুরোধে রচয়িতার ইচ্ছামতই প্রদত্ত হইত। ফলতঃ তৎকালে বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ ছিলনা—সুতরাং রচয়িতাদিগকে ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে হইত না। বাঙ্গালা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও সংস্কৃত মহামাহাত্ম্যশালী বলিয়া ক্রমশঃ উঁহারই অনুসরণ বাঙ্গালায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সংস্কৃতের বাক্যবিন্যাসপ্রণালী যেরূপ, বাঙ্গালারচয়িতারা ক্রমেক্রমে সেইরূপই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অধিক কি আদ্যকালের যে সকল গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতেপারিয়াছি—তাহাদের রচনার সহিত এক্ষণকার রচনার আত্যন্তিকী বিভিন্নতা লক্ষিত হয়না। তবে স্থল বিশেষে ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, কারক, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম প্রভৃতিতে স্পষ্টপ্রাচীনতা দেখাযায়, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাৎকালিকভাষায় প্রাকৃত হিন্দি বা ব্রজভাষা ততদূর মিশ্রিত না থাকুক কিন্তু অল্পমিশ্রিত ছিল, তাহা বেশ বোধহয়। তদ্ভিন্ন আর একটীকার্য্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাযায়।—সংযুক্ত

বর্ণের বিশ্লেষকরণরূপ বিপ্রকর্ষণকার্য্য আধুনিকপদ্যেও অনেক আছে বটে, কিন্তু প্রাচীনপদ্যে ঐ কার্য্যের অত্যন্ত আধিক্য অনুভূত হয়। সেই বিপ্রকর্ষণকার্য্য এইরূপ—মূর্ত্তি=মূরতি, নির্ম্মল=নিরমল, নির্ব্বাহ=নিরবাহ, ধর্ম্ম=ধরম, কর্ম্ম=করম, প্রমাণ=পরমাণ, লক্ষ্মী=লছিমা, ভস্ম=ভসম, প্রীতি=পিরীতি, দর্শন=দরশন, তৃপ্ত=তিরপিত, স্পর্শ=পরস, ভ্রম=ভরম, প্রসঙ্গ=পরসঙ্গ, দ্রবে=দরবয়ে, ব্যক্ত=বেকত ইত্যাদি।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে—আদ্যকালে ষ কে লোকে অনেকস্থলে খ বলিয়া উচ্চারণকরিত, যথা—পুরুষ=পুরুখ, ঋষভ=ঋখভইত্যাদি। হিন্দিতে অদ্যাপি এইরূপ ব্যবহার আছে।

ছন্দ—আদ্যকালের যে সকল পদ্যরচনা দেখাযায়, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী এই দুইটীমাত্র ছন্দ দৃষ্টহয়। এক্ষণকার চলিত পয়ারের নিয়ম এই যে, উহার দুইটী সমান অংশ থাকে। তাহার প্রথম অংশটীকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষটীকে পরার্দ্ধ কহে। পূর্ব্বার্দ্ধের উপান্তিম ও অন্তিম বর্ণ যাহা হইবে, পরার্দ্ধের ঐ ঐ বর্ণও অবিকল তাহাই হওয়া চাই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক অর্দ্ধেরই ৮ ম ও ১৪ শ অক্ষরে যতি—অর্থাৎ বিরাম থাকা আবশ্যক। ত্রিপদীতেও দুইটী অর্দ্ধ থাকে, প্রত্যেক অর্দ্ধে বিংশতিটী করিয়া অক্ষর; উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল, প্রত্যেক

অর্দ্ধেই স্পষ্ট দ্বাদশ ও বিংশ অক্ষরে যতি এবং ৬ষ্ঠ ও ১২শ বর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল। এই ত্রিপদীকে লঘুত্রিপদী কহে—এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ ত্রিপদীও আছে। এই পয়ার ও ত্রিপদীর শেষবর্ণে মিলন থাকাতে ইহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ কহে।

এক্ষণে যেরূপ অক্ষরগণনার নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ পয়ার ও ত্রিপদী রচিত হইতেছে, আদ্যকবিরা সেরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাঁহাদের পদ্যসকল সঙ্গীতময়—সুতরাং সঙ্গীতের স্বরের অনুরোধে, যেখানে আবশ্যকবোধ করিয়াছেন সেইখানেই, তাঁহারা যতি দিয়াছেন—তাহাতে কোনস্থলে অক্ষর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কোনস্থলে বা কমিয়াপড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বর্ণের মিলনবিষয়েও তত সাবধান ছিলেন না। যে সকল বর্ণের উচ্চারণ কর্ণে প্রায় একবিধ বলিয়াই বোধহয়, তাঁহারা তাদৃশ বর্ণেরও অর্থাৎ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণের এবং ৩য় ও ৪র্থ বর্ণের—যথা ক ও খ এর, ত ও থ এর, গ ও ঘ এর এবং ব ও ভএর মিল রাখিয়াগিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারা ওবিষয়ের একপ্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কাহারও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেহয় নাই, তাঁহাদিগের সৃষ্ট শৃঙ্খলাই মেরামত করিয়া আমরা পরিতেছি।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, তাঁহারা কি উপাদান ও কি উপকরণ লইয়া সে শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ পয়ার

ও ত্রিপদীর মূল কি?—যখন্ বাঙ্গালাভাষারই আদিমূল সংস্কৃত হইল, তখন তদঙ্গীভূত ছন্দের মূলও যে সংস্কৃতই হইবে ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ছন্দ যেরূপ সাধারণ, বাঙ্গালায় পয়ার সেইরূপ। সুতরাং পয়ারকেই অনুষ্টুভের স্থানীয় বলিয়া বোধহয়। কিন্তু ইহা যে, অনুষ্টুপ্ হইতেই উপন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা বলিতেপারাযাইতেছে না। যেহেতু উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে। প্রথমতঃ অনুষ্টুপ্ চতুষ্পাদ, ইহা দ্বিপদ; অনুষ্টুভে সমুদয়ে ৩২ অক্ষর, ইহাতে ২৮; অনুষ্টুভে বর্ণের গুরু লঘুতার নিয়ম আছে, ইহাতে তাহার প্রায় কিছুই নাই—শুনিতেও দুই ছন্দ কর্ণে একবিধ বলিয়া কোনমতেই বোধহয়না। এইজন্য কেহ কেহ কহেন বাঙ্গালার বর্ত্তমানপয়ার সংস্কৃত কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা পারসীর বয়েৎ নামক ছন্দের অনুকারক। একটী বয়েৎ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল—

করীমা ববখ্সায় বর্হালমা।
কে হাস্তেম্ আসিরে কমন্দে হাওয়া॥ (পন্দেনামা)

পারসীর শ্লোক বাঙ্গালাঅক্ষরে লিখিয়া তাহার বর্ণ সঙ্খ্যাদিকরা যুক্তিসঙ্গত হয় না বটে, কিন্তু আমরা ইহা অন্য অক্ষরে লিখিয়া বিচার করিতে পারিনা—সুতরাং ইহা বাঙ্গালাতেই লিখিয়া বিচার করাযাইতেছে।—দেখ, এই শ্লোক ত্রয়োদশাক্ষরে পরিমিত; ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর; পূর্ব্বার্দ্ধের যতির পর ৫টী অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির

পর ৬টী অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা বোধহয়না। ফলতঃ পয়ারের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তন্মাত্র দর্শনেই এক বিজাতীয় ভাষার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতেযাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত উহার কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার মূল বলা সঙ্গত হয়। সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যার তার অধমর্ণ হওয়া অপেক্ষা, যাহার নিকট সম্ভ্রম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ চিরন্তন মহাজনের খাদক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াই ভাল। আমরা দেখিতেছি—গীতগোবিন্দের স্থানে স্থানে যে কতকগুলি গীত আছে, তাহাদিগের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিম্নভাগে কয়েকটী সেই গীত উদ্ধৃত হইল—

রাধিকা তব বিরহে কেশব!—

সরস মসৃণমপি, মলয়জপঙ্কং। 'পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং।'
শ্বসিত পবনমনু,-পমপরিণাহং। মদন দহনমিব, বহতি সদাহং॥
দিশি দিশি কিরতি স,-জলকণ জালং। নয়ন নলিনমিব, বিগলিতনালং॥
নয়নবিষয়মপি, কিশলয়তল্পং। 'গণয়তি বিহিতহু,-তাশবিকল্পং॥'
হরিরিতি হরিরিতি, জপতি সকামং। 'বিরহ বিহিত মর,-ণেব নিকামং॥'

এই সকল ছন্দোবদ্ধ গীত অক্ষরগণনানুসারে রচিত নহে, মাত্রা * গণনানুসারে রচিত। ইহার প্রতি অর্দ্ধে

* লঘুস্বর একমাত্রা, গুরুস্বর দুইমাত্রা। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গবিশিষ্ট স্বর গুরু হয়।

ষোল মাত্রা, অষ্টমমাত্রার পর যতি এবং উভয় অৰ্দ্ধের শেষবর্ণে মিল। সুতরাং মাত্রার নিয়মানুসারে গণনায় কোন অৰ্দ্ধের অক্ষর স্থলবিশেষে বাড়িয়াযায়, স্থলবিশেষে কমিয়াপড়ে। সেইজন্যই অপরাপর পাদসকল পয়ারের তুল্য হইলেও ' ' চিহ্নিত ২য় ৮ম ও ১০ম পাদে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে ইহা বলাযাইতেপারে যে, উপরিউক্তবিধ গীতময় বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণস্বরেও এই বৃত্ত এবং পূর্ব্বলিখিত—

কতিহুঁ মদন তনু, দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী॥

ইত্যাদি পূর্ব্বোদাহৃত পদকল্পতরুর ৮৬৮ সঙ্খ্যক প্রাচীনপয়ার যেন এক বলিয়াই বোধহয়।

ত্রিপদীও গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিতপ্রকার গীত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, একথাও এক্ষণে বলা যাইতে পারে—

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপয়ানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলি সুলোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং, শীলয় নীলনিচোলং॥

এই বৃত্তের প্রত্যেক অৰ্দ্ধে ২৮টী মাত্রা আছে, ৮ম ১৬শ মাত্রায় যতি, ও মিল এবং উভয় অৰ্দ্ধের শেষবর্ণেও মিল। ইহারও অনেক পঙ্‌ক্তি অক্ষরগণনানুসারেও ত্রিপদীর সহিত একরূপ হয় এবং কর্ণেও উভয়েরই উচ্চারণ একরূপ বলিয়া বোধহয়। অতএব এই সঙ্গীতময়বৃত্তের অনুকরণেই যে, ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বোধহয় সন্দেহ নাই।

সম্ভব বিবেচনা করিতে গেলেও ইহাই প্রতীয়মান হয়।

কারণ জয়দেব বাঙ্গালাদেশের বীরভূমপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—তাঁহার গীতগোবিন্দ অতি কোমল, ললিত ও মধুরভাষায় বিরচিত—তজ্জন্যই লোকের মন বিলক্ষণ আবর্জ্জিতহয়—বিশেষতঃ উহা পরমারাধ্য রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত সঙ্গীতময় হওয়ায় এবং উক্ত সঙ্গীতের অন্যতমে "দেহি পদপল্লব মুদারং" এই অংশটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক লিখিতহওয়ার প্রসিদ্ধি থাকায়, উক্তগ্রন্থ ভাগবতদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিল। সুতরাং আদ্য কবিরা বাঙ্গালায় উক্তরূপ গীতবিরচনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশসম্ভূত তাদৃশ শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া স্বকীয় গীতের ছন্দোরচনা করিবেন, ইহা যুক্তিবহির্ভূত নহে। কিন্তু এ কথা পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, আধুনিক পয়ার ত্রিপদীতে অক্ষরগণনার যেরূপ কসাকসি হইয়াছে—পূর্ব্বে তাহা ছিলনা। আদ্য কবিরা বোধহয় প্রথমে মাত্রানুসারেই উক্তরূপ পদ্যের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কতিহুঁ মদনতনু ইত্যাদি পদ্য মাত্রাগণনানুসারেও প্রায় ঠিকই হয়। কিন্তু বাঙ্গালাতে মাত্রাগণনার রীতি রক্ষাকরা তাদৃশ সুবিধাজনক হয়না, দেখিয়া তদ্বিষয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ শিথিলাদর হয়েন এবং সুরের অনুরোধে আবশ্যকমত বিরাম দিয়া যান। অক্ষরগণনার রীতি কালক্রমে আপনাআপনি হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তদ্বিষয়ের কোন নিয়মপদ্ধতি করিয়া যান নাই এবং তদনুসারে চলেনও নাই।

'পয়ার' এই শব্দটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারাযায়না, কিন্তু বোধহয় 'পাদ'শব্দের অপভ্রংশে পায়া বা পয়া শব্দ উৎপন্ন হয়—যথা সেপায়া, খাটের পায়া ইত্যাদি এবং ঐ পয়া হইতেই পয়ার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব পয়ার শব্দের অক্ষরার্থ পাদ-(চরণ) বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপ ছন্দোবোধার্থ যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

'ত্রিপদী' ইহা সংস্কৃতশব্দ। উহার প্রতি অৰ্দ্ধে ৩ স্থানে যতি, অথবা উহার ৩টী করিয়া পদ (চরণ) থাকাতে উহাকে ত্রিপদী কহে।

তৃতীয় পরিচ্ছদ।

মধ্যকাল।

চৈতন্যদেবের উৎপত্তিকাল হইতে আমরা মধ্যকাল গণনা করিয়াছি। চৈতন্যদেব ১৪০৭শকে (১৪৮৫ খৃঃ অঃ) নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৪৫৫শকে* (খৃঃ ১৫৩৩অব্দে)

* শাকেচতুর্দশশতেরবিবাজিযুক্তে গৌরোহরি ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ তস্মিং শ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলাগ্রন্থোঽয় মাবিরভবৎকতমস্য বক্ত্রাৎ
চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্ধান।
চৈতন্য চরিতামৃত আদ্যখণ্ড।

নীলাচলে (জগন্নাথক্ষেত্রে) তিরোভূত হয়েন। মৃতবৎসা মাতার পুত্র বলিয়া নারীগণ প্রথমে ইহাঁকে 'নিমাই' এবং অত্যুজ্জ্বলগৌরকান্তি বলিয়া কেহ২ 'গৌরাঙ্গ' বলিয়াও ডাকিত। অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়; পরে পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিষয়বাসনাবিসর্জ্জনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই তাঁহার নূতন নামকরণ হইয়াছিল। ইনি অলৌকিকবুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন বলিয়া অতি অল্পকালমধ্যেই ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার পুরাণ ন্যায় স্মৃতি বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে পরম প্রাবীণ্যলাভ করেন, এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণলিখিত—

হরে র্নাম হরে র্নাম হরে র্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতি রন্যথা॥

এই বচন প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কলিতে হরিনামোচ্চারণ, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও হরিভক্তি ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই, এই মত প্রচারকরিয়া নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বহুসঙ্খ্যক স্বগণ ও স্বসহচর সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গের সহিত তানলয়বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার লোকাতীত রূপলাবণ্য ও অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধ্যাদিসন্দর্শনে পূর্ব্বহইতেই তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া কতক লোকের বোধহইয়াছিল। এক্ষণে আবার তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে নূতনপ্রকার মতের উদ্ভাবন ও সঙ্কীর্ত্তন সময়ে

অকৃত্রিম পরমানন্দে মগ্নহইয়া নর্ত্তন এবং হরিনামোচ্চারণ-মাত্রেই রোমাঞ্চ অশ্রুপাতাদি সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব অবলোকন করিয়া তাহাদিগের ঐ বোধ আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতাদি সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থসকল হইতেই উদ্ধৃত বচনপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণ করাহইত—উহার অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচলিত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী অপেক্ষা অনেক সহজ—কিহিন্দু, কিমুসলমান কাহাকেও উহা অবলম্বন করাইতে বাধা ছিলনা—এবং তিনি নিতান্ত দুঃশীলের সুশীলতাসম্পাদন, কুষ্ঠীর কুষ্ঠবিমোচন প্রভৃতি কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন, এরূপ প্রবাদ দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং অচিরকালমধ্যেই তাঁহার শিষ্য অসঙ্খ্য হইয়া উঠিল। সন্যাস আশ্রম অবলম্বনের পর তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, জগন্নাথক্ষেত্র, সেতুবন্ধ প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন, এবং তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বমত সংস্থাপনকরেন। ঐ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারকরিত, সুতরাং তিনি যেখানে যেখানে যাইতেন, সেইখানেই শিষ্যসঙ্খ্যাবৃদ্ধি হইত। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাই বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকলের পুনরুদ্ধার করেন এবং তদীয় লীলাবর্ণন-

সংক্রান্ত বহুলগ্রন্থ রচনাকরেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক রূপগোস্বামীই ১২।১৩খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২ খানি উৎকৃষ্ট নাটক, ১ খানি অলঙ্কার ও ১ খানি ব্যাকরণ আছে। তদ্ভিন্ন সনাতনগোস্বামী, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপুর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগের বিরচিত বহুল গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ চৈতন্যের উৎপত্তি হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা-দেশের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া গণনাকরিতে হইবে। ঐ সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন্‌সার সুবিচারে প্রজালোক অনেক নিরুপদ্রব ছিল; ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্বিগাহ-ধিষণা-শক্তিসহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতন-রূপ পন্থা আবিষ্কৃত করেন, এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্যসহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্য্যস্ত করিয়াদিয়া অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব-নামক অভিনবপ্রকার স্মৃতিসংগ্রহের প্রণয়নকরেন। অধিক কি বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ঐ সময়েই হইয়াছে বা হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ কথা অবশ্য বলাযাইতেপারে।

বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে বলিতে গেলে ঐ সময়কেই ইহার উৎপত্তিকাল বলিলেও বেশি অসঙ্গত হয়না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব্বোক্তরূপপদাবলীভিন্ন আদ্যকালের একখানিও গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়না। চৈতন্যের

সময় হইতেই বাঙ্গালার গ্রন্থরচনা আরব্ধ হয়। ইহাও এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদ্যকালের পণ্ডিতদিগের চিত্তভূমিতে যে কিছু নূতনভাব অঙ্কুরিত হইত, তাহা তাঁহারা পণ্ডিতসমাজেরই প্রদর্শনার্থ সংস্কৃতক্ষেত্রে রোপণ করিতেন —জনসাধারণকে দেখাইবার প্রয়োজনবোধ করিতেন না। কিন্তু চৈতন্যশিষ্যদিগের সেরূপ ভাব ছিল না। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আপামর সাধারণসকলেরই আশ্রয়ণীয়; অতএব তাঁহারা খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের ন্যায় তৎপ্রচারার্থ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ববিধ লোকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা স্বাবলম্বিত ধর্ম্মপ্রণালীসকল কেবল পণ্ডিতজনগম্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ না করিয়া সাধারণের বোধার্থ চলিতভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সময়কে বাঙ্গালাগ্রন্থপ্রণয়নের আদিকাল বলা অসঙ্গত হয় না। তাঁহাদিগের ঐ সকল গ্রন্থকেই আদর্শ করিয়া কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ লেখনীচালনা করিয়াছিলেন। অতএব দেখাযাইতেছে যে, বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইতেই বাঙ্গালাকাব্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পরবিবাদসংক্রান্ত যে সকল গল্প আছে, তাহাতে বীরধর্ম্মী শাক্তদিগের জয় ও পশুবৎ নিরীহস্বভাব বৈষ্ণবদিগের পরাজয়ের কথাই বর্ণিত হয়, তচ্ছ্রবণে শাক্তেরা সহাস্যমুখ ও বৈষ্ণবেরা ম্লানকান্তি হইয়াথাকেন। কিন্তু

কাহাদের হইতে বাঙ্গালাকাব্যের জন্মলাভ হইয়াছে? কাহারা বিবসনা মাতৃভাষাকে বসনভূষণাদি দ্বারা সাজাইবার প্রথম চেষ্টা করিয়াছে? এ বিষয়ে ইতিহাস কাহাদের নাম চিরকাল সগৌরবে স্মরণ করিবে? ইত্যাদিরূপ বিচার ও বিবাদ উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট শাক্তদিগের মুখ অবশ্য মলিন ও অবনত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালাভাষায় প্রথমে লেখনীচালনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক। অনেকে জীবগোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার আদিগ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াথাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার জীবগোস্বামীকে রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু ভক্তমালনামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, জীব মানকরনিবাসী এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ধনাকাঙ্ক্ষায় বহুকাল ব্যাপিয়া বারাণসীতে মহাদেবের আরাধনা করিলে পর, মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আদেশকরেন যে, তুমি বৃন্দাবনবাসী সনাতন গোস্বামীর নিকট গমন করিলে তিনি তোমাকে অভিমত ধনদান করিবেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেন্‌সার দুই মুসলমান মন্ত্রী চৈতন্যের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া রূপ ও সনাতন নামগ্রহণপূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশে বৃন্দাবনে তপস্যা

করিতেছিলেন। একদা সনাতন যমুনায় স্নান করিতে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে একটী স্পর্শমণি (পরেশপাথর) দেখিতেপাইলেন, কিন্তু নিজের নিস্পৃহতাবশতঃ তাহা কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিবার উদ্দেশে একখানি খাপ্‌রা চাপাদিয়া রাখিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। এমত সময়ে জীব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শঙ্করের আদেশ জানাইলে পর, সনাতন প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, আমি সন্ন্যাসী, তোমাকে দিবার জন্য ধন কোথা পাইব? অনন্তর স্পর্শমণির কথা সহসা স্মরণ হওয়াতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানের খাপ্‌রার মধ্যহইতে মণি বাহির করিয়া লইতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে তাহা না পাইয়া খুঁজিয়া দিবার জন্য সনাতনকে কহিলেন। সনাতন উত্তর করিলেন, আমি স্নান করিয়াছি, এখন্ উহা স্পর্শকরিব না; তুমি পুনর্ব্বার অন্বেষণ কর। তাহা করাতে মণিপ্রাপ্ত হইয়া জীব, পরমানন্দে বিদায় লইয়া চলিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার মনে হইল যে, আমি কি নীচাশয়! কি মূঢ়! আমি যে বস্তু পাইবার উদ্দেশে এতকাল কঠোর তপস্যা করিলাম, এ ব্যক্তি সেই বস্তু স্বহস্তে পাইয়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিল! নিজের তাহা রাখিবার ইচ্ছা করা দূরে থাকুক, ঘৃণাকরিয়া স্পর্শও করিল না! এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পথহইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সনাতনের চরণে নিপতিত হইয়া, তিনি যে ধন পাইয়া এ ধনকে তুচ্ছজ্ঞান করি-

য়াছেন, সেই ধন পাইবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সনাতন, ব্রাহ্মণকে লোভনির্মুক্ত বোধ না করিয়া প্রথমে দিতে স্বীকার করিলেন না। পরে ব্রাহ্মণ সেই হস্তগত স্পর্শমণি (যাহার স্পর্শে সকল ধাতুই স্বর্ণ হয়) যমুনার জলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার নিস্পৃহতা প্রদর্শন করিলে পর, সনাতন তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পরম ভাগবত করিয়া তুলিলেন। অনন্তর জীবগোস্বামী কৃষ্ণবিষয়ক নানা সংস্কৃতগ্রন্থ রচনাকরেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতকার তাঁহার যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বাঙ্গলা করচার নামোল্লেখ করেন নাই। আমরাও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও জীবগোস্বামীর করচা প্রাপ্তহই নাই। বোধহয় তাহা বিরলপ্রচার হইয়াছে। তাঁহার বংশীয়েরা এক্ষণে কাঠ্রা মাড়্গাঁয় বসতি করেন, তাঁহাদের বাটীতে উহা আছে কিনা, বলিতে পারা যায় না। আমাদের কোন বন্ধু 'জীবগোস্বামীর করচা, বলিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। এমনকি, সমালোচনার যোগ্য বলিয়াই বোধহয় না। তবে অনেকে জীবগোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার প্রথম রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পুস্তকখানি অতিক্ষুদ্র; ইহাতে রূপ, বৃন্দাবনে গমন করিলে পর কিরূপে সনাতন স্বপ্রভু হোসেন্সার কারাগার

হইতে পলায়ন করেন তাহা, এবং বারাণসীতে গৌরাঙ্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলন, দুইভ্রাতার গোবর্দ্ধনদর্শন—তথায় নিত্যবস্তু-বিষয়ক কথোপকথন—এবং ললিতা বিশাখা রূপমঞ্জরী চম্পকলতা প্রভৃতি কৃষ্ণসহচরীদিগের বয়োনিরূপণাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় গ্রন্থকারের কিছুমাত্র পাণ্ডিত্যপ্রকাশ নাই। তবে রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়া বোধহয় বটে। বিবিধার্থসংগ্রহলেখকের মতানুসারে উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালেই রচিত হইয়াছে।

জীবগোস্বামীর করচার পরই বোধহয় বৃন্দাবনদাস-বিরচিত চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়। ইহা ভিন্নও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সে সমুদয়ের সমালোচনাকরা তত আবশ্যক বোধহয় না। আমরা প্রধানতঃ কেবল চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতেরই সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল।

এই গ্রন্থ পরমভাগবত বৃন্দাবনদাসকর্ত্তৃক বিরচিত। বৃন্দাবন নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে সামান্যাকারে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—যথা

সর্ব্বশেষ ভৃত্যতান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ পাত্র নারায়ণীগর্ভজাত॥ ম, খ, ৫২

চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকবিরাজ বৃন্দাবনরচিত চৈত

ন্যমঙ্গলের বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উহাকেই প্রধানতঃ অবলম্ব করিয়া তাঁহার চরিতামৃত লিখিত হই-য়াছে, ইহা অনেকস্থলে স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বৃন্দাবনদাসের পরিচয়প্রদানে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই জানাযায় যে, চৈতন্যের সহচর ও শিষ্য কুমারহট্টবাসী শ্রীনিবাসপণ্ডিতের নারায়ণীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। পণ্ডিত, বোধহয় কোনকার্য্যবশতঃ নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গৃহে চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন এবং ভোজন হইলে পর, নারায়ণী তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজনকরিয়া চতু-র্বর্ষ বয়ঃক্রমকালেও কৃষ্ণপ্রেমে মগ্না হওয়াতে চৈতন্যের বড় স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঐ নারায়ণীর গর্ভজাত। এই বিবরণ দ্বারা ইহা এক প্রকার স্থির হই-তেছে যে, বৃন্দাবনদাস চৈতন্যের জীবনকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চৈতন্যের তিরোধানের পর গ্রন্থাদি রচনাকরিয়াছেন। কারণ চৈতন্যের সন্ন্যাসাবলম্বনের সময়ে অর্থাৎ যখন্ তাঁহার বয়স ২৪। ২৫ বৎসর তখন্, নারায়ণী ৪ বৎসরের ছিলেন—তৎপরে ১২ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সন্তান হওয়া এবং বৃন্দাবনকেই প্রথম পুত্র বলিয়া, ধরিয়ালইলেও চৈতন্যের অন্তর্ধানসময়ে বৃন্দাবনের বয়ঃ-ক্রম ১২ বৎসরের অধিক হয়না। তৎকালে গ্রন্থরচনা সম্ভব নহে। অতএব চৈতন্যতিরোধানের ১৫। ১৬ বৎ-সর পরে অর্থাৎ অনুমান ১৪৭০ শকে (খ্রীঃ১৫৪৮ অব্দে) বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে।

যাহাহউক, চরিতামৃতকার বৃন্দাবনরচিত চৈতন্যমঙ্গ-লের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও ভূয়োভূয়ঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যভাগবতের বিষয়ে কোনস্থলে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই—কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, বৃন্দাবনদাসবিরচিত চৈতন্যমঙ্গলনামে কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই—লোচনদাসবিরচিত এক চৈতন্যমঙ্গল আছে। বৃন্দাবনের চৈতন্যভাগবতভিন্ন আর কোন গ্রন্থ নাই এবং চরিতামৃতকার যে যে বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন জানিবার জন্য চৈতন্যমঙ্গলের উপর বরাত দিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবতেই বর্ণিত আছে—অতএব আমাদের বোধহয় চরিতামৃতকারোল্লিখিত চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে যে নামে ঐ গ্রন্থ এক্ষণে প্রসিদ্ধ, তাহা ত্যাগকরিয়া চরিতামৃতকার কিজন্য অপর নাম দ্বারা উহার উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমাদের এই অনুমান হয় যে, গ্রন্থকার নিজমুখে কোন স্থলে ঐ গ্রন্থের কোন নামকরণ করেন নাই, কেবল মুদ্রিত পুস্তকের নির্দ্দেশপত্রে মুদ্রাকারেরা " চৈতন্য ভাগবত " বলিয়া নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং আদিখণ্ডের শেষে " ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডং সম্পূর্ণম্ " এইমাত্র উল্লেখ আছে। অতএব এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থকে কেহ চৈতন্যভাগবত কেহবা চৈতন্যমঙ্গল কহিত—কালক্রমে দ্বিতীয় নাম বিলুপ্ত হইয়া প্রথম নামটাই রহিয়া

গিয়াছে। চরিতামৃতকার মুদ্রিত পুস্তক পান নাই। তিনি যে হস্তলিখিত পুস্তক পাইয়াছিলেন, তাহাতে আদিখণ্ডের শেষস্থ 'চৈতন্যভাগবত' এরূপ নামোল্লেখ ছিল কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। অতএব তাঁহার ঐ নাম নির্দ্দেশ না করা অসঙ্গত বোধহয়না। তদ্ভিন্ন তিনি ঐ গ্রন্থের শেষ খণ্ডের দুই স্থানে 'চৈতন্যমঙ্গল' এই নাম দেখিয়াছিলেন যথা—

তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে। বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে॥৬অ,
নাচেনঅদ্বৈতসিংহ আনন্দেবিহ্বল। চতুর্দ্দিকে গায়সভে চৈতন্যমঙ্গল॥৭অ,

অতএব এই দেখিয়াই হউক অথবা কোনরূপ ভ্রমবশতই হউক এই গ্রন্থের নাম চরিতামৃতকারের 'চৈতন্যমঙ্গল' বলিয়াই বোধহইয়াছিল ; নচেৎ বৃন্দাবনদাসরচিত চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যভাগবত পৃথক্ গ্রন্থ নহে। যাহা হউক আমরা চৈতন্যভাগবতনামেই ইহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম। চৈতন্যভাগবত কিছু বৃহৎ পুস্তক। ইহা আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়াভূমিতে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে—মধ্যখণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীনিবাস হরিদাসপ্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তদিগের নিকট ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, পাতকীদিগের উদ্ধারকরণ প্রভৃতি বহুবিধ লোকাতিগ কার্য্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে। অন্ত্য বা শেষ খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কাঁটোয়া (কণ্টক নগর) স্থিত কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন,

শিরোমুণ্ডন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামগ্রহণ, লীলাচলে গমন, গৌড় দেশে পুনরাগমন, সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন প্রচার, শিষ্যসঙ্খ্যা-বৃদ্ধি ও পরিশেষে লীলাচলে গিয়া পুনরবস্থান প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু কোন স্থানে চৈতন্যের মৃত্যু বর্ণিত হয়নাই—বোধহয় ভাগবতেরা তাহা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া সে অংশ ত্যাগকরা হইয়াছে।

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। পুরাণাদি অনেক গ্রন্থ হইতে অনেক বচন মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বড় গোঁড়া বৈরাগী ছিলেন। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চৈতন্যকে অবতার বলিয়া মানিতেন না, এজন্য তিনি যেখানে যো পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া—

> এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
> তবে নাথি মার তার শিরের উপরে॥

ইত্যাদিরূপে সাধুজনবিগর্হিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াও গালি দিতে ক্রুটি করেন নাই। এমন কি বোধহয় তাঁহার হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহাহইলে তিনি এক দিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন সকললোকেরই প্রাণসংহার করিতেন। তিনি নিজে যেরূপ উদ্ধত ছিলেন, বর্ণিত নায়ককেও সময়ে সময়ে সেইরূপ উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যখন্ গৌরাঙ্গকে সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিষেধকারী নবদ্বীপস্থ কাজীর ভবনে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন্ গৌ-

রাঙ্গ শিষ্যসমভিব্যাহারে কাজীর বাগানবাগিচা নষ্ট করিয়া ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া নস্তানাবুদ করিয়া পরিশেষে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় কাজীর গৃহে অগ্নি দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চৈতন্যকে ওরূপ উদ্ধত বলিয়া জানিতাম না। ধর্ম্মসংস্থাপক দরিদ্রব্রাহ্মণের পক্ষে ওরূপ হওয়া উচিত বোধহয়না। চৈতন্যচরিতামৃতকার অমন স্থলেও গৌরাঙ্গকে তত উদ্ধত বর্ণন করেন নাই।

যাহাহউক, বৃন্দাবনদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব মন্দ ছিলনা। তিনি যে স্থলে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বেশ পরিষ্কারও বিশদ হইয়াছে, পাঠমাত্র আমূল বৃত্তান্ত স্পষ্ট-রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। তদ্ভিন্ন তিনি হাস্য করুণ প্রভৃতি রসের বিলক্ষণ উদ্দীপন করিয়াছেন। কাজীর অনুচরেরা কীর্ত্তন, মূর্চ্ছা ও ক্রন্দনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কথোপকথন করিয়াছে, তাঁহাতে বিলক্ষণ পরিহাস-রসিকতা আছে এবং গৃহহইতে বহির্গমনকালে শচীসমীপে গৌরাঙ্গের বিদায়গ্রহণঅবসরে করুণ-রসের সুন্দর উদ্দীপ্তি হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কিয়দংশ নিম্ন-ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।———

কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়। সমৃদ্ধি দেখি আপনার শাস্ত্র গায়॥ রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট গিয়া। কি কর চলহ ঝাট যাই পলাইয়া॥ যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা। আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥ এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য। সেই সে হিন্দুর ভূত তাহারই সে কার্য্য॥ কেহ বলে বামনা এতেক

কান্দে কেন। বামনার দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥ কেহ বলে বামনা আছাড় যত খায়। সেই দুঃখে কান্দে হেন সমুঝি সদায়॥ কেহ বলে বামনা দেখিলে লাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥ ম, খ, ২৩অ,।

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥ মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে॥ বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন। কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥ না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥ কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন। অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥ অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র গমন॥ অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥ পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥ ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥ তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥ প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥ (ঐ ২৪ অ,)

গ্রন্থকারের ভাবগ্রাহিতারও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত নিম্নভাগটী উদ্ধৃত হইল—

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত শক্তি থাকে তত দূর উড়ি যায়॥ এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥ (ঐ ঐ)

চৈতন্যভাগবতের ভাষা খুবমিষ্ট নাহউক, বিশদ বটে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ভাষাদ্বারা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হইয়াছে। তবে প্রাচীনকালের ভাষা, এ জন্য ইহাতে কতক খুব সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, এবং কতক নিতান্ত অপভ্রংশ শব্দও দেখিতেপাওয়াযায়। ক্রিয়াপদও স্থানে স্থানে সেকেলে গোছের আছে। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ কয়েকটী শব্দ ও

ক্রিয়ার উল্লেখ করাযাইতেছে, (সংস্কৃত) কথংকথমপি, বাকোবাক্য, সাঙ্গোপাঙ্গ, কাষায়; (প্রাকৃত) পহুঁ, চন্দ, ভান, ষহি; (অপভ্রংশ) তছু, মুঞি, যৈঁছে, কথি; (ক্রিয়া) কদর্থিবে, বোলে, করিমু, নখিতে ইত্যাদি।

এইগ্রন্থ সমুদয়ই পয়ারে গ্রথিত, কেবল কয়েকটী গীতস্থলে ত্রিপদী আছে। ইহার সময়ে মিত্রাক্ষরতা ও মিতাক্ষরতার নিয়ম সম্যক্ অনুসৃত হয়নাই—নাম=স্থান; অবাক্য=অবাহ্য; প্রভাব=অনুরাগ; যোগ=লোভ; দুগ্ধ=মুদ্গ; রাস=জাত; নহে=লয়ে ইত্যাদি শব্দ সকলও মিত্রাক্ষরস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কবির পরবর্ত্তী কবিদিগেরও রচনায় মিতাক্ষরতার যেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহাঁর কিছু নৈসর্গিকী-শক্তি ছিল বলিয়া, ইহাঁর রচনায় সেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়না। পূর্ব্বোদাহৃত সন্দর্ভ মধ্যেই ইহার প্রমাণ লক্ষিত হইবে।

চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বৃন্দাবনদাসের আর কোন গ্রন্থ ছিল কিনা, তাহা স্থির বলাযায়না, কিন্তু ঐ গ্রন্থাতিরিক্তও কতকগুলি গীত তাঁহার ছিল, তাহা ইতস্ততঃ দৃষ্টহইয়া থাকে। বৃন্দাবনের সময়ে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরীর গীতের প্রচার ছিল—তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া তদুপরি কটাক্ষ করিয়াছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যভাগবতের রচনার কিছুকালপরেই কৃষ্ণদাস-কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতনামক গ্রন্থের রচনা করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত ঝামট্‌পুর নামক গ্রামে কৃষ্ণদাসের বাস ছিল। কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি স্বগ্রন্থের আদিখণ্ডান্তর্গত ৫ম অধ্যায়ে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দরূপী বলরাম স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শনদিয়া বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন গমনকরিয়া রূপ, সনাতন ও রঘুনাথদাসের আশ্রয় ও শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতেথাকেন। চরিতামৃতগ্রন্থ বোধহয় ঐস্থানে বসিয়াই রচনাকরিয়া থাকিবেন। কারণ অনেক স্থানে " আইনু বৃন্দাবন " " এই বৃন্দাবন " এইরূপ কথা গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত আছে।

গ্রন্থকার কোন স্থানে নিজের সময়নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উপরিলিখিতরূপ পরিচয়দানদ্বারাই ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি ১৪৯৫ শকের (খৃঃ ১৫৭৩ অব্দের) পর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই এইগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নামক সংস্কৃতনাটক ১৪৯৫ শকে লিখিত হয়। চরিতামৃতে ঐ নাটকের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত আছে—সুতরাং ইহা তৎপূর্ব্বসময়ে রচিত হওয়া

সম্ভব নহে। না হউক কিন্তু উহার অধিককাল পরে রচিত, এ কথাও বলা যাইতে পারে না—কারণ তিনি যাঁহাদের শিষ্যতাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চৈতন্যের সমসাময়িক লোক—চৈতন্যের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের অধিককাল জীবিত থাকা অসম্ভব।

চরিতামৃতও চৈতন্যের সমস্তলীলাসংক্রান্ত পদ্যময় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাও আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যভাগবতের খণ্ডত্রয়ে যেরূপ বিবরণ বর্ণিত আছে, ইহার খণ্ডত্রয়েও প্রায় সেইরূপ বিবরণ; তবে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে এই মাত্র। ইনি অনেকবার বলিয়াছেন, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে যে বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নাই, তাহারই সবিস্তার বর্ণনা করিবেন। ফলতঃ তাহাই বটে; চরিতামৃতে চৈতন্যের যত দেশভ্রমণের কথা আছে, ভাগবতে তাহা নাই। অনেক ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যেরও বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

কবি সংস্কৃতে একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই কয়েকটী করিয়া স্বরচিত শ্লোক বসাইয়া দিয়াছেন। প্রথম কয়েকটী শ্লোকের সংস্কৃতে টীকাও করিয়াদিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক পাঠকরিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়াযায়। তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ এবং তাৎকালিক মহাত্মগণের রচিত বিদগ্ধমাধব, হরিভক্তিবিলাস,

বিল্বমঙ্গল, লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দানকেলিকৌমুদী, স্তবমালা, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে ঐ সকল শ্লোকের বাঙ্গালাপদ্যে অর্থ করিয়াদিয়াছেন। চৈতন্যের অবতারবিষয়ে কোন পুরাণে বর্ণনা নাই, এজন্য অনেকে চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা করেননা, এই দেখিয়া তিনি ভাগবতের কৃষ্ণবিষয়ক কতিপয় শ্লোককে পরম কৌশলসহকারে চৈতন্যবিষয়ক করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চরিতামৃত বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ; অতএব ইহার বৃত্তান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়—সত্যবোধে যাহাতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, গ্রন্থকার তজ্জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবিত্বশক্তিপ্রকাশের জন্য সেরূপ চেষ্টা করেননাই। তাঁহার রচনা পদ্যময় এইমাত্র—রামায়ণ, মহাভারতাদির গ্রন্থকারেরা ধর্ম্মকথার সহিত যেরূপ চমৎকার কবিত্বপ্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, ইনি তাহার কিছুই করেননাই। ইনি কথায় কথায় যদি অত অধিক সংস্কৃতবচন উদ্ধৃত না করিতেন, তাহাহইলে ইহাঁর গ্রন্থ বোধহয় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত। অধিক বচন উদ্ধৃত করায়, পাঠমাত্র গ্রন্থের সমুদয় বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। বোধহয় গ্রন্থের পারিপাট্যসম্পাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিলনা—প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা চৈতন্য-

মতকে প্রামাণিক ও তাঁহার নিজগ্রন্থকে শ্রদ্ধাস্পদ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্যছিল। যাহাহউক তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। ভাগবতেরা এই গ্রন্থের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করেন, অনেকে প্রতিদিন গন্ধপুষ্পদ্বারা ঐপুস্তক পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না।

চরিতামৃতের ভাষা বিশেষ সুশ্রব্য, বা সুন্দর নহে। চৈতন্যভাগবতের রচনাতে যেমন কতক শুদ্ধ সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, কতক নিতান্তঅপভ্রংশ শব্দ ও কতক পুরাতন ক্রিয়ার মিশ্রণ লক্ষিত হয়, ইহাতেও তাহাই আছে। অস্ত্র, আরত্রিক, অর্থবাদ, মৃদ্‌ভাজন; বোল, তান, মহান্ত, দোহে; তিহোঁ, ঐছে, মুঞি, কথি; দঢ়াইল, পুছিল, জুয়ায়, করিমু ইত্যাদি উহার প্রমাণ। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসপ্রভৃতির সময়ে সংযুক্তশব্দের বিপ্রকর্ষণক্রিয়ার যেরূপ প্রাচুর্য্য ছিল, চরিতামৃতের সময়ে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল।

চরিতামৃত প্রায় সমস্তই পয়ারে নিবদ্ধ, কেবল কয়েক স্থানে ত্রিপদী আছে। ছন্দে অক্ষরসাম্যের নিয়মের যতদূর ব্যতিক্রম হইয়াছে, মিত্রাক্ষরতার ততদূর ব্যতিক্রম হয় নাই। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়াগেল—

এইরূপ কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে। প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপসনাতনে॥
মহা প্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। রূপসনাতন সবার কৃপা গৌরবপাত্র॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥

কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপসনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দুহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রিশয়ন॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
(ম, খ, ১৯ অ.)

চরিতামৃতের আদ্যন্তই এইরূপ বাঁকাভাষায় লিখিত নহে—অনেকস্থলে বেশ সরলভাষা আছে। অতএব অনুমান হয় গ্রন্থকার, স্বাধিষ্ঠানবৃন্দাবনের অনেককথাও গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত 'অদ্বৈতসূত্র-কড়চা' 'স্বরূপবর্ণন' প্রভৃতি নামে আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতেও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায়

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।——কহে কৃষ্ণদাস॥

এইরূপ ভণিতি আছে। সে সকলগ্রন্থও এইরূপ গৌরাঙ্গ—সংক্রান্ত, অতএব তাহাদের আর পৃথক্ সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

কৃত্তিবাস—রামায়ণ।

বৈষ্ণবসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালাগ্রন্থসকলের অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমে ক্রমে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ, চণ্ডী, মনসারভাসান, মহাভারত, শিবসঙ্কীর্ত্তন, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কাব্যসকলের প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস-রচিত রামায়ণের কথাই অগ্রে বলিতে হইতেছে।

কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, বা কোন্ সময়ে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে কোন স্থানে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তাঁহার গ্রন্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম পুরাণের উপাখ্যান—সুতরাং গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়ের রীতি নীতি প্রভৃতি সন্দর্শনকরিয়া সময়ের অনুমান করিবার যো নাই। গঙ্গাবতরণস্থলে তিনি মেড়তলা, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, আক্‌নামাহেশ প্রভৃতি মূলরামায়ণে অনুল্লিখিত কয়েকটী গ্রামের নামোল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে সপ্তদ্বীপের সারস্থান বলিয়া নবদ্বীপের প্রশংসা করিয়াছেন। চৈতন্যদেবের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উহার ঐরূপ প্রশংসা হওয়া অসম্ভব বোধহয়না। তাহাহইলে কৃত্তিবাস চৈতন্য-দেবের পরসাময়িক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন।

গ্রন্থের ভাবাদৃষ্টে অনেকস্থলে সময় অনুমিত হইয়া-থাকে, কিন্তু প্রকৃতবিষয়ে তাহা করিবারও কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইয়াছে। কারণ এক্ষণে যে সকল মুদ্রিত রামায়ণ দেখিতে পাওয়াযায়, কেহ কেহ বলেন, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন সাহিত্যাধ্যাপক ৺ জয়গোপাল তর্কা-লঙ্কারমহাশয়কর্ত্তৃক সংশোধিত; সুতরাং উহা কৃত্তিবাসের প্রকৃতরচনা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। অতএব তদ্দৃষ্টে কোন সিদ্ধান্তকরা সঙ্গত হয়না। প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ অতীব দুষ্প্রাপ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। উহা

সন ১০৯৯ সালে লিখিত অর্থাৎ প্রায় ২০০ বৎসরের.. পুস্তক। উহার এবং মুদ্রিতরামায়ণের ভাষা ছন্দ ও আনুপূর্ব্বী বিষয়ে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখাযায়। নিম্নভাগে উভয় পুস্তকেরই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বালিবধে তারার উক্তি।

তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে।। সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ। লুকাইয়া মারিলে পাইলাম বড় তাপ।। শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান্। ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ।। একেবারে আমার করিতে সর্ব্বনাশ। সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ।। বিচ্ছেদ যাতনা যত জানহ আপনি। তবে কেন আমারে হে দিলে রঘুমণি।। প্রভু শাপ না দিলেন সদয় হৃদয়। আমি শাপ দিব তাহা ফলিবে নিশ্চয়।। সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে। সীতারে আনিবে বটে বহু পরিশ্রমে।। কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ। কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস।। কান্দাইলে যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী।। আমি যদি সতী হই ভারতভিতরে। কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে।। কলিকাতা-মুদ্রিত রামায়ণ।

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তমকুলে। আমার পতি কাটিলে তুমি পাইয়া কোন ছলে।। দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ। আদেখা মারিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ।। প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণ হৃদয়। মুঞি শাপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয়।। সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে। সীতা ঘরে আসিবেন অনেক পরিশ্রমে।। সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ। কতো দিন বহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ।। তুমি যেমন কাঁদাইলে বানরের নারী। তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতালপুরী।।

প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ।

এই সকল সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতেপারাযায় যে, জয়গোপালতর্কালঙ্কারমহাশয়দ্বারাই হউক বা যাঁহাদ্বারাই হউক, মুদ্রিতরামায়ণ মূল কৃত্তিবাসীরামায়ণ হইতে অনে-

কাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। উপরিউদ্ধৃত অংশে দৃষ্টহইবে যে, কৃত্তিবাস ছন্দের অক্ষরগণনার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেননাই; তাঁহার গ্রন্থ সঙ্গীতহইবে, এইঅভিপ্রায়ে গানের স্বর মিলাইতে যেখানে যত অক্ষর দেওয়াআবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দিয়াছিলেন। মুদ্রিত রামায়ণ বিশুদ্ধ পয়ারের রীতিতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোন অংশবা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল মুদ্রিত রামায়ণ দর্শনকরিয়া কৃত্তিবাসের রচনার সমালোচনকরা কোন মতেই সঙ্গত হয় না—কিন্তু পূর্ব্বেই বলাহইয়াছে যে, প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ সমগ্ররূপে পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাদিগকেও অধিকাংশস্থলেই মুদ্রিতরামায়ণের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ হানি নাই; যেহেতু উভয়ের মাংসযোজনাবিষয়ে বৈলক্ষণ্য থাকিলেও অস্থিভাগের কিছুমাত্র পরিবর্ত্ত হয় নাই। কবিত্ব সেই অস্থিগত।

মুদ্রিত রামায়ণের ভাষা ও ছন্দের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধতাদর্শনে পূর্ব্বে আমাদের এক প্রকার স্থির বোধহইয়াছিল যে, কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের পরসময়বর্ত্তী লোক। কিন্তু প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন পূর্ব্বোক্তপুস্তকখানি দেখিতে পাইয়া তাহা আমাদের আর একবারও বোধহয়না,—কৃত্তিবাসকে অবশ্যই মুকুন্দরামঅপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে ইচ্ছা হয়।

সকলেও তাহাই বলিয়াথাকেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কত দিন পূর্ব্বে কৃত্তিবাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সে কথা কেহই স্থির বলিতে পারেন না। বলিবার কোন উপায়ও নাই। যাহাহউক অনেকে অনুমান করেন যে, চণ্ডীরচনার ৩০। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। যদি এ অনুমান স্থির হয়, তবে মোটামোটি এই বলাযাইতেপারে যে, ১৪৬০ শকে [১৫৩৮ খৃঃঅব্দে] রামায়ণের রচনা হয়। যেহেতু চণ্ডীকাব্যের সময়নিরূপণকালে সপ্রমাণ করাযাইবে যে, উহা ১৪৯৯ শকে [১৫৭৭ খৃঃঅব্দে] রচিত হইতে আরব্ধ হইয়াছিল।

কৃত্তিবাসের সময়নিরূপণ করা যেরূপ দুষ্কর, তাঁহার জীবনবৃত্ত স্থিরকরাও সেইরূপ দুষ্কর। তাঁহার রচিত গ্রন্থমধ্যে এই কয়েকটী কবিতা আছে——

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ (অরণ্যকাণ্ড)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতী।
যার কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী॥ (কিষ্কিন্ধ্যা)
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্বলোকে।
পুরাণ শুনিয়া গীত গাইল কৌতুকে॥ (আরণ্য)
গীত রামায়ণ, করিল রচন, ভাষাকবি কৃত্তিবাস॥ (কিষ্কিন্ধ্যা)

এই গুলি পাঠ করিয়া জানিতেপারাযায় যে, কৃত্তিবাস ফুলিয়া নামক প্রসিদ্ধগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ বা মাতামহের নাম মুরারি ওঝা ছিল। এক্ষণে বিষবৈদ্য ও ডাইন পিশাচাবিষ্ট-

দিগের চিকিৎসকদিগকে ওঝা বলিয়াথাকে—কিন্তু মুরারি ওঝা বোধহয় সেরূপ ছিলেন না। কারণ পূর্ব্বে পৌরোহিত্যব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণের ওঝাই উপাধি ছিল; যেহেতু ওঝাশব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায়শব্দের অপভ্রংশে জন্মিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে সাঁইওঝা দনাইওঝা প্রভৃতির বিবরণে ঐ কথাই সপ্রমাণ হইয়াথাকে। এক্ষণেও দিনাজপুর মুর্শীদাবাদ প্রভৃতি অনেকস্থানে ওঝাউপাধিবিশিষ্ট পৌরোহিত্যব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। বোধহয় কৃত্তিবাসও ঐরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কৃত্তিবাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, আমি পুরাণ শুনিয়া গ্রন্থ রচনা করিলাম এবং তিনি ভাষাকবি বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এতাবতা অনেকে অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এ অনুমান অমূলক বলিয়া বোধহয়না। অসংস্কৃতজ্ঞ লোকেরাও যে, পাঁচজন ভাল লোকের নিকট জানিয়া শুনিয়া বিচিত্রশব্দবিন্যাসসমন্বিত গ্রন্থাদি রচনা করিতেপারেন, তাহা দাশরথিরায় ও ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ বিলক্ষণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ দুই কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, ইহা এক্ষণকার অনেকেই জানেন; কিন্তু উহাঁদের রচনা, দেখিয়া বিবেচনা করিতে গেলে কেহই উহাঁদিগকে অসংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া বোধ করিতে পারিবেন না। কৃত্তিবাসের স্বমুখে পরিচয়দানব্যতিরিক্ত তাঁহার অসংস্কৃতজ্ঞতাবিষয়ে এই এক

প্রধান প্রমাণ পাওয়াযায় যে, তাঁহার গ্রন্থের সহিত বাল্মীকি-রচিত মূলরামায়ণের অনেক অনৈক্য, অথচ তিনি যে, বাল্মীকিকে অবলম্ব না করিয়া অন্যকোন রামায়ণ অবলম্ব করিয়াছিলেন, তাহাও বোধহয়না; যেহেতু তিনি কথায় কথায় বাল্মীকিরই বন্দনা করিয়াছেন। কোন কোন কবি একটা কিছু মূল অবলম্বন করিয়া তাহাতে নিজনৈসর্গিক কবিত্ব-সম্ভূত নূতন অংশ সংযোজিত করিয়া উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেন সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃতস্থলে তাহা বোধহয়না। যেহেতু বাল্মীকির মত লিখিতে আরম্ভ করিলাম, বলিয়া কবি যে স্থলে স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেই স্থলেই তিনি বাল্মীকির মত কিছুমাত্র না লিখিয়া অন্যরূপ লিখিয়াছেন ইহা দেখিয়া তাঁহার সংস্কৃতানভিজ্ঞতাবিষয়ে কোন সংশয়ই থাকে না। ভাষারামায়ণের ভূরি ভূরি স্থলে এই বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়াযায়—বাহুল্য ভয়ে তৎসমস্তের উল্লেখ না করিয়া উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

১মতঃ—কৃত্তিবাস, বাল্মীকির মত বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন——

"রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর।
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর॥ ইত্যাদি।

বোধহয় তাঁহারই এইরূপ লেখাতে দেশমধ্যে "রাম না হতে রামায়ণ" এই কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাল্মীকি, স্বরচিতগ্রন্থের কোনস্থলে এমন কথা লেখেন নাই; বরং

মুল রামায়ণে একপ্রকার স্পষ্টাক্ষরেই লেখাআছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে মূলরামায়ণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক। তাহার প্রারম্ভে এইরূপ আছে যথা—

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাম্বরং।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকি র্মুনিপুঙ্গবং॥
কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্। ইত্যাদি

" তপস্বী বাল্মীকি, বেদাধ্যয়ননিরত বাগ্মী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বর্ত্তমানকালে এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্ বীর্য্যশালী (ইত্যাদি) আছেন " ইত্যাদি। নারদ এই প্রশ্ন শ্রবণকরিয়া কহিয়াছেন মুনে! এরূপ গুণসম্পন্ন লোক সংসারে অতি দুর্লভ; তথাপি সেরূপ মনুষ্য যিনি আছেন, তাঁহার বিষয় শ্রবণ কর। এই বলিয়াই কহিয়াছেন—

ইক্ষাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ইত্যাদি

তমেবংগুণসম্পন্নং (রামং) দশরথঃ স্নুতং। যৌবরাজ্যেন সংযোক্তু মৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ॥ তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা-ভার্য্যাহথ কেকয়ী। পূর্ব্বং দত্তবরা দেবী বর মেন মযাচত॥ ইত্যাদি

" ইক্ষাকুবংশসম্ভূত রাম নামে বিখ্যাত রাজা আছেন " অনন্তর নারদ রামের ভূরি প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছেন "এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্র রামকে রাজাদশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দত্তবরা তাঁহার ভার্য্যা কেকয়ী সেই অভিষেকসামগ্রী সন্দর্শন করিয়া রাজার

নিকট পূর্ব্বদত্ত সেই বর প্রার্থনাকরিলেন ” ইত্যাদিরূপে রাবণবধ ও রামের রাজ্যপ্রাপ্তিপর্য্যন্ত রামায়ণের সমুদয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ঐচ্ছৎ' 'অযাচত' এইরূপ অতীতকালের ক্রিয়াপদপ্রয়োগদ্বারাই বর্ণনাকরিয়াছেন; কেবল রামের রাজ্যপ্রাপ্তির উত্তরকালীন কার্য্যসকল——যথা—

'ন পুত্রমরণং কেচিদ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ।'
'নার্য্য শ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥'
'দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানিচ।'
'রামো রাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্যতি॥'

“ রামরাজ্যকালে কেহ কখনও পুত্রের মরণ দেখিবে না—নারীগণ কখন বিধবা হইবে না—রাম ১১ হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন”—ইত্যাদি 'দ্রক্ষ্যন্তি' 'ভবিষ্যন্তি' 'প্রয়াস্যতি' এইরূপ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দর্শন করিয়া রামায়ণতিলকনামক টীকার রচয়িতা বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৯০তম শ্লোকের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

অনেন রাবণবধানন্তরং রামে রাজ্যং প্রশাসতি বাল্মীকে র্নারদং প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে।

“ ইহা দ্বারা রাবণবধের পর রামের রাজ্যকালে বাল্মীকি নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা জানা যাইতেছে”। যাহাহউক, এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এই এককথা বলিলেই হইবে যে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির মত বলিয়া “ রাম জন্মিবার ষাটি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ ” এই কথা যে, লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক বাল্মীকির মত নহে। কবির

সংস্কৃতভাষায় বিশেষ অধিকার থাকিলে বোধহয় এরূপ ভ্রম হইত না। ফলতঃ রামায়ণের এইরূপ ভবিষ্যদ্বাকথন বাল্মীকীয়ে, অধ্যাত্মরামায়ণে, বা অদ্ভুতরামায়ণে কোথাও নাই; কেবল পদ্মপুরাণান্তর্গত পাতাল খণ্ডের ৮৪তম অধ্যায়ে শুকসারিকার উক্তিতে লিখিত আছে।

২য়তঃ—লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা রাবণকে অন্যান্য বর দিয়া শেষে কহিতেছেন—

মর্ম্মে যবে ব্রহ্মঅস্ত্র পশিবে তোমার। তখনি রাবণ তুমি হইবে সংহার॥ অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে। তোমার যে মৃত্যু অস্ত্র রবে তব ঘরে॥ সৃজিত করেছি আমি সেই ব্রহ্ম বাণ। ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥ বর শুনে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন। স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকিতে কন॥ ইত্যাদি।

ঐ প্রসঙ্গেই আবার——

পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে। বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকের মতে॥ বিভীষণ কহিলেন রাবণগোচরে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥

ইত্যাদি উক্তির পর বিভীষণের উপদেশে ছলনাপূর্ব্বক মন্দোদরীর নিকট হইতে হনুমান কর্ত্তৃক মৃত্যুশর আনয়ন ও সেই শরদ্বারা রাবণবধ বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু মূল বাল্মীকি রামায়ণে একথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তথায় এইমাত্র লিখিত আছে যে, ইন্দ্রসারথি মাতলির উপদেশে রাম ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া রাবণের বধ সম্পাদন করেন।

৩য়তঃ—হতাহত বানর সৈন্যের সজীবতাসম্পাদনার্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে হনুমান দ্বারা ঔষধ আনয়ন করাইবার প্রস্তাবে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

নাহিক এসব কথা বাল্মীকিরচনে। বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, অদ্ভুতরামায়ণের কোনস্থলে এই ঔষধানয়নের বিন্দুবিসর্গের উল্লেখ নাই! এদিকে বাল্মীকিরামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৪৩ তম সর্গে ইহার সবিস্তরবর্ণন আছে।

এতদ্ভিন্ন ইন্দ্রজিৎবধের পর মহীরাবণ ও অহিরাবণবৃত্তান্ত, গন্ধমাদনপর্ব্বত আনয়নসময়ে হনূমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজনীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূমিলিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের অগ্রজত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাসলিখিত ভূরিভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকিরামায়ণের সহিত বিসম্বাদী। অতএব বোধহয়, কথকের মুখে রামায়ণ শ্রবণকরিয়া কবি এই গ্রন্থের রচনা করিয়া থাকিবেন। "পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে।" তাঁহার নিজের এই লেখাদ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কথকেরা উপাখ্যানভাগের বৈচিত্র্যসম্পাদনার্থ নানাপুরাণের বিবরণ একত্র সম্বদ্ধ করিয়াথাকেন—ইনিও বোধহয় সেইরূপ করিয়াছেন। ইহাঁর গ্রন্থের আদিকাণ্ডের প্রথমভাগে, কালিদাসের রঘুবংশবর্ণিত অথবা পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডবর্ণিত উপাখ্যানের অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। তদতিরিক্ত তাঁহার বর্ণিত উপাখ্যানগুলি যে, অমূলক অর্থাৎ কোন না কোন রামায়ণে নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতেপারাযায়না। রামের চরিত্রটী এমনই মধুর যে,

পুরাণকর্ত্তাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই উহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই—সকলেই কোন না কোন প্রসঙ্গে রামচরিতটী বর্ণনকরিয়াছেন এবং তত্তৎস্থলে কেহ কেহ উপাখ্যানাংশে কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ নূতনতাযোগও করিয়াছেন। ভবভূতি, জয়দেব, মুরারি প্রভৃতি সংস্কৃতনাটককারেরাও ঐরূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহাহউক পুরাণ ও উপপুরাণের সঙ্খ্যা অনেক—সুতরাং তৎসমস্ত পাঠকরিয়া ভাষা রামায়ণের বাল্মীকিবিরুদ্ধ কোন্ কোন্ অংশের সহিত কোন্ কোন্ পুরাণের একতা আছে, তাহা প্রদর্শনকরা কঠিন। এমন কি, সকলপুস্তকই সংগৃহীত হইবার সুবিধা নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাল্মীকি-রামায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, ভারতান্তর্গত ও পদ্মপুরাণান্তর্গত রামোপাখ্যান এই কয়েকখানি ভিন্ন রামচরিতবিষয়ক আর কোন গ্রন্থই দেখিতে পাইনাই।

যাহাহউক এস্থলে আর একটী কৌতুককর কথা উপস্থিত হইতেছে। আমাদের একটী গল্প শুনাআছে যে, একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প করিয়া আপন ভবনে রামায়ণ পাঠ করেন এবং পাঠান্তে, নিতান্তক্ষুণ্ণমনে ঐ কার্য্যকরণ-জন্যপাতকের প্রতীকারার্থ রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করেন! ইহাতে লোকে বিস্মিত হইয়া কারণজিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন "আমি গঙ্গাজল ও তুলসী হস্তে লইয়া 'তপঃ-

স্বাধ্যায়নিরতং' ইত্যাদি 'তদ্ব্রহ্মাপান্বমন্যত' ইত্যন্ত মহর্ষিবাল্মীকিপ্রোক্ত সমস্তরামায়ণ পাঠকরিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—কিন্তু পাঠক ও ধারকের সমুদয়ে তিন খান পুস্তক ছিল—ঐ তিন পুস্তকেরই স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ ন্যূনাধিক্য ও বিপর্য্যয় যে, পরস্পরের কিছুমাত্র ঐক্য হয় নাই। আমার বোধ হইয়াছে যে, যদি আরও ২। ৩ খান পুস্তক সংগ্রহকরিতাম, তাহাদেরও পাঠের ঐরূপ অনৈক্য হইত। ঐ সকল পাঠের মধ্যে কোন্ পাঠ প্রকৃত, তাহার কিছুই বুঝিবার যো নাই—হয়ত আমাদের সংগৃহীত তিন পুস্তকেই বাল্মীকিরচিত প্রকৃতপাঠের অনেক ন্যূনতা আছে—তাহা হইলে আমি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার ভঙ্গ হইয়াছে, সুতরাং তৎপ্রতীকারার্থ প্রায়শ্চিত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য!" ফলতঃ রামায়ণের পাঠসকল বড়ই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণ মারভন্তে" এই ন্যায়ে ভাষারামায়ণেও কি ঐ বিপর্য্যাস উপস্থিত হইবে! আমরা এই কার্য্য-প্রসঙ্গে কয়েকখানি ভাষারামায়ণ সংগ্রহকরিয়াছি, তাহার একখানি খৃঃ ১৮৩৩ অব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বারমুদ্রিত ও অপরগুলি ভিন্নভিন্ন সময়ে কলিকাতায় মুদ্রিত। এই সকল পুস্তকের পাঠও স্থানে স্থানে কিছুমাত্র মেলে না!—বিশেষতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধপ্রসঙ্গে ঐ সকল পুস্তকের পাঠ একেবারে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। এমন কি, শ্রীরামের

ভগবতীপূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন প্রভৃতির প্রস্তাব শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই। উত্তরকাণ্ডেও সীতাবনবাসকালে শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকসকলে অনেক অধিক আছে। কলিকাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠগুলি পরস্পর অধিক বিভিন্ন নহে। কিন্তু উহাদের সহিত শ্রীরামপুরমুদ্রিতের পাঠসকল অনেকস্থানেই যারপর নাই বিসম্বাদী।

ইহার কারণ কি? সংস্কৃতরামায়ণের ভাষা অতি সহজ, এজন্য অনেকে স্বরচিত ২। ৪টী শ্লোক উহার মধ্যে মধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন—সেই কারণেই রামায়ণের অনেকস্থলেই পাঠব্যতিক্রম হইয়াছে, এই কথা এক্ষণে অনেকে বলিয়াথাকেন। ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রম-কারণেও কি ঐরূপ কথা বলিতেপারাযায়? আমাদের বোধে ভাষারামায়ণের পাঠব্যতিক্রমের কারণ উহা নহে। কেহ কেহ যে, বলিয়াথাকেন 'এক্ষণকার মুদ্রিত রামায়ণ-সকল ৺ জয়গোপালতর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংশোধিত'—তাহাতে আমাদের বোধহয় উহা কেবল তাঁহার সংশোধিত নহে, ভিন্নভিন্ন সংস্করণ ভিন্নভিন্ন লোকের সংশোধিত। সংশোধকেরা আপনাদিগের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন—এবং সেই জন্যই এই প্রকার নানারূপ পাঠভেদ হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় মুদ্রিতরামায়ণ সমস্তই কাহারও না কাহারও

সংশোধিত—উহার একখানিও কৃত্তিবাসের আসলরচনা নহে। কিন্তু দেখাযাইতেছে, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠ প্রায় একরূপই, কেবল শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকের পাঠই অনেক বিভিন্ন। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা-যাইতেপারে যে, শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকই পণ্ডিতপ্রবর তর্কালঙ্কারমহাশয়ের সংশোধিত। এই পুস্তকের পাঠে ছন্দোভঙ্গাদি দোষ তত নাই; রাবণবধস্থলে বাল্মীকির মতই অনুসৃত হইয়াছে; এবং কৃত্তিবাস যে যে স্থলে অন্যান্য রামায়ণের মত লিখিত হইল, বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, অথচ তত্তৎরামায়ণে সেরূপ প্রসঙ্গ নাই—সেই সেই স্থল সাবধানতাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল বিবেচনাকরিয়া বিপরীতঅনুমানকরা সঙ্গত বোধ-হয়না। যাহাহউক, এ কথা অবশ্য বলাযাইতেপারে যে, উক্তরূপ সংশোধনদ্বারা আসল নকল সমুদয় মিশিয়াগিয়াছে, উভয়কে পৃথক্ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে এবং কালক্রমে ঐ নকলই থাকিবে—আসল একেবারে লুপ্ত হইবে। অতএব ঐ সংশোধনদ্বারা গ্রন্থের গৌরবের হ্রাস বৈ বৃদ্ধি হয় নাই।

যাহাই হউক—কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানুন বা নাই জানুন—মূলরামায়ণের সহিত তাঁহার রচনার ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—তাঁহার রচিত সপ্তকাণ্ডরামায়ণ বহুলনীতিগর্ভ প্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তিনি লোকের মুখে পুরাণ শুনিয়াই

যদি এত্বাবৎ বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াথাকেন, ইহাতে তাঁহার গৌরবের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস্ নাই। তিনি যৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে এরূপ ছন্দোবদ্ধ কাব্য অধিক ছিলনা। সুতরাং তিনি অন্যের অনুকৃতি অধিক করিতে পান নাই;—তাঁহার রচনা নিজনৈসর্গিকশক্তিসম্ভূত। ভারতচন্দ্র ইদানীন্তনকালে মালিনীর বেসাতি পরিচয়দানস্থলে যেরূপ শব্দচাতুর্য্য প্রকাশকরিয়াছেন, কৃত্তিবাস তত প্রাচীনসময়েও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়া গিয়াছেন। ভরদ্বাজাশ্রমে বানরদিগের ভোজনসময়ে তিনি লিখিয়াছেন—

অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর। খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর॥ কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্যপেয় ভক্ষ্য চতুর্বিধ॥ যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচূর। যাহা নিরখিবামাত্র হয় মতি চূর॥ নিখুঁতি নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা। দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥ ইত্যাদি।

অঙ্গদরায়বারেও তিনি সামান্য পরিহাসরসিকতা প্রকাশকরেন নাই। অঙ্গদ রাবণসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য রাক্ষসীমায়ায় সভাশুদ্ধ সমস্ত লোকেই রাবণরূপ ধারণকরিল, কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণকরা অনুচিত, বিবেচনাকরিয়া নিজরূপেই রহিলেন, ইহা দেখিয়া অঙ্গদ ক্রোধ ও পরিহাসসহকারে তাঁহারেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অঙ্গদ বলে সত্যকরে কওরে ইন্দ্রজিতা। এই যত বসে আছে সবাই কি তোর পিতা॥ ধন্য রাণী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে। এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে॥ কোন্ বাপ তোর চেড়ীর

অন্ন খাইল পাতালে। কোন্ বাপ বাঁধাছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥ কোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গ্তে গেছিল মিথিলা। কোন্ বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা॥ কোন্ বাপ জব্দ হলো জামদগ্ন্যের তেজে। মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥ একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা। ইহা সবাকে কাজ নাই তোর যোগী বাপটী কোথা॥

অনন্তর নানাবিধ কথোপকথন হইলে রাবণ কুপিত হইয়া কহিলেন, সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়াদিলে, বিভীষণ আসিয়া শরণাপন্ন হইলে,—হনুমানকে বাঁধিয়া এই স্থানে আনিয়াদিলে, এবং রামলক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণপরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, আমি কোনরূপে ক্ষান্ত হইতে পারি। ইহা শুনিয়া—

অঙ্গদ বলিছে রাবণ আমরা তাই চাই। কচ্‌কচিতে কাজ্‌কি মোরা দেশে চলে যাই॥ রামকে বলি গিয়া ইহা নয় করিলে নয়। সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥ বিভীষণে বান্ধিয়া আনিব তোর কাছে। বুঝিয়া করহ শান্তি মনে যত আছে॥ নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া। শূর্পনখার নাক কাণটী কেমনে দিব জোড়া॥

নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে কবির সহৃদয়তারও বিলক্ষণ পরিচয় হইবে—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥ কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ। কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥ মম বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥ গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন। তথাকি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥ পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া। রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥ চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥ রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা। হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥ রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে। রাজলক্ষ্মী তথাপি

ছিলেন সন্নিকটে ॥ আমার সে রাজলক্ষ্মী নিল কোন জনে। কৈক-য়ীর মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে ॥ সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥ কমল লতার প্রায় জনক দুহিতা। বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥ দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ ॥ তারা না হরিতে পারে তিমির আমার। এক সীতা বিহনে সকলই অন্ধকার ॥ দশ-দিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে। সীতাবিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ॥ সীতাধ্যান সীতাজ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী ॥ দেখরে লক্ষ্মণভাই কর অন্বেষণ। সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন ॥ আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান। সেই সে এখানে করিলাম অবস্থান ॥ তাহার উচিত ফল দিলেছে আমারে। শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে ॥ শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা। কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা ॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসের সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেই বোধহয় দেশ-মধ্যে (পঞ্চালী) পাঁচালি নামক গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। লোকে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালী বাদ্য ও স্বর সংযোগে গানকরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস সেইরূপ পাঁচালীর অনুকরণেই ভাষারামায়ণের রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আপনার রচনাকে গীত, পাঁচালী ও নাচাড়ী বলিয়া উল্লেখকরিয়াছেন। নাচাড়ী শব্দটী বোধহয় পাঁচালীরই অপভ্রংশ হইবে। কিন্তু প্রাচীন হস্তলিখিতপুস্তকে দেখাযায়, ত্রিপদীস্থলেই নাচাড়ী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহাহউক বোধহয়, গীতের অনু-রোধেই তাঁহার রচিত শ্লোকগুলিতে অক্ষরগণনার ও যতির নিয়ম তত অনুসৃত হয়নাই। ইদানীন্তনকালীন দাশরথি রায় প্রভৃতির রচিত পাঁচালীর ন্যায় উহাতেও ঐ নিয়মের

বহুল বৈষম্য দৃষ্টহইয়াথাকে। ফলতঃ তিনি যে উদ্দেশে ঐ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন, তাহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। শত সহস্র লোকে চামরমন্দিরাসহযোগে রামায়ণগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। আধুনিক কত রামযাত্রার পালা ঐ রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে, রামায়ণের উপাখ্যান কহিতেপারে, ভাষারামায়ণই তাহার মূল কারণ। যাহার কিছুমাত্র অক্ষরপরিচয় আছে সেই, রামায়ণ পাঠকরিতে প্রবৃত্ত হয়। সামান্য দোকানদারেরাও ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে মধ্যে অবকাশ পাইলেই তারস্বরে রামায়ণপাঠ করিয়াথাকে। এরূপ সৌভাগ্য সকল কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

রামায়ণের ভাষা আদ্যোপান্ত সুমধুর ও ব্যাকরণানুসারে সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ না হউক, সকলস্থলেই যে, কবির মনোগতভাবের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। ভাষার দুরূহতা বা জটিলতা দোষে ভাবগ্রহ করিতে পারাযায় না—সমস্ত রামায়ণের মধ্যে এরূপ স্থল অতি বিরল। ইহাঁর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনেক কবির রচনায় এরূপগুণ লক্ষিতহয়না।

ভাষারামায়ণে পয়ার ও ত্রিপদীভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই। তবে কলিকাতামুদ্রিত একখানি পুস্তকে অকম্পনের যুদ্ধের পর, বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধস্থলে ‘নর্ত্তকছন্দ’ নামে একটী নূতন ছন্দ দেখিতেপাওয়াযায়; কিন্তু কলিকাতামুদ্রিত অপরাপর পুস্তকে ও শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকে ঐ প্রস্তাবটী

একবারে নাই, এবং ছন্দটীও—

"তবে দেখি তাহারে, সেইত দ্বারে, প্লবঙ্গমগণ।
তারা তর্কশিখরী, করেতে ধরি, রহে সুধীমন॥" ইত্যাদি

নিতান্ত আধুনিকত্বগন্ধী—অতএব বোধহয় ঐ প্রস্তাব কৃত্তিবাসের রচিত নহে—উহা কোন আধুনিক কবিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাহউক, রামায়ণে ত্রিপদী ও পয়ার ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ঐ দুই ছন্দ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নরূপ দুই একটী ছন্দও দেখিতেপাওয়াযায় যথা—

• শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসরচিত রামায়ণভিন্ন আরও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিতেপাইয়াছি, তাহার একখানির নাম 'যোগাধ্যার বন্দনা' ও অপর খানির নাম 'শিবরামের যুদ্ধ'। দুই খানিতেই কৃত্তিবাসের ভণিতি আছে। রচনাদর্শনেও তাঁহারই লেখনীনির্গত বলিয়া বোধহয়।

কবিকঙ্কণ—চণ্ডী।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা নামক গ্রামে চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নিবাস ছিল। তিনি রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠসহোদরের নাম কবিচন্দ্র। চণ্ডীর ভণিতিতেই এই পরিচয় দেওয়াআছে যথা—

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কবির প্রকৃতনাম মুকুন্দরাম; মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী তাঁহার বংশীয় উপাধি—অলৌকিককবিত্বশক্তিসন্দর্শনজন্য তাৎকালিক জনগণের প্রদত্ত উপাধি—কবিকঙ্কণ। বোধহয় তাঁহার অগ্রজেরও কবিচন্দ্র প্রকৃত নাম নহে—উপাধিমাত্র। কবিচন্দ্রের কবিত্বপ্রদর্শক আর কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়াযায়না। কেবল শিশুবোধকের মধ্যগত দাতাকর্ণে—

"দ্বিজকবিচন্দ্র গায় ব্যাসেরকৃপায়। ধনপুত্র হয় তার যেজন গাওয়ায়॥

এই ভণিতিদর্শনে এরূপ অনুমান করাযাইতেপারে যে, ঐ প্রবন্ধ কবিকঙ্কণের ভ্রাতা কবিচন্দ্রেরই রচিত। কোন কোন প্রাচীনপুস্তকে চণ্ডীর মধ্যেও কবিচন্দ্ররচিত একটী সূর্য্যবন্দনা দেখিতেপাওয়াযায়।

যাহাহউক, মুকুন্দরাম যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থার প্রথমে দুরাত্মা যবনদিগের অসহনীয় উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া পিতৃপৈতামহ বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে দেশান্তরযাত্রা করেন, এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যস্থিত আঁড়্রা নামক গ্রামের ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা বাঁকুড়াদেব (বা বাঁকুড়ারায়) মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাসদরূপে নিযুক্ত করেন, এবং আপন পুত্র রঘুনাথরায়ের শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী করিয়া দেন। মুকু-

ন্দরাম রাজদায় ও অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথায় সুখে অবস্থান করত এই কাব্যগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের প্রথমভাগেই ঐ বৃত্তান্তের বর্ণন আছে—যথা———

শুনরে সভার জন, কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে। উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে, চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥ সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সুজনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাস চসি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥ ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপাদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকলসমীপে। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মহম্মদসরিফে ॥ উজীর হলো রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হলো অরি। মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনের কাঠায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহারি ॥ সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় ধুতি। পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥ ডিহিদার আরোজখোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে। প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥ কোতালিয়া বড় পাপ, সজ্জনের কাল সাপ, কড়ির কারণে বহু মারে। আথালি পাথালি কড়ি, লেখা জোখা নাহি দেড়ি, যত দিয়া যেবা নিতে পারে ॥ জমাদার বসায় নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা। প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান্য গোরু নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা ॥ সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীগড় যাঁর গাঁ, যুক্তি করি গম্ভীর খাঁর সনে। দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে দেখা হৈল তার সনে ॥ তেলিগাঁয়ে উপনীত, রূপরায় কৈল হিত, যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা। দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা ॥ বাহিল গোড়াই নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি, তেউটায় হৈনু উপনীত। দারুকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী, গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত ॥ নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোখড়া নগরে। তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥ আশ্রয়ি পুখর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে। ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥

করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
গোথড়া ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, আঁড়রায় গিয়া উপনীত॥
আঁড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমনি, রাজা দিলা দশ আড়া ধান॥
বীর মাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত, শিশুপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য।
হাতে করি পত্রমসী, আপনি কলমে বসি, নানা ছাঁদে লেখান কবিত্ব॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দী, যে জানে স্বপ্নের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, মম ভাষা করিও কুশল॥

উপরিলিখিত সন্দর্ভটী মুদ্রিত কবিকঙ্কণচণ্ডীহইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকঙ্কণ, আঁড়রাগ্রামের যে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা রঘুনাথদেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই রাজাদিগের বংশীয়েরা উক্ত আঁড়রা গ্রাম হইতে ২ ক্রোশদূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের আত্মীয় মেদিনীপুর জেলার ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পুস্তক হইতে উপরিউক্ত সন্দর্ভটী সমুদায় লেখাইয়া আনিয়াদিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতেগ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে বহুল অংশে বিশোধিতহইয়াছে।

ঐ পুস্তকের পাঠসকল দেখিতে পাইয়া আমাদের অনেকগুলি সংশয় অপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ মুদ্রিত পুস্তকস্থ "উপনীত কুচুট নগরে" এই লিখনদ্বারা মুকুন্দরামের দামুন্যাহইতে আঁড়রা গমনসময়ে পথিমধ্যে কুচুট গ্রামপ্রাপ্তি বর্ণিত আছে—কিন্তু তাহা কোনমতে সঙ্গত হয়না—কারণ কুচুট (কালেশ্বর) দামুন্যাহইতে অনেক দূর উত্তরদিকে অবস্থিত—আঁড়রা সে দিকে নহে—দক্ষিণ দিকে। সুতরাং দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকে যে, কুচুটের পরিবর্ত্তে গোথড়াগ্রাম লিখিত আছে, তাহাই সঙ্গতবোধহয়।

২য়তঃ—মুদ্রিতপুস্তকে 'সুধন্য বাঁকুড়ারায়' এইরূপ একটী চরণ আছে—তৎপাঠে অনেকের ভ্রমহইয়াছে যে, ব্রাহ্মণভূমি পরগণা ও তদন্তর্গত আঁড়রা গ্রাম, বাঁকুড়া জেলার মধ্যে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা মেদিনীপুরজেলার মধ্যগত এবং বাঁকুড়াদেব বা বাঁকুড়ারায় রঘুনাথদেবের পিতার নাম। উপরিউল্লিখিত পুস্তকের এবং আরও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে।

এক্ষণে চণ্ডীকাব্য কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয়করা আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের শেষঅংশটী পাওয়াযায়নাই—সুতরাং তাহাতে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা ছিল কি না, জানিবার যো নাই। আমরা আরও ৫।৬ খানি হস্তলিখিত প্রাচীনপুস্তক সংগ্রহ করিয়া-

ছিলাম ; সে সকল পুস্তকের কুত্রাপি সময়সূচক শ্লোক নাই। কিন্তু এক্ষণকার মুদ্রিতপুস্তকের শেষভাগে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়াযায়—যথা

শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

এই শ্লোকের অর্থ লোকে সচরাচর ১৪৬৬ শক [১৫৪৪খৃঃঅব্দে] করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কবির নিজলিখিত মানসিংহের রাজত্বকালবর্ণন সঙ্গত হয়না। কারণ মানসিংহ ১৫১১ শকে [১৫৮৯ খৃঃঅব্দে] এদেশের নবাবীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৬৬ শকের ৪৫ বৎসরপরে যে মানসিংহ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণন ১৪৬৬ শকে হওয়া সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। এই অসঙ্গতিনিবারণার্থ কেহ কেহ "শকে রস রস বেদ" এই পাঠকে ভ্রান্ত বলিয়া "শকে রস রস বাণ" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয়না। যেহেতু ১৫৬৬ শকেও [১৬৪৪ খৃঃঅব্দে] মানসিংহ এদেশের অধিপতি ছিলেন না। তিনি ১৫২৬ শকেই [১৬০৪ খৃঃ অব্দে] আপনার আধিপত্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহাহউক আমাদের বোধহয় "শকে রস রস" ইত্যাদি শ্লোক কবিকঙ্কণের স্বরচিত নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক হইবে। তাহা না হইলে আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার কোন না কোন পুস্তকে উহা দেখাযাইত। যখন্ তাহা দেখাযাইতেছে না এবং যখন্

উহাদ্বারা প্রকৃতসময়ের নির্ণয় হইতেছে না, তখন্ উহাকে কল্পিতপাঠ. বৈ আর কি বলাযাইতে পারে? যাহাহউক, আমরা চণ্ডীকাব্যের সময়নির্ণয়ের একটী উৎকৃষ্ট উপায় পাইয়াছি। আমাদের পরমসুহৃৎ মেদিনীপুরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্তবাবুরামাক্ষয়চট্টোপাধ্যায় কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথরায়ের রাজত্বকাল ও বংশাবলীপ্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত রাজবাটী হইতে সংগ্রহকরিয়া লিখিয়াপাঠাইয়াছেন। তদ্দারা জানাযাইতেছে যে, রাজা রঘুনাথরায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩ খৃঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শক [১৬০৩ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। কবিকঙ্কণ, রাজারঘুনাথের রাজত্বকালে ওতাঁহারই উৎসাহে যে, কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই আছে। অতএব ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের মধ্যে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। উপরিভাগে যেরূপ উল্লিখিত হইল, তদ্দারা দৃষ্ট হইবে যে, রাজা মানসিংহের রাজত্বও ঐ সময়মধ্যেই হইয়াছিল।

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদি কেহ "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক" ইত্যাদি শ্লোককে সমূলক বলিতে নিতান্তই ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে আমরা ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিব—যথা, 'রস' শব্দে যেরূপ ৬ বুঝায়, সেইরূপ ৯ও বুঝাইতেপারে, অতএব 'শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা'

ইহার অর্থ ১৪৬৬ শক নাহইয়া ১৪৯৯ শক হইবে। ১৪৯৯ শকে রঘুনাথরায় রাজা ছিলেন—তৎকালে ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি বল ১৪৯৯ শকেও মানসিংহের অধিকার হয় নাই—তাহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১১ শকে হইয়াছিল, সুতরাং ১৪৯৯ শকে লিখিত গ্রন্থের সূচনায় মানসিংহের রাজত্ববর্ণন কিরূপে সঙ্গত হয়? এ কথার উত্তরে আমরা এই বলি যে, ঐ ১৪৯৯, গ্রন্থের আরম্ভকালের শক—সমাপ্তিকালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আঁড়রানগরে অবস্থানপূর্ব্বক চণ্ডীরচনার আরম্ভ করিয়া ১২।১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন্ মানসিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়াথাকিবেন এবং এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্ত করিয়া শেষে বিজ্ঞাপন লিখিয়াথাকেন, বোধহয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থরচনা সমাপনের পর পরিশেষে গ্রন্থোৎপত্তির সূচনাভাগটী লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহাহউক যখন্ ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের পূর্ব্বে ৩০ বৎসরের মধ্যে কোনসময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যরচনা করিয়াছিলেন, এরূপ স্থিরতর সংবাদ পাওয়াযাইতেছে, তখন্ এ বিষয়ের জন্য আর তর্ক বিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম শিবরাম ও মহেশ এবং কন্যা দুইটীর নাম চিত্ররেখা ও যশোদা। কবিকঙ্কণের বংশীয়েরা দামুন্যা গ্রামে কেহ নাই;

তাহার নিকটবর্ত্তী 'বৈনান' গ্রামে বাস করেন। তাঁহাদের অনেকে অদ্যাপি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ব্যবসায় করিয়াথাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কবি-কঙ্কণ হইতে কয় পুরুষ অন্তর? তাহা প্রায় কেহই বলিতে পারেন না। ইহাঁদের বাটীতেও আল্‌তায় লিখিত একখানি চণ্ডীকাব্য আছে—সে খানির পূজা হয়। ইহাঁরা বলেন সে খানি কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত।

কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরাও পূর্ব্বোল্লিখিত সেনাপতে গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য নাই—বর্দ্ধমানেশ্বর সমুদায় কাড়িয়া লইয়াছেন। রঘুনাথরায় হইতে ১০ম পুরুষ (বর্ত্তমান) শ্রীযুক্তরামহরিদেব, সেনাপতেগ্রামের কালেক্টরীর খাজনা-বাদ যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দ্বারাই কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণস্বরূপ গণেশ লক্ষ্মী চৈতন্য রাম প্রভৃতির বন্দনাকরিয়া সংস্কৃতপুরাণরচ-নার অবলম্বিত রীতি অনুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, হৈম-বতীর বিবাহ, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের জন্মপ্রভৃতি বর্ণনপূ-র্ব্বক ভগবতীর পৃথিবীতে পূজাপ্রচারোদ্দেশে কালকেতুব্যাধের ও শ্রীমন্তসওদাগরের দুইটী বৃহৎ উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠকরিলে তিনি যে, সং-স্কৃতশাস্ত্রে একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বহুদর্শী লোক ছিলেন,

তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। গৌরীর রূপবর্ণন, নারদকৃত সম্বন্ধ, তারকাসুরপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মসমীপে-গমন, শিবতপস্যা, মদনদহন, রতিবিলাপ, পার্ব্বতীতপস্যা, হরানুগ্রহ ও হরগৌরীবিবাহপ্রভৃতি, কালিদাসরচিত কুমার-সম্ভবের অনুকৃতিস্বরূপ হইলেও উহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের ভিক্ষা ও হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি তাঁহার নূতন রচনা। এই গ্রন্থস্থ কালকেতুব্যাধ ও ধনপতি সওদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত? কি ইহার কোন না কোনরূপ পৌ-রাণিক মূল আছে? তাহা স্থির বলিতে পারাযায়না। কিন্তু কবির লেখার ভঙ্গীতে বোধহয় যে, কোন পুরাণ বা উপপুরাণে ইহার কিছু না কিছু মূল থাকিবে। যে হেতু তিনি মধ্যে মধ্যে "বিচারিয়া অনেক পুরাণ" এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কালকেতুর উপাখ্যান এবং কল্কীপুরাণে শ্রীপতিসওদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোথাও তাহা দেখিতেপাইলাম না। যাহাহউক চণ্ডীকাব্য এক্ষণে প্রায় রামায়ণ মহাভারতাদির ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যে গণ্য হইয়াছে; অনেক শাক্তে নিয়মিতরূপে এই গ্রন্থের পূজা ক-রেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ লইয়া কত কত যাত্রার পালা প্রস্তুত হইয়াছে; কত কত গায়কে চামরমন্দিরাসহযোগে চণ্ডীগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে ও করিতেছে

এবং কত লোকে ধর্ম্মবোধে সংকল্প করিয়া ঐ গীত বাটীতে গাওয়াইতেছে। সুতরাং কাল্পনিক উপন্যাস হইলে লোকের ইহাতে এত শ্রদ্ধাহওয়া তাদৃশ সঙ্গত হয় না। যাহাহউক, সচরাচরপ্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায়, অনেকে ইহাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধকরেন। আমরা বাল্যকালে পিতামহীপর্য্যায়ের স্ত্রীলোকদিগের মুখে মনসার কথা, ইতুর কথা, ষষ্ঠীর কথা, সুবচনীর কথা, মঙ্গলচণ্ডীর কথা প্রভৃতি অনেককথা শুনিয়াছি; সেই সকল কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে। অতএব আমাদের বোধহয়, কবি স্বদেশপ্রচলিত তাদৃশ কোন উপাখ্যানকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদুপরি এই সুরম্যহর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

কবিকঙ্কণ বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। ইতিপূর্ব্বে আমরা যেযে কবির নামোল্লেখ করিয়াছি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাগুণে তাঁহাদের কেহই কবিকঙ্কণের তুল্যকক্ষ নহেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ববিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে, এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে, এত শ্রদ্ধা আছে—কিন্তু চণ্ডীপাঠের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে, সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়াযায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘকবি, ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপালবধের রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের

রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে উভয়েরই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা, বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরণেই লিখিত। তদ্ভিন্ন শাপ-ভ্রষ্ট নায়কনায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, চৌত্রিশ অ-ক্ষরে স্তব, ঝড়বৃষ্টিদ্বারা দেশবিপ্লাবন, শব্দশ্লেষসহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয়দান, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাসবর্ণন, সুপুরুষদর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাট করার পরিচয় দেওয়া, ইত্যাদি ভূরি ভূরি বিষয় এবং ভঙ্গপয়ার, ঝাঁপতাল, একাবলী প্রভৃতি ছন্দসকল ভারতচন্দ্র যে, চণ্ডী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ঐ দুই গ্রন্থের পাঠমাত্রেই বুঝিতে পারাযায়। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র মধ্যে২ আদিরসের যেরূপ ছড়াছড়ি করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ মোটে করেন নাই। তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তত্তৎস্থলে বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত লেখনীচালনা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরিক কামিনীরা নিজ নিজ পতির নিন্দাকরণাব-সরে কি জঘন্য মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করিয়াছিল? কিন্তু মনোহরবেশধারী শিবকে সন্দর্শনকরিয়া ওষধিপ্রস্থবিলাসি-নীরাও দুঃসহদুঃখাবেগে স্ব২ পতির নিন্দা করিয়াছিল সত্য বটে, কিন্তু সেরূপ কুৎসিত আশয়ের কিছুমাত্র প্রখ্যাপন করেনাই—বরং অদৃষ্টের দোষ দিয়া পাতিব্রত্যপক্ষই সমর্থন করিয়াছিল। ইহা কবির সামান্য বিমলরুচিতার কার্য্য নহে।

কবিকঙ্কণ, চণ্ডী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতির ভূরি২ উপাখ্যান, সুরলোক ও সুরগণের বিবরণ এবং ভারতবর্ষস্থ নানাদেশের নদ নদী গ্রাম নগর অরণ্য প্রভৃতির কতই বর্ণন করিয়াছেন! এবং পশু পক্ষী ও নানাপ্রকৃতিক নানাধর্ম্মী নানাজাতীয় লোকের বিভিন্নপ্রকার স্বভাবগুলি কি সুন্দররূপেই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! ঐ সকল চিত্রে একের রঙ্‌ অপরের গাত্রে প্রায় কোথাও সংলগ্ন হয়নাই—সকলগুলিই পৃথক্ পৃথক্ রঙবিশিষ্ট। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রগুলিই পৃথগ্‌বিধ বর্ণে রঞ্জিত। ফলতঃ বাঙ্গালাকবিদিগের মধ্যে স্বভাববর্ণনে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতেপাওয়া যায়না। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, এজন্য ফুল্লরার দারিদ্র্যবর্ণনসময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শন করিয়াছেন। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারিশীলবণিকের বঞ্চকতাবর্ণনে তিনি সাধারণক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালদিগের বিলাপে প্রচুর পরিহাস রসিকতা প্রকাশকরিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক জগজ্জননী ভগবতীর কঞ্চুলিকামধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড চিত্রিত হওয়ায় কবির কি অলৌকিক প্রগাঢ় ভাবুকতাই প্রকটিত হইয়াছে! তদ্ভিন্ন অন্তঃসত্ত্বার মানসিক অবস্থা, বৈবাহিক আচারপদ্ধতি, পতিবশ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীর ঔষধকরণ, সপত্নীকলহ, রন্ধন, পাশক্রীড়া, এবং অগ্রে সম্মান পাই-

বার জন্য বণিক্দিগের বাগ্বিতণ্ডাপ্রভৃতির বর্ণনস্থলে কবির লোকব্যবহারাভিজ্ঞতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি যে দুইটী উপাখ্যান বর্ণনাকরিয়াছেন, তাহার একটীর অধিষ্ঠানভূমি কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টীর বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী থানামঙ্গলকোটের সন্নিহিত অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। তন্মধ্যে কলিঙ্গদেশ কবির বাসভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী; তথায় বোধহয় তিনি স্বয়ং কখনই গমন করেন নাই এবং তথায় গমন করিয়াছে, এরূপ কোন লোকের সহিতও বোধহয় তাঁহার সাক্ষাৎ হয়নাই। সুতরাং ঐ স্থানের ভৌগোলিক বিবরণে তাঁহার অনেক ভ্রম হইয়াছে। তিনি গুজরাটনগরকে কলিঙ্গের অতিনিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গুজরাট এক্ষণে বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও ভারতবর্ষের পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত। কিন্তু কলিঙ্গ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সির মধ্যস্থ এবং পূর্ব্বোপকূলে স্থিত—উভয়দেশের অন্তর ৩শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহাহউক দ্বিতীয় অধিষ্ঠানভূমির ভৌগোলিকবিবরণ অনেকদূর পর্য্যন্ত ঠিক হইয়াছে। মঙ্গল-কোটের নিকটে 'উজুনী' (উজ্জয়িনী) নামে অদ্যাপি একটী স্থান বর্ত্তমান আছে। উহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র—গ্রাম বা নগর উহার উপর কিছুই নাই। উহার সমীপে 'ভ্রমর' নামেও একটী খাল আছে; উহা অজয়নদের সহিত সংযুক্ত। ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের অজয় বহিয়া সিংহলযাত্রার

সময়ে নদের উভয়কূলে হুসনপুর, গাঙ্গড়া, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগাঁ, উধনপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ আছে, অদ্যাপি তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে নৌকা গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে, সওদাগরেরা গঙ্গার উভয়কূলবর্ত্তী ইন্দ্রাণীপরগণা, ললিতপুর (নলেপুর) ভাগুসিংহের (ভাওসিঙের) ঘাট, মেটেরি, বেলনপুর, নবদ্বীপ, মির্জাপুর, অম্বিকা (আম্বুয়া) শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদ্দল, নিমাইতীর্থের ঘাট, মাহেশ, খড়দহ, কোণনগর, কোতরঙ্গ, চিৎপুর, শালিখা, কলিকাতা, বেলেঘাটা, কালীঘাট, মাইনগর, বারাশত (দক্ষিণ) খলিনা, ছত্রভোগ, হেতেগড়, মগরা প্রভৃতি যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকলও অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। বোধহয় কালসহকারে কোন কোন গ্রাম স্থানান্তরিত হইয়াছে—উলা বেলেঘাটা প্রভৃতি গ্রাম সকল এক্ষণে কবির বর্ণিতস্থানে দেখিতেপাওয়াযায়না। এস্থলে ইহাও বোধহইতেছে যে, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগর সকল তৎকালে সমৃদ্ধ ছিলনা। কলিকাতা নগরীকেও লোকে যেরূপ আধুনিক মনে করে এবং ঐ আধুনিকত্বের প্রমাণস্বরূপ 'কালিকাটা' বৃক্ষের যেগল্প রচনা করে, তাহা বাস্তবিক বলিয়া বোধহয়না; কারণ এক্ষণকার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণের সময়েও কলিকাতা বর্ত্তমানছিলএবং সে সময়ে ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিতে আইসেন নাই।

আরও এস্থলে দেখাযাইতেছে যে, কবিকঙ্কণের সময়ে সপ্তগ্রামের নিম্নবর্ত্তিনী সরস্বতীর প্রবাহ মন্দ হইয়া হুগলীর সমীপবাহিনী গঙ্গার প্রবাহ প্রবল হইলেও সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংস ও হুগলীর তাদৃশী উন্নতি হয়নাই—হইলে কবি সপ্তগ্রামের অত সমৃদ্ধি বর্ণন করিতেন না এবং হুগলীর কথাও কিছু না কিছু উল্লেখ করিতেন। কলিকাতার দক্ষিণ খিদিরপুর ও কালীঘাটের নিকট দিয়া যে গঙ্গা গিয়াছে—লোকে যাহাকে এক্ষণে আদিগঙ্গা কহে—তৎকালে উহারই প্রবাহ প্রবল ছিল। কারণ কবি, মুচিখোলার নিম্নস্থ কাটিগঙ্গাকে 'হিজলির পথ' বলিয়া পরিত্যাগ করত কালীঘাটের নিম্নস্থ গঙ্গাদিয়াই সওদাগরদিগের নৌকাগুলি চালাইয়াছিলেন। যাহাহউক তৎপরে মগরা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত পথের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ পথিমধ্যস্থ যে সকল স্থান ও হ্রদাদির বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার সমুদয় বাস্তবিক বলিয়া বোধহয়না। বোধহয় কবি—

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহেযায় হারামদের ডরে॥

এই উক্তিদ্বারা পূর্ব্বদক্ষিণাঞ্চলস্থিত পোর্ত্তুগীজদিগকে ফিরিঙ্গীশব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তৎকালে অত্যন্ত উপদ্রব করিত বলিয়া তাহাদিগকে 'হারামদ' অর্থাৎ (পারসিভাষায়) দুষ্ট লোক বলিয়াছিলেন।

ফিরিঙ্গীর দেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রে গমন সময়ে পথিমধ্যে পুরী অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তিস্থান পা-

ওয়া, কালিয়াদহ নামক হ্রদে উপস্থিত হওয়া ও তথায় কমলে কামিনী সন্দর্শন করা প্রভৃতি অনেক রমণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ বর্ণনে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরা এক্ষণে একই দ্বীপকে সিংহল বা লঙ্কা বলিয়াথাকি, কিন্তু কবির সেরূপ বোধ ছিলনা—তিনি উহাদিগকে পৃথক্ দ্বীপ বোধ করিতেন। যাহাহউক তত্ প্রাচীন সময়ে অত দূরবর্ত্তী দেশের ভৌগোলিকবিবরণবর্ণনে ভ্রম হইলেও কবির কবিত্বের হানি হয়না। প্রাচীনকালের অনেক কবিরই ওরূপ ভ্রম হইয়াছে। বানরদিগকে সীতার অন্বেষণার্থ দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিবার সময়ে মহর্ষি বাল্মীকিও সেরূপ ভ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইতেপারেন নাই।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিলে ৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি যাহাছিল, তাহারও অনেক বিবরণ জানিতে পারাযায়। এক্ষণে রাঢ়ীয় কুলীনসন্তানদিগের যেরূপ বহুবিবাহ আছে, পুনর্ব্বিবাহের সময়ে যেরূপ কুৎসিতক্রিয়াকাণ্ড আছে, এবং পুরাণের যেরূপ কথকতা করা আছে, কবিকঙ্কণের সময়েও এসকলই প্রায় এইরূপই ছিল, অধিকন্তু পাশক্রীড়াটী সেসময়ে বোধহয় কিছু অধিক ছিল। কবি অনেকস্থলেই, এমনকি, স্ত্রীজাতির মধ্যেও ঐ ক্রীড়ার অনেকবার বর্ণন করিয়াছেন। বোধহয় ঐ সময়ে কামিনীদিগের শাটী পরিধানকরা, অথবা অধোংশুকও উত্তরীয় ব্যবহারকরা দুই রীতিই কিছু কিছু ছিল। যেহেতু

কবি ঐ দুই রীতিরই বর্ণন করিয়াছেন। কাঁচুলি, ব্যবহার বোধহয় তৎকালে অনেকেই করিত।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মকেতু, নীলাম্বর, কালকেতু, মুরারিশীল, ভাঁড়ুদত্ত, বিক্রমকেশরী, লক্ষপতি, ধনপতি, মালাধর, শ্রীমন্ত, শালবাণ, অগ্নিশর্ম্মা, নিদয়া, ছায়াবতী, রম্ভাবতী, দুর্ব্বলা, লীলাবতী, সুশীলা, জয়াবতী প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীগণের যে সকল কল্পিত নামধেয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের জাতি ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, এসকলনামও যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বোধহয়না। ইহাদেরও অনুরূপ অর্থ আছে—ফুল্লরা—ফুল্ল(=প্রফুল্ল=স্পষ্ট) রা(=রব) যাহার। মাংসবিক্রয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উচ্চস্বর থাকা আবশ্যক এবং ব্যাধজাতিতে অপভ্রংশশব্দসম্বলিত নাম থাকা গুণাবহ ভিন্ন সদোষ বোধহয়না, সুতরাং ফুল্লরানাম নিরর্থক নহে। খুল্ল শব্দ নখীনামক এক উৎকৃষ্টগন্ধদ্রব্যবাচক; তদ্বিশিষ্টা স্ত্রী—খুল্লনা; গন্ধবণিক্‌জাতীয় বালিকার গন্ধদ্রব্যসম্বলিত নামহওয়া অসঙ্গত নহে। লহনা শব্দে পারস্যভাষায় বিপদ্= দায়=ঝঞ্ঝাট;—ঐ স্ত্রীর যেরূপ স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ধনপতি উহাকে লইয়া বিলক্ষণ দায়ে পড়িয়াছিলেন, বলিতে হইবে। সুতরাং উহার 'লহনা' নাম সার্থক হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কোন ছন্দ নাই বলি-

লেই হয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে ঐ দুই ছন্দ ব্যতিরিক্ত ঝাঁপতাল, ভঙ্গপয়ার, ভঙ্গত্রিপদী, একাবলী এবং আরও ২।১টী নূতনরূপ ছন্দ আছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের ন্যায়—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু" ॥ "দিদি গো এবে বড় সঙ্কট পরাণ" ॥
"কোটাল! খানিক জীবন রাখ" ॥

ইত্যাদিরূপ ধুয়া এবং ধান্‌শী, কামোদ, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি অনেক রাগরাগিণীরও উল্লেখ মধ্যে মধ্যে আছে। যাহাহউক পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী ছন্দই পয়ার বা ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র —কোনটীই উহাহইতে ভিন্নপ্রকৃতিক নহে। অতএব বোধহয় কবি, পয়ার ও ত্রিপদী লিখিতে লিখিতেই, যদৃচ্ছাক্রমে অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়াও কর্ণে মিষ্ট লাগাতে, ঐ সকল নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাহউক, ইহার পূর্ব্বোল্লিখিত কাব্যসকলের ছন্দে যতিভঙ্গ ও অক্ষরগণনার বৈষম্য প্রভৃতি যেসকল দোষ দৃষ্টহয়, চণ্ডীকাব্যের ছন্দেও সেসকল দোষ নাই এমত নহে, তবে অপেক্ষাকৃত বিরল বটে।

অনর্গল প্রশংসা করিলে লোকে গোঁড়া বলে এবং গোঁড়ার কথায় কেহ শ্রদ্ধা করেনা; সুতরাং সে অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইচ্ছা না থাকিলেও চণ্ডীর ২।৪টি দোষের কথা বলিতে হইল। কবিকঙ্কণ, বর্ণিত নায়কনায়িকা প্রভৃতির চরিত্রগুলি প্রায় সকলস্থলেই যথাযথরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটী স্থলে তাহাদের কার্য্য ও আচার ব্যবহার অত্যুক্তিদূষিত ও অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালকেতুব্যাধকে অত অধিক অন্ন-

ব্যঞ্জন নাদিয়া কিছু কম দিলে ভাল হইত। খুল্লনা, অতবড় ধনবান্ লোকের পত্নী হইয়াও যে, গুণ চট পরিয়া একাকিনী বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইল,—জ্ঞাতিবন্ধু কেহ আসিয়া নিবারণ করিলনা, তাহার মাতা রম্ভাবতী কন্যার দুরবস্থার সংবাদ পাইয়াও তত্ত্ব লইলনা।—ইহা বড় বিসদৃশ কার্য্য হইয়াছে। যখন্ খুল্লনার বয়স্ ১২।১৩ বৎসর বৈ নহে, যখন্ সে কখনও পতিসহবাস করেনাই, যখন্ তাহার রজোযোগপর্য্যন্ত হয়নাই, তখনও তাহার বিদেশাগতপতির শয়নগৃহে যাইবার জন্য দিবাভাগহইতে অত ব্যগ্রতাপ্রকাশকরা—যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নির্লজ্জতাসহকারে অত বাগ্বিতণ্ডা করা, নিদ্রিতপতিকে মৃতবোধ করিয়া আজুলীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে বসা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পতির সহিত পাশক্রীড়া করিতে চাহা—এ সকলগুলাই যেন কেমন কেমন লাগে। তদ্ভিন্ন দ্বাদশবর্ষমাত্রবয়স্ক শ্রীমন্তের সিংহলে গমন এবং তথায় বিবাহের পর শালী শালাজ প্রভৃতির সহিত সেই সেই রূপ কথাকাটাকাটি, তাদৃশ বালকের পক্ষে সঙ্গত হয়না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসাবির্ভাবক ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও কৃত্তিবাসের রচনার ন্যায় আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। তদ্ভিন্ন কবির স্বদেশপ্রচলিত ভূরিভূরি এত অপভ্রংশশব্দের ব্যবহার আছে, যাহাদের অর্থ—এবং যাহাদের সংযোগ থাকাতে, সেই সেই বাক্যের

অর্থ—সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাযায়না, সুতরাং তত্তৎ-স্থলে রসভঙ্গ হইয়া পড়ে। আমরা খুব রাঢ় অঞ্চলের লোক-দিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বাকুড়ি, পাইকালা, কলন্তর, বুহিতাল, ইত্যাদি শব্দের কোনরূপ অর্থ বাহির করিতে পারিনাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এসকল দোষ—

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥"

ইত্যাদিন্যায়ে অবশ্যই উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যভিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু শিশুবোধকের গঙ্গাবন্দনায় কবিকঙ্কণের ভণিতি আছে; উহা চণ্ডীকাব্যস্থ গঙ্গাবর্ণন হইতে বিভিন্নরূপ। কবিকঙ্কণ ঐ প্রবন্ধটী পৃথক্ লিখিয়াছিলেন? কি উহা অন্যকোন গ্রন্থের অভ্যন্তরে ছিল, তাহা নিরূপিত হইবার যো নাই। যাহা-হউক, আমরা এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ চণ্ডীকাব্যের কয়েকটীঅংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন।

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি। পাইয়ে বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥—খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—কোথাহে বণিক্‌রাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেইহেতু ॥ বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যাণী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার। প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতকপাড়া, কালি দিবে মাংসের উধার ॥—আজি কালকেতু যাহ ঘর।—কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু

আনিহ বদর॥ শুন গো শুন গো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেড়ী, ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী। আমার জোহার খুড়ী, কালি দেহ বাকী কড়ী, অন্য বণিকের যাই বাড়ী ॥—বাপা, এক দণ্ড কর বিলম্বন।—সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেবন॥ ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে। মনে বড় কুতূহলী, কান্দেতে কড়ীর থলী, হড়প্পী তরাজু করি হাতে ॥—করে বীর বেণেরে জোহার।—বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এতোর কেমন ব্যবহার॥ খুড়া! উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি। ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥—খুড়া ভাঙ্গাইব একটী অঙ্গুরী।—হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদে আমি তরি॥ বীর দেয় অঙ্গুরী, বাণিয়া প্রণাম করি, জোঁখে রত্ন চড়ায়ে পড়্যান। কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান॥

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥ রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দু ধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥ অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি॥ একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালুখুদ কিছু লহ কড়ি॥ কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তার ঠাঁই॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥ ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল নেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥ কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥ বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥ হাত বদল করিতে বেণের গেল মনে। পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে॥

ফুল্লরার বারমাস বর্ণন।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী। ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি॥ ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥ বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥ পদ পোড়ে খরতর রবির

কিরণ। শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞ্চার বসন ॥ বৈশাখ হইল বিষ—বৈশাখ হইল বিষ। মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥

সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। রবিকরে করে সর্ব্বশরীর দাহন ॥ পসরা এড়িয়ে জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আথাসারি ॥ পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস—পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস ॥

আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নবমেঘজল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥ মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে২। কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে ॥ বড় অভাগ্য মনে গণি—বড় অভাগ্য মনে গণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী ॥

শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি ॥ মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি গাত্রে স্নান বৃষ্টিনীরে ॥ দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান ॥

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥ কত নিবেদিব দুখ—কত নিবেদিব দুখ। দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে। ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥ উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥ কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥

কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥ নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥ দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥

মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকারে ধান ॥ উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥ অভাগ্য মনে গণি—অভাগ্য মনে গণি। পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি ॥

পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলা তনূনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন ॥ করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। অভাগী ফুল্লরা মাত্র

শীতের ভাজন ॥ হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ॥ বৃথা বনিতা জনম—বৃথা বনিতাজনম। ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥

নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজ্ঝটী। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী ॥ ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥ নিদারুণ মাঘমাস—নিদারুণ মাঘমাস। সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস ॥

সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে। পীড়িত তপস্বিগণ বসন্ত-বাতাসে ॥ শুন মোর বাণী রামা—শুন মোর বাণী। কোন সুখে আ-মোদিতা হইবে ব্যাধিনী ॥ ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা। ক্ষুদ-সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥ কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্ম-ফল। মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল। দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দমন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ বনিতা পুরুষ দোহে পীড়িত মদনে। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদরদহনে ॥ দারুণ দৈবদোষে—দারুণ দৈবদোষে। একত্র শয়নে স্বামী যেন যোল কোশে ॥

সিংহলে কোটালের নিকট শ্রীমন্তের স্তুতি।

কাঁকালে নাএর দড়া পিঠে মারে ঢেকা। দিবস দুপরে হৈল সাত নায়ে ডাকা ॥ সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে। খানিক সদয় হও বিষম বিপদে ॥ শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্তভাবে ধন। ঘুষদিয়া কোটালের তুষিলেক মন ॥ ধন পেয়ে কালুদণ্ড সরসবদন। শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন ॥ স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি। হাসিয়া ইঙ্গিত তারে কৈল নিশাপতি ॥ সরোবর বেড়ি রহে পাই-কের ঘটা। স্নান করি করে গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা ॥ যব তিল কুশ মিল করেতে তুলসী। তর্পণে সন্তোষ সাধু কৈল দেবঋষি ॥ তর্প-ণের জল লহ পিতা ধনপতি। মসানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী ॥ তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননি। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মে-লানি ॥ তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই ॥ তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সম-র্পণ করিনু জননী ॥ তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে

আমি আর যাবনা।। তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশী-র্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাতা॥ সবাকারে সমর্পণ করিনু জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানী॥

প্রহেলিকা।

বিধাতানির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগীন্দ্র পুরুষ তাহে রহে নিরাহার। যখন পুরুষ সেই হয় বলবান্। বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান॥ ১॥ ডিম্ব।

বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥ পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে। মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ ২॥ পক্ষী।

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। ডাল পল্লব তার অতি সে বি-পুল।৷ পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ। বনেতে থাকিয়া করে বনের ধ্বংসন॥ ৩॥ পানা।

মনসার ভাসান।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীরচনার কিছুকাল পরেই বোধহয় ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস দুই জনে মিলিত হইয়া মনসার ভাসান রচনা করেন। ইহাঁরা দুইজনেই কায়স্থকুলোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু কোথায় ইহাঁদের নিবাস ছিল, বা কোন্ সময়ে ইহাঁরা গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। কিন্তু ইহাঁরা বেহুলাকে গাঙ্গুরের জলে ভাসাইয়া ত্রিবেণীপর্য্যন্ত পাঠাইবার সময়ে গোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর প্রভৃতি বর্দ্ধমান জিলাস্থ গ্রাম সকলের যেরূপ নামোল্লেখ করিয়াছেন, অন্য জিলাস্থ গ্রামের সেরূপ নাম করিতে পারেন নাই। ইহাতে বোধহয় বর্দ্ধমানজিলার মধ্যস্থ কোন

গ্রামেই ইহাঁদের বাস ছিল। যাহাহউক ইহাঁদের দুইজনের কেহই গণনীয় কবি ছিলেননা। তবে ইহাঁদের গ্রন্থ পুরাতন ও বহুজনপ্রসিদ্ধ এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বনকরিয়া মনসার গান রচিত হইয়াছে এবং গায়কেরা নায়কের বাটীতে চামরমন্দিরাসহযোগে তাহা গানকরিয়াথাকে, এই জন্যই ইহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

এই গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত উপাখ্যান এই যে, চম্পাইনগরনিবাসী চাঁদসওদাগরনামক এক গন্ধবণিক্ মনসাদেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন, এইজন্য মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্যদ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান, তথাপি মনসাদেবীকে গালিদিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে নখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনিনগরবাসী সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসাদেবীর কোপে বিবাহরাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্বে জানিতেপারিয়া চাঁদসওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসরঘর প্রস্তুতকরিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্যা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। বেহুলা কলার মান্দাসের উপর সেই মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয়মাসে ত্রিবেণীপর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথায় নেত

ধোবানীর সাহায্যে সুরপুরে গমন করত নৃত্যদ্বারা দেবতা-দিগকে প্রীত করিয়া পতির জীবনলাভ করান। চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিতেন না, তাঁহাকে 'চেঙ্গমুড়ী কাণী' বলিয়া গালি দিতেন, হেঁতালের লাঠী লইয়া প্রহার করিতে যাইতেন, এই জন্যই তাঁহার উপর মনসার রাগ। এক্ষণে সওদাগর আর তাঁহার দ্বেষ করিবেননা—পূজাকরিবেন, বেহুলার নিকটে এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইয়া দেবী সওদাগরের পূর্ব্বনষ্ট ছয় পুত্রকেও বাঁচাইয়া দিয়া জলমগ্ন সমস্ত ধনও বহিত্রসমেত উদ্ধার করিয়া দেন। বেহুলা, বহিত্রসমেত সেই সমগ্র ধনসম্পত্তি, পুনর্জীবিত পতি ও ভাসুরদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশে আগমন করিলে মনসাদেবীর পূজাপ্রচার হয়।

এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল কি? তাহা বলিতে পারাযায়না, কিন্তু দেখিতেপাওয়াযায় যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর বান্ধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে "নেত ধোবানীর পুকুর" নামে একটী প্রাচীনপুষ্করিণী আছে—পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যপুর হাসন্হাটী নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্নদিয়া যে সামান্য নদীটী আছে, তাহাকে লোকে "বেহুলা নদী" বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাইনগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাইনগরনামক একটী গ্রামও আছে। ঐ গ্রামে চাঁদসওদাগরের বাটী ছিল, একথা তত্রত্য লোকে বলিয়াথাকে। ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটী উচ্চভূমি আছে; ঐ ভূমি নখিন্দরের লোহার বাসর

বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তত্রত্য লোকদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তথায় কোন গন্ধবণিক্ পাক করিয়া খাইতে পারে না। পাকের জন্য চুল্লী খনন করিতে যাইলেই সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে। ফল কথা, ঐ স্থানে একজাতীয় সর্পও প্রচুরপরিমাণে আছে। তাহাদের চক্র নাই—বোধহয় বিষও নাই। উননের ভিতর, জলের কলসীর তলায়, বিছানার মধ্যে, পাদুকার অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দেখিতেপাওয়াযায়। তাহারা পার্য্যমাণে কাহাকেও দংশন করে না,—করিলে দষ্টব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধনকরিয়া সমীপস্থ মনসার বাটীতে কিয়ৎক্ষণ ফেলিয়া রাখিলেই সে আরোগ্যলাভ করে—নচেৎ মরিয়াযায়, ইহাই তত্রত্য লোকের বিশ্বাস।

বেহুলার উপাখ্যান কবিদিগের স্ব-কপোলকল্পিত বলিয়া বোধহয়না। বোধহয় প্রাচীনপরম্পরাগত কোন মূল ছিল, কবিরা তাহাই অবলম্বনকরিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণে এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তি, সহৃদয়তা ও বহুজ্ঞতার অভাবে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতেপারেন নাই। বাণিজ্যার্থবহির্গত চাঁদসওদাগরের নৌকাতে ঝড় বৃষ্টি, বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ, নখিন্দরবেহুলার বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা বাসরগৃহনির্ম্মাণ, কলার মান্দাসে বেহুলার ভাসিয়া যাইবার সময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রাম ও নগরের নামোল্লেখ, বেহুলার

স্বরপুরে নৃত্য ও জলমগ্ন ডিঙ্গার পুনরুদ্ধারপ্রভৃতি বর্ণনসকল অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠকরিলে এই গ্রন্থকে চণ্ডীর অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই বোধহয়না। কিন্তু চণ্ডীতে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রাসময়ে নদীর উভয়তীরস্থ গ্রামনগরাদির বর্ণনা যেরূপ মনোহর ও অনেক দূরপর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে—বিচার্য্যমাণ গ্রন্থের বর্ণনা সেরূপ কিছুই হয়নাই—বিশেষতঃ গ্রামনগরাদির স্থানসন্নিবেশগুলি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বোধহয়। যাহাহউক চণ্ডীতে ধনপতি লক্ষপতি সাধুদত্ত শঙ্খদত্ত চাঁদসওদাগর প্রভৃতি যে সকল গন্ধবণিকের বিবরণ ও নামোল্লেখ আছে, মনসার ভাসানেও তাহাদেরই বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা কতক অনুমানকরা যাইতেপারে যে, চণ্ডীরচনার বড় অধিক পরে মনসার ভাসান রচিত হয়নাই।

এই উপাখ্যানবর্ণন সর্ব্বাঙ্গসঙ্গত ও সহৃদয়তার প্রকাশক না হউক, কিন্তু ইহাতে বেহুলার চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পতির নিমিত্ত সতীর দুঃখভোগবর্ণনের পরাকাষ্ঠাপ্রদর্শিত হইয়াছে। স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ও নির্ভয়মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতেগেলে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধহয়, এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।

মনসারভাসানের ভাষা তত সুললিত বা সুশ্রব্য নহে।

ইহাতে পয়ার লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী এবং গজগতি এই কয়েকটীমাত্র ছন্দ আছে। ছন্দেরও বর্ণবৈষম্য যতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনেকস্থলেই লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে রচনা বিলক্ষণ মধুরও বোধহয়। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ গ্রন্থ রচয়িতা দুই কবির দুইটী রচনা উদ্ধৃত হইল।

চাঁদসওদাগরের নৌকায় ঝড় বৃষ্টি।

দেবীর আজ্ঞায়, হনূমান ধায়, শীঘ্র লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর, আইল সত্বর, করিতে ঝড় বর্ষণ॥
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে, ডুবাতে সাধুর তরি।
বীর হনূমান্, অতি বেগবান, করিবারে ঝড় বারি॥
অবনী আকাশে, প্রখরবাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার।
গঠিয়া গাবর, নায়ের নফর, নাহিক দেখে নিস্তার॥
গজ শুণ্ডাকার, পড়ে জলধার, ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পাইয়া ডর, বলে সওদাগর, যাইতে নারিনু রাজ্যে॥
হুড় হুড় হুড়, পড়িছে চিকুর, বেগে যেন ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার, নাহিক নিস্তার, ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥
দেখিতে অদ্ভুত, হইছে বিদ্যুৎ, ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া, বলিছে বেনিয়া, কেন বা বাণিজ্যে আইনু॥
তরী সাতখান, চাপি হনূমান, চক্রবৎ দেয় পাক।
ঘন ঘন ঝড়ে, ছৈ সব উড়ে, প্রলয় পবনের ডাক॥
হাঙ্গর কুম্ভীর, আইল বিস্তর, তরীর আশে পাশে ভাসে।
চলে ডিঙ্গা লয়ে, রাখে পাক দিয়ে, অহিধায় গিলিবার আশে॥
ডিঙ্গার নফর, গ্রাসিল হাঙ্গর, কাছি গিলিল মাছে।
চাপিয়া তরণী, হনূমান আপনি, হেলায়ে দোলায়ে নাচে॥
ডুবাইয়া নায়, চান্দ জল খায়, জগাতীর খলখল হাস।
জয় জয় মনসা, মা তুমি ভরসা, রচিল কেতকা দাস॥

পতিশোকে বেহুলার রোদন।

কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী॥

কি হইল কি হইল মোরে। প্রভু কেন হেন করে॥
কনক চাঁদের দুর্গতি। মলিন হইল ভাতি॥
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি॥
নরলোকে করে বা কি। বেহুলা বেণ্যের ঝি॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভা রাত্রে পতি মৈল॥
মঙ্গল বিভার নিশী। মুখ যার পূর্ণ শশী॥
খাইনু আপন পতি। কে মোরে বলিবে সতী॥
বদনে বদন দিয়া। নয়নে নয়ন দিয়া॥
চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি॥
কখন শ্রবণ মূলে। মোরে সঙ্গে লহ বলে॥
তুমি আমার গুণমনি। তোমা বিনা কিবা জানি॥
কাতর হইয়া রামা। কান্দিলেন নাহি ক্ষমা॥
করুণা করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্দে॥
আমি হইনু পতিদণ্ডী। বাসরে হইনু রাণ্ডী॥
ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবি॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত।

পূর্ব্ববর্ণিত কবিদিগের কয়েকখানি গ্রন্থ রচনার পরই বোধহয় কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালামহাভারত রচনাকরেন। কাশীরাম " দেব " উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ-জাতীয় ছিলেন। নিজরচনার অনেকস্থানে তিনি এই উপাধির উল্লেখ করিছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরামদেবে॥ ইত্যাদি।

কিন্তু দ্বিজভক্ত প্রাচীন কায়স্থেরা আপনাদিগকে ' দাস '

বলিয়াই পরিচয় দিতে অধিক ভাল বাসিতেন, তদনুসারে ইনিও আপনার নাম কাশীরামদাস বলিয়াই সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীরাম আদিপর্ব্ব ও স্বর্গপর্ব্বের শেষভাগে—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপরস্থিতি। দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥ কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম। প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥ তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গঙ্গাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

এই কয়েকটী শ্লোকদ্বারা আপনার যৎকিঞ্চিৎ যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনবৃত্ত জানিবার বড় অধিক উপায় নাই। ঐ শ্লোকদ্বারা স্থির হইতেছে যে; বর্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণীনামে এক পরগণা আছে (কাটোয়া নগর ঐ পরগণার অন্তর্গত)। ঐ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী নদীর তীরসন্নিহিত সিঙ্গিনামক প্রসিদ্ধগ্রাম কাশীরামের বাসস্থান ছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত ছিল। কমলাকান্তের কৃষ্ণদাসাদি চারি পুত্র, তন্মধ্যে কাশীরাম তৃতীয় ছিলেন।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইন্দ্রাণীনামক স্থানে কাশীরামের বাসস্থান ছিল। ইহার প্রামাণ্যার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও যে, ইন্দ্রাণীর কথা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"মণ্ডনহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন। সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি, দেব আইসে যাহার সদন॥ (১)

"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপানি" ॥ (২)
"লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী" ॥ (৩)

ইহার প্রথম শ্লোকে 'মণ্ডনহাট্' নামক স্থানের যে উল্লেখ আছে,—মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শব্দ "মণ্ডলঘাট" করিয়া ফেলিয়াছে। মণ্ডলঘাট হুগলীজেলার মধ্যে, সুতরাং তৎসন্নিহিত ইন্দ্রাণী অবশ্যই হুগলীজেলার মধ্যগত হইবে—এই বোধেই কয়েকমহাশয়, কাশীরামের বাটী হুগলীজেলায় ছিল, ইহা লিখিয়াছেন। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে—যে হেতু কবিকঙ্কণের লিখিত চণ্ডীর পাঠ 'মণ্ডলঘাট' নহে 'মণ্ডনহাট' ঐ মণ্ডনহাট ইন্দ্রাণীপরগণার মধ্যেই কাটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দেখিতে পাওয়াযায়। ঐ স্থানের সন্নিধানে ঘোষহাট, একাইহাট, বিকিহাট, পেৎনীহাট, ডাঁইহাট প্রভৃতি হাটশব্দান্ত ১৩টী গ্রাম আছে। অতএব কবিকঙ্কণের কয়েকস্থানে উল্লিখিত 'ইন্দ্রাণী' বর্দ্ধমানজেলাস্থ ঐ ইন্দ্রাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহাতে সংশয় নাই। কাশীরাম পরিচয়দানস্থলে "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ" বলিয়াছেন, ইন্দ্রাণী গ্রাম বলেন নাই; সুতরাং তদ্দ্বারা ইন্দ্রাণীপরগণাই বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন ঐস্থানে বারদুয়ারির ঘাট, গণেশমহাতার ঘাট, পীরের ঘাট প্রভৃতি গঙ্গার ধারে ধারে বারটী বাঁধাঘাট এবং ইন্দ্রেশ্বরনামক শিবস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই বিষয়ে তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে একটী কথাও আছে যথা—

তের হাট, বার ঘাট, তিন চণ্ডী, তিন শ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ॥

কবি এই বারঘাটকেই লক্ষ্যকরিয়া যে, "দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী" এই কথা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রিতপুস্তকের দোষে কাশীরামের বাসগ্রামবিষয়েও লোকের ভ্রম জন্মিয়াগিয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে 'সিদ্ধি' গ্রাম লিখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে সিদ্ধিগ্রাম কুত্রাপি নাই—সিঙ্গিগ্রাম আছে, এবং ঐ গ্রামেই কাশীরামের বাস ছিল। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তত্রত্য লোকে বলিয়াথাকেন, ঐ সিঙ্গি গ্রামের দক্ষিণাংশে কাশীরামের বাসভবন ছিল—এক্ষণে সেই ভিটায় এক গন্ধবণিক্ বাস করে। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে 'কেশে পুকুর' নামে একটী প্রাচীনপুষ্করিণী আছে, তাহাও কাশীরামের খনিত বলিয়া প্রাচীনপরম্পরায় প্রসিদ্ধ। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জেলা বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণীপরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী সিঙ্গিগ্রামেই কাশীরামের নিবাস ছিল। কাশীরামসংক্রান্ত কয়েকটী অলৌকিক উপাখ্যান তত্রত্য প্রাচীনলোকে অদ্যাপি বলিয়াথাকেন, বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা আর লিখিতহইল না।

একটী প্রবাদ আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর। ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর ॥

"কাশীরামের পুত্র পৌত্র ছিলনা, একমাত্র কন্যা। মহা-

ভারতের আদি সভা বন ও বিরাটপর্ব্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই কাশীরামের মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রারব্ধ গ্রন্থের পরিসমাপনের নিমিত্ত ঐ কন্যার স্বামী নিজ-জামাতার উপর ভারদিয়াযান। জামাতাও শ্বশুরের আদেশানুসারে সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন, কিন্তু স্বকীয় কবিকীর্ত্তিলাভের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সর্ব্বত্রেই শ্বশুরের নামসমেতই ভণিতি দিয়া যান। সুতরাং সমগ্র মহাভারতই কাশীরামদাসবিরচিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হয়”।—কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা স্থির বলা যায় না। ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন মূল নাই—রচনাগতও ঐরূপ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না—যদ্দ্বারা ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাসকরাযাইতেপারে। বিশেষতঃ সিঙ্গির নিকটবর্ত্তী চাঁড়ুলীনামকগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথমিত্র-মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকগুলি সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন, তিনি সিঙ্গিগ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, “কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাটের কিয়দ্দূর লিখিয়া ৺কাশীধাম যাত্রা করেন, সেই জন্যই তিনি উক্ত স্থানের স্বর্গোপমতা প্রকাশার্থ ‘ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর’ এইরূপ লিখিয়াছেন। ঐ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়, ও কবিতার অর্থ এরূপ নহে।” যাহাই হউক, আমরা কাশীরামদাসের কবিকীর্ত্তির অংশ অপরকে দিতে সম্মত নহি।

কাশীরামদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ বা কোন্ সময়ে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয়করিবার উপায় নাই। তিনি গ্রন্থমধ্যে কোন স্থানে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা লেখেন নাই। তবে একমাত্র রচনাদর্শন করিয়া সময়ের অনুমান করিতে হইবে—তাহা করিয়া দেখাযাইতেছে যে, কাশীরামদাসের রচনা কীর্ত্তিবাস ও মুকুন্দরামের রচনা অপেক্ষা অবশ্যই আধুনিক হইবে। কারণ উক্ত কবিদ্বয়ের রচনায় অপ্রচলিত প্রাচীনশব্দের ব্যবহার, ভাষার অসুকুমারতা ও ছন্দোবিষয়ে বর্ণগত বৈষম্য যত দেখিতে পাওয়াযায়, কাশীরামের রচনায় তত দেখিতে পাওয়া যায়না। তদ্ভিন্ন রামায়ণ ও চণ্ডীর হস্তলিখিত ও মুদ্রিতপুস্তকের পাঠসকল যেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন, মহাভারতের উক্তবিধ পুস্তকদ্বয়ের পাঠ সেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাও মহাভারতকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ করিবার এককারণ বটে—যেহেতু অত্যন্ত প্রাচীনপুস্তকে যত পাঠান্তর হইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে তত পাঠান্তর হয়না। যাহাহউক, পূর্ব্বে আমরা একপ্রকার সপ্রমাণ করিয়াছি যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ এক্ষণকার প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত; কাশীরামদাসের মহাভারত উহা অপেক্ষা আধুনিক হইলে অবশ্যই উক্ত সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত, বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তী সময় নিরূপণ করিবার উপায় কি ?—

আমরা যে কয়েকখানি হস্তলিখিত মহাভারত সংগ্রহকরিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে একখানি সভাপর্ব্বের পুস্তক সন ১১৪১ সালে অর্থাৎ ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অঃ] লিখিত। আরও একখানি উদ্যোগপর্ব্ব আমাদের নিকট আছে; সেখানিতে সন তারিখ লেখা নাই, কিন্তু সেখানির অবস্থা দর্শন করিলে তাহা পূর্ব্বোক্ত সভাপর্ব্বের পুস্তক অপেক্ষা অন্ততঃ ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, বলিয়া অনুমান হয়। যদি তাহা হয়, তবে ঐ পুস্তক বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, স্বীকার করিতে হইবে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনপুস্তক স্বল্পকালমধ্যে দেশব্যাপী হইতে পারেনা। আমরা যে পুস্তকের কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহা যে স্থানে লিখিত, সে স্থান কাশী-রামের বাসগ্রাম হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। সুতরাং অন্ততঃ ৩০ বৎসরের ন্যূনে কাশীরামের রচনার ততদূর পৌঁছান সম্ভববোধ হয়না। অতএব আমাদের বোধহয় সন ১০৭৫ সালে বা ১৫৯০ শকে অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

এই পর্য্যন্ত লেখা সমাপ্ত হইলেপর আমরা উক্ত সিঙ্গি-গ্রামবাসী ওকড়সা স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপ্রদাসতর্করত্ন মহাশয়ের এক পত্র পাইলাম। তিনি এবিষয়ের অনেক অনুসন্ধান করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে " কাশীরামদাসের পুত্র * আপন পুরোহিতদিগকে যে

* পুত্রের নাম জানিতে পারাযায় নাই।

বাস্তুবাটী দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত; এক্ষণে ২।৩ খানি ছিন্ন বস্ত্র দিয়া আঁটা আছে, তথাপি অনেক স্থান ছিন্ন ও গলিত হইয়া গিয়াছে—সকল কথা পড়িতে পারাযায়না” ইত্যাদি—যদি এদানপত্র প্রকৃত হয়, তবে কাশীরাম এক্ষণ হইতে ২০০ বৎসরের কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

কাশীরামদাস অতিবিনীত কবিত্বগর্ব্বশূন্য পরমভাগবত লোক ছিলেন। মহাভারতের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে—অথবা পূর্ব্বেই কেন, এপর্য্যন্ত কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াও আপনাকে ‘কবি’ ও আপনার ‘রচনা মধুর’ এরূপ কোথাও কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কেবল ব্যাসদেবের ও মহাভারতকথার ভূরি ভূরি প্রশংসাতেই তাঁহার সকল ভণিতি পর্য্যবসিত হইয়াছে।

“ ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত। কাশীরামদাস কহে পাঁচালির মত ॥” ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরামদাস ॥ “ মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥”

ইত্যাদি যে কোন ভণিতিই পাঠ করাযাউক, তদ্দারাই তাঁহার বিনয়নম্রতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াযায়। তিনি সংস্কৃত জানিতেন কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। কারণ তাঁহার মহাভারত মূলসংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ নহে, অনেক

স্থানেই তিনি ভূরি ভূরি বিষয়ের পরিবর্জ্জন ও ভূরি ভূরি বিষয়ের নূতনরূপ যোজনা করিয়াছেন। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। মূল ও ভাষা মহাভারতের যে কোন স্থান খুলিয়া পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলেই মিলাইয়া দেখিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একেবারে নূতনসঙ্কলিতও হইয়াছে। বনপর্ব্বের মধ্যে শ্রীবৎসোপাখ্যান নামে যে একটী বৃহৎ উপাখ্যান আছে, তাহা মূল সংস্কৃতে একেবারে নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, উহা কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যখন্ কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও খুল্লনার পরীক্ষাদানাবসরে—

"কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তানারী"

এই কথার উট্টঙ্কন আছে, তখন্ আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ উপাখ্যান কোন পৌরাণিকমূল হইতেই হউক বা অন্যরূপেই হউক দেশমধ্যে প্রথিত ছিল; কবি তাহাকেই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধহয়, কৃত্তিবাসের ন্যায় কাশীরামদাসও কথকের মুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া এই রচনা করিয়াছেন। যে হেতু তিনি নিজেই কয়েক স্থলে লিখিয়াছেন—

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার। অবহেলে শুন তাহা সকল সংসার॥

যাহাহউক কাশীরামের সংস্কৃত জানা না থাকিলেও তাঁহার রচনা অসংস্কৃতজ্ঞের রচনার ন্যায় বোধহয়না। ঐ রচনাতে এরূপ সংস্কৃত শব্দ সকল প্রযুক্ত আছে যে, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সহজকথা নহে।

কবিত্ব বিষয়ে কাশীরামদাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তি কম ছিল, একথা বলাযায়না। মহাভারতে আদি, করুণ, রৌদ্র, বীর ও শান্ত রসের ভূরি ভূরি স্থল আছে, কাশীরাম সেই সকল স্থলেই কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। ঐ পরিচয় মহাভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর আছে; উদাহরণস্বরূপ কয়েকটীমাত্র আমরা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম——

দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর, কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা, দেখি মুনিমন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে দৌঁহে গেল বন।
চারু ভুরুলতা, দেখিয়া মন্মথা, নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দূর চাঁচর চুলে॥
তড়িত মণ্ডল, গণ্ডেতে কুণ্ডল, হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব, হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু, অগাধ অম্বধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, দেখি ভুজব্যাল, প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, করিহর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ, নখতেজে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কন, করে ঝনঝন, চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর, স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস॥
রামরম্ভা তরু, চারুযুগ উরু, দেখি নিন্দে হাত হাতি।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ-ঈশ, নিতম্ব যুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল, কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ, সহজে মোহে অনঙ্গ॥

কমলবদন, কমল নয়ন, কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাঙ্ঘ্রিতল, ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়, অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত, কোমল মধুপ বৃন্দ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে, সৃজিল কমলজাত।
কমলাবিলাসী, বন্দি কহে কাশী, কমলাকান্তের সুত॥
আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদোদ্যত ব্রাহ্মণরূপী অর্জ্জুনকে দেখিয়া সভাসদদিগের উক্তি।

কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন। সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥ দেখি দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥ অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা। নখরুচি, কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥ সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধরের তুল। খগরাজ, করে লাজ, নাসিকা অতুল॥ দেখ চারু, যুগ্মভুরু, ললাটে প্রসর। কি সানন্দ, গতিমন্দ, মত্ত করিবর॥ ভুজযুগে, নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত। করিকর, যুগবর, জানু সুবলিত॥ বুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী। দেখিএরে, ধৈর্য্যধরে, কোথা কে কামিনী॥ মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিল নাগে॥ এইক্ষণে, লয় মনে, বিন্ধিবেক লক্ষ্য। কাশী ভণে, কৃষ্ণজনে, কি কর্ম্ম অশক্য॥ আদিপর্ব্ব।

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ।

আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে। চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে॥ কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ। অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥ শেল শূল শক্তি জাঠী মুষল মুদ্গর। ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর॥ পর্ব্বতআকার. হস্তী ভীষণদশন। চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদগর্জ্জন॥ দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন। দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেই ক্ষণ॥ না হতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস। শরজাল করিয়া পূরিল দিক্‌পাশ॥ বরিষা-কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে। দিনকর তেজ যেন সর্ব্বঠাঁই লাগে॥ যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয়গণ। করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন॥

বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ। বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন॥ ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে। ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে॥ ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির। রথবেগে পড়িল অনেক মহাবীর॥ মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে। নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতুহলে॥ কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত। খণ্ড২ হইয়া পড়িল চতুর্ভিত॥ ধনুর্ব্বাসহিত বামহাতে ফেলে কাটি॥ বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটী॥ অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছট ফটী। কাটিয়া ফেলিল কারু দন্ত দুই পাটী॥ শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত। কাটিয়া পড়িল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত॥ কাটিলেন রথধ্বজ করি খণ্ড২। মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥ তীক্ষ্ণবাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল। আর্ত্তনাদ করি পড়ে মহি বহুদল॥ চক্রাকারে ভ্রমি ভূমে দিয়া পড়ে দন্ত। পেটেতে বাজিল কারু বাহিরায় অন্ত্র॥ এই মত মাহামার করিল ফাল্গুনি। সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনী। বিরাটপর্ব্ব।

রণভূমিতে দুর্য্যোধনকে পতিত দেখিয়া গান্ধারীর বিলাপ।

পুত্রদরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল। গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥ পঞ্চপাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥ সম্বিৎ পাইয়া তবে গান্ধারতনয়া। চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥ দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন। সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥ শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার। কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥ কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়। একলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥ কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ। কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥ একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়। হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥ সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন। হেন তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥ জাতি যূথী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর। রঙ্গণ মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥ এসকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া। হেন তনু লোটে ধূলা দেখনা চাহিয়া॥ অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তুরী। লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥ শোণিতে সে আজি তনু হইল শোভন। আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥ ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর। যুদ্ধহেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর॥

উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥ কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ। প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন॥ এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা। প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা॥ নারীপর্ব্ব।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে প্রকার নূতন২ ছন্দের অনুসরণ আছে, মহাভারতে তাহা অধিক নাই। ইহাতে আদ্যোপান্ত সমুদায়ই পয়ার; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী ও ২।১টী তরল পয়ার প্রভৃতি আছে। ইহাতে বোধহয় কবি, সাগরস্বরূপ ভারতরচনায় প্রবৃত্তহইয়া কিরূপে প্রারব্ধের পরিসমাপন করিবেন, তজ্জন্য সতত চিন্তিত ছিলেন, এবং রচনার শীঘ্রতাসম্পাদন নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, সুতরাং ছন্দের পারিপাট্যের প্রতি তত মনোযোগ দিতে পারেননাই। এই জন্যই মহাভারতে নূতন ছন্দের তাদৃশ অনুসরণ হয়নাই। কিন্তু এস্থলে ইহা স্বীকারকরিতে হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত গ্রন্থ সকলে যেমত যে সে বর্ণ লইয়া অন্ত্যবর্ণের মিলকরিয়া দেওয়াহইয়াছে, ইহাতে সেরূপ করাহয়নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধনিয়ম ইহাতে অনেকদূর অনুসৃতহইয়াছে।

যাহাহউক, কীর্ত্তিবাস রামায়ণকে ও কাশীরামদাস মহাভারতকে ভাষায় পরিবর্ত্তিতকরিয়া সাধারণ লোকের যে, কিরূপ উপকার করিয়াগিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষকরাযায় না। অধিক কি বাঙ্গালাদেশমধ্যে ইহাঁরাই বাল্মীকি ও ব্যাসকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, বলিতে হইবে। ঐ দুই গ্রন্থ ভাষায় না থাকিয়া কেবল সংস্কৃতে বদ্ধ থাকিলে, রাম-

চন্দ্রের অকপট পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের অবিচলিত জ্যেষ্ঠানুরাগ, সীতার অনুপম পাতিব্রত্য, পাণ্ডবদিগের অলৌকিক সৌভ্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা, পঞ্চপতিত্বেও পাঞ্চালীর আশ্চর্য্যরূপ সতীধর্ম্মরক্ষা, ধার্ম্মিকদিগের বিপদ্বিনাশার্থ কৃষ্ণরূপী ভগবানের তাদৃশ চতুরতা, এ সকল কথা দেশের কয়জন লোকের মুখে শুনাযাইত? এখন্—বিশেষতঃ আবার ছাপার পুথি হওয়াতে—মুদীরাপর্য্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের বিষয় লইয়া কথায় কথায় দৃষ্টান্তদিয়া থাকে। ইহা মহাত্মা কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের অনুগ্রহের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পশ্চিমদেশে তুলসীদাসের রামায়ণ থাকাতে তদ্বর্ণিত উপাখ্যান সাধারণে বলিতেপারে বটে, কিন্তু ভারতের সেরূপ কোন ভাষাগ্রন্থ না থাকায় তদুপাখ্যানসকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

যাহাহউক ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, অথবা কাশীদাসের পরম শ্লাঘার বিষয়, বলিতেহইবে যে, মহাসমৃদ্ধ মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বহুল ধনব্যয়ে ১০। ১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া অবিশ্রান্ত ৮ বৎসরকাল পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক যে মহাভারতের বাঙ্গালাগদ্যানুবাদ সমাপন করিতে পারিয়াছেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বর্দ্ধমানাধিপ শ্রীযুক্ত মহাতাপচন্দ্রবাহাদুর ঐরূপে পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য লইয়া ১৭৮৪ শকের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াও, অদ্যাপি

যে মহাভারতের বাঙ্গালাঅনুবাদ শেষকরিতে পারিলেন না! নিস্ব কাশীরামদাস, বোধহয়, খড়োঘরের পিঁড়ায় ছেঁড়া মাতুরে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছন্দোবন্ধে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াগিয়াছেন! তাদৃশ বৃহৎকার্য্যসম্পাদনে বোধহয় কেবল কথকের মুখে কথাশ্রবণই তাঁহার প্রধান সাহায্য হইয়াছিল।

যাহাহউক এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, কথকদিগের হইতেও বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা পুরাণের সংস্কৃতশব্দসকল চলিতভাষায় যোগকরিয়া ব্যাখ্যা করেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা গীতস্বরসহকৃত হওয়ায় সাধারণের মনে অঙ্কিতহইয়াযায়, সুতরাং সেই সকল শব্দ ক্রমে ক্রমে ভাষার মধ্যেই ব্যবহৃতহইয়া ভাষার পুষ্টিসম্পাদন করে। ফলতঃ কথকতার প্রচার না থাকিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত বোধহয় আমরা কখনই প্রাপ্তহইতামনা। কথকতার ব্যবসায়ও আমাদের দেশে নূতন নহে—কবিকঙ্কণের পূর্ব্বেও উহার প্রাদুর্ভাব ছিল। পূর্ব্বকালীন লোকেরা কথকদিগের বিলক্ষণ সমাদর ও গৌরব করিতেন। গৌরবের কারণও ছিল; যেহেতু তৎকালে কথকদিগের মধ্যে অনেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কৃষ্ণহরি, গদাধরশিরোমণি, রামধনতর্কবাগীশ প্রভৃতি কথকদিগের নাম লোকে অদ্যাপি ভক্তিসহকারে উল্লেখ করিয়াথাকে। সম্প্রতি

কতকগুলি নিরক্ষর বা স্বল্পাক্ষর লোক ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনেকেরই পানাসক্তি, বিশেষতঃ পরদারানুরক্তিদর্শনে ঐ শ্রেণীর উপরেই লোকের অভক্তি জন্মিয়াগিয়াছে। এখন্ আর কোন ভদ্রলোকে নিজবাটীর মধ্যে কথা দিতে পার্য্যমাণে সম্মত হননা।

মহাভারতের ভাষা রামায়ণ ও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত ও স্পষ্ট; ইহাতে বোধহয় ঐ সময়ে বাঙ্গালার অনুশীলন কিছু অধিক হইতে আরম্ভহইয়াছিল। পূর্ব্ব-হইতে গণনাকরিয়াও দেখাযাইতেছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালা-পুস্তকের সঙ্খ্যা অনেকগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ চণ্ডী ও রামায়ণের সময় অপেক্ষা মহাভারতের সময়ে বাঙ্গালার কিঞ্চিৎ শ্রীসৌষ্ঠব হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

কাশীরামদাস মহাভারত ভিন্ন আর কোন রচনাকরিয়াছিলেন কি না, তাহা বলা যায়না। যদি করিয়াও থাকেন, তাহা লুপ্ত হইয়াছে বোধহয়।

রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন।

কাশীরামদাসের মহাভারতের পর প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্তের মধ্যে বাঙ্গালার কোন ভাল গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। ঐ কালমধ্যে কোন ভালগ্রন্থ হইয়াছিল? কি হয় নাই? তাহাও স্থির বলিতে পারাযায়না। যাহাহউক আমরা মহাভারতের পর একেবারে শিবসঙ্কীর্ত্তনে হস্তক্ষেপ

করিলাম। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ রামেশ্বরভট্টাচার্য্য ইহার প্রণেতা। ইনি জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের পূর্ব্বাধিকারী যশমন্তসিংহের সভাসদ ছিলেন এবং সেই সভাতেই ঐ সঙ্গীতের প্রকাশ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত রামাক্ষয়বাবু এবিষয়েও অনেকগুলি সংবাদ দিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানে প্রকাশ হইয়াছে—বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে রামেশ্বরের পূর্ব্বনিবাস ছিল। পরে তিনি যশোমন্তসিংহের সভাসদ হইয়া মেদিনীপুর পরগণার অন্তঃপাতী অযোধ্যাবাড়গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যেই উক্ত রাজপরিবারের ও নিজপরিবারের যে সকল বিস্তৃতবিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়াদিলেই এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইবেনা। সে সকল বিষয় এই—

"মহারাজ রঘুবীর, রঘুনাথ সমধীর, ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে, রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য পুত্র যশমন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত, শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে স্ববসতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥"
"তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর, বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥"
"ভট্ট নারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী, অযোধ্যানগর নিকেতন॥
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎসিংহ পরকাশ, রাজা রামসিংহ কৈল স্থিত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, রচিয়া পুরাণপটে, রচাইল মধুরসঙ্গীত॥"
"যশমন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস। সে রাজসভায় হলো সঙ্গীত প্রকাশ॥ জগতে ভরিল যার যশকীর্ত্তি গানে। কর্ণপুরে কলিরামে

কেবা নাই জানে॥ ভঞ্জভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত"—"ভগিনী পার্ব্বতী গৌরী সরস্বতী ত্রয়। দুর্গাচরণাদি করে ভাগিনেয় ছয়॥ ভাগিনেয়ীপুত্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যোঘাটী। এসকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জটি॥ সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়। পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিও॥"

এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলেই কবি আপনাকে রামসিংহ-প্রতিষ্ঠিত ও যশবন্তসিংহের সভাসদ বলিয়া ব্যক্তকরিয়াছেন। যাহাহউক কবির ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ীপুত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোন স্থলে সন্তানের নামোল্লেখ নাই, অতএব বোধহইতেছে, তাঁহার সন্তান হয়নাই। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী দুই স্ত্রীর নামোল্লেখ থাকায় ইহাও অনুমানহয় যে, একের বন্ধ্যাত্ববোধ হইলে অপরবিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু রামাক্ষয়বাবু লিখিয়াছেন যে, কবির বংশে অযোধ্যাবাড়গ্রামে অদ্যাপি দুইটী নাবালক আছে, কিন্তু সে দুইটীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কিরূপ? তাহা জানিতেপারাযায়নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ণগড় মেদিনীপুরের ৩ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী। তথায় যশবন্তসিংহের বংশীয় কেহই নাই, কিন্তু ভগবতী মহামায়ার ভগ্নপ্রায় মন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী (যোগাসনবিশেষ) প্রস্তুত করিয়া রামেশ্বরকবি জপ করিতেন, তাহাতে মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, এবং সেই বরপ্রভাবেই তিনি শিবশঙ্কীর্ত্তন রচনাকরেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

শিবসঙ্কীর্ত্তনকে ঐ দেশে 'শিবায়ন' কহে। কবি কোন্ শকে এই শিবায়ন রচনাকরিয়াছিলেন, নিজরচনামধ্যেই তাহা উল্লিখিত আছে যথা—

"শাকে হলে চন্দ্রকলা রাম করতলে। বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥ সেই কালে শিবের সঙ্গীত হলো সারা।"—

আমরা অনেক ভাবিয়াচিন্তিয়াও এই শ্লোকহইতে স্পষ্টরূপে কোন শাক বাহির করিতেপারিলামনা। বোধ হয় উক্তরচনায় লিপিকরপ্রমাদবশতঃ পাঠব্যতিক্রম হইয়াগিয়াথাকিবে। মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শাকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ নিবেশিত আছে। উহা অতিকষ্টকল্পনায় সঙ্গতকরা যাইতে পারে। যাহাহউক অগত্যা উহাই স্বীকারকরিতে হইল। কিন্তু এবিষয়ে আর একটী প্রমাণ পাওয়াযাইতেছে—নবাব সূজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬শকে [১৭৩৪ খৃঃ অব্দে] এই যশবন্তসিংহ ঢাকার নায়েব নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালিবআলীর সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ইহাঁরই যত্নে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায় নবাব সায়স্তাখাঁর সময়হইতে আবদ্ধ ঢাকানগরের পশ্চিমদ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যাহাহউক ইনি ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিতপুস্তকের গণনানুসারে শিবসঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বেও ঐ গ্রন্থ রচিতহওয়া অসম্ভাবিত

নহে। বিশেষতঃ ইতিহাসে ইহাও দেখাযাইতেছে যে, দেওয়ানীলাভের পূর্ব্বেও যশবন্ত প্রসিদ্ধ মুর্শীদকুলীখাঁর অধীনে বহুদিন থাকিয়া বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে যে রচিতহইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিকঙ্কণ—দেবদেবীর বন্দনা, গ্রন্থসূচনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা, কন্দল প্রভৃতিক্রমে—যেরূপে গ্রন্থ আরম্ভকরিয়াছিলেন, ইনিও অবিকল সেইরূপে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে ইহাতে ধর্ম্মকথাপ্রসঙ্গে শিবের উক্তিতে রুক্মিণীব্রত, রামনামমাহাত্ম্য, বাণরাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান এবং সতীমাহাত্ম্য ও ব্রতাদির অনেককথা বর্ণিত আছে। ঐ সকল কথার পর শিবের কৃষিকর্ম্মারম্ভ, তাঁহাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে তথায় গমন, শিবকে ঠকান, শিবের শাঁখারীবেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে বাগ্দিনীরূপে প্রতারণাকরার প্রত্যুত্তরদান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিতহইয়াছে, তাহা আমরা অন্যকোথাও দেখি নাই—বোধহয় উহা কবির স্বকপোলকল্পিত হইবে। এই সকল স্থলে কবি বিলক্ষণ চতুরতা, বিলক্ষণ পরিহাসরসিকতা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখাপরাইবার বৃত্তান্তটী আমাদের এতই মিষ্ট

লাগিল যে, ২। ৩ বার পাঠকরিয়াও তৃপ্তিবোধ হইলনা। কেবল ঐ স্থলই কেন? কার্ত্তিকগণেশের কন্দল, পিতাপুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কন্দলপ্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ প্রীতিকর। ফলতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থখানি অবশ্যই উৎকৃষ্টকাব্যমধ্যে গণ্যহইতেপারে। তবে করুণরস না থাকিলে কোন কাব্যই মনকে তত আর্দ্র করিতেপারেনা—কবি এগ্রন্থের কোন স্থলেই করুণরসের তত উদ্দীপ্তি করিতে পারেননাই।

শিবসঙ্কীর্ত্তনের নায়কনায়িকা দেবদেবী, সুতরাং তাঁহাদের আচারব্যবহারের যুক্তাযুক্ততাবিচার অকর্ত্তব্য। কবির রচনা বেশ কোমল ও বিশদ নহে। ইনি বড়ই অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন—স্থানে স্থানে অনুপ্রাসসকল বেশ মিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থলবিশেষে কতকগুলি বিলক্ষণ কর্কশও বোধহয়। নিম্নভাগে তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃতকরিয়া দেওয়াগেল, পাঠকগণ দেখিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন।

পিতাপুত্রের ভোজন।

যোগ করে দুটী পুত্র লয়ে তার পর। পাতিত পুরটপীঠে বসে পুরহর॥ তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥ তিন জনে একুনে বদন হলো বার। গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥ তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥ দেখে দেখে পদ্মাবতী বসে এক পাশে। বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥ শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্তদিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥ গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়ে খা॥ মুষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥ রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।

যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ?॥ হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে ॥ লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝী। সূপ হলো সাঙ্গ আন আর আছে কি ?॥ দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ ॥ সিদ্ধিদল কোমল ধুতূরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ উল্বণ চর্ব্বণে ফিরে ফুরাল ব্যঞ্জন। এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন ॥ চটপট পিশিতমিশ্রিত করে যূষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে ॥ চঞ্চল চরণে বাজে নূপুর চমৎকার। রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনৎকার ॥ দিতে ৷ যাতে
নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কো
মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তি
খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী
পরে ॥ হরবধূ অন্ন
ধর ভার ॥ না
কৈল দ্রব্য
ক্ষুধারূপ
উদ্গার।
আইল

দুঃ
চন্দ্র
কা
পা
নহ
বং
বি
ব
ম

মঙ্করি! খাবনাহি ভাত। যাবনাই ভিক্ষায় যাকরে জগন্নাথ॥ পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন যাবে। চাক্ করিলে ভাঙ্ এখন পাক করিতে কবে॥ এখন্ বাপের কাছে বসে আছে পো। ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করি! খেতে দেনা গো॥ বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়। স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা দায়॥

শঙ্খপরিধানের উপাখ্যান।

হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ। কান্ত সঙ্গে করিয়া কথার অনুর … পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে। রঙ্গিণী সে রঙ্গনাথে

… হরে করে কাকুবাদ। পূর্ণকর পশু-

…তে শঙ্খ দেও দুটী বাই। রূপা

…লোকের কাছে লুকাইয়া

…তুলঙাটী পারা দুটী

…র॥ পতিব্রতা

…সাচন বলে॥

…হা অসম্ভব

…র কানে

…মন্‌সে

…বিপ-

…াছে

…ন॥

…ারা-

…মি

…া-

…ক।

…ম-

…বড়

…ই

…ন

চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন॥ গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু॥ নিদান দারুণ দিব্য দিলে দেবরায়। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও॥ করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাষিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥ ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটী হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥ যাও যাও যত ভাব জানাগেল বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি॥ চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়। নিবারিতে নারিয়া নারদপাশে ধায়॥ রামেশ্বর ভাষে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝী॥

হিমালয় হইতে হরপার্ব্বতীর প্রত্যাগমন।

ঘর যেতে হর চায়, গৌরীগিয়া কহে মায়, শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস জানি, যেমন কৌশল্যা রাণী, কাকুস্বরে করেণ রোদন॥
সুখময়ী রাজকন্যা, ভিক্ষুগৃহে দুঃখগণ্যা, কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়।
এই দুঃখে আমি সারা, পরাণপুতুলী তারা, কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায়॥
পাইনু পরম সুখ, পাসরিছি সব দুখ, নিরখিয়া তুয়া মুখ চাঁদে।
তোমারে বিদায় দিয়া, কেমনে ধরিব হিয়া, মনের সহিত প্রাণ কাঁদে॥
বসাইয়া বরাসনে, পালিব পরাণ পণে, মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যত দিন জীব, আর না পাঠাএ দিব, ফলভরে ভাঙ্গে নাহি ডাল॥
ননীর পুতলী ছিল, জ্বলন্ত অনলে দিল, বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী নারী, সকল খণ্ডাতে পারি, কপাল খণ্ডন নাহি যায়॥
গৌরীর গলায় ধরে, বিস্তর বিলাপ করে, জননী কাঁদিয়া মোহ যায়।
মুছিয়া বদনখানি, বলিয়া মধুর বাণী, পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায়॥

অদ্যাপি অনেক ভিক্ষুকে যে, ডম্বুরুবাদনপূর্ব্বক ভগবতীর শঙ্খপরিধানের বৃত্তান্ত গান করিয়া ভিক্ষা করে, বোধহয়, এই শিবসঙ্কীর্ত্তনই সেই সকল গানের মূল। অনেক স্থলে অবিকল এই গ্রন্থের পদ্যই আবৃত্তি করিতে শোনাযায়। শিবসঙ্কীর্ত্তনের ভাষা যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত-

জ্ঞান না থাকিলে ওরূপ শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থরচনা করা সম্ভব হইত না। তদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে কুমার-সম্ভবাদি সংস্কৃতগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়—এবং অনেক প্রাচীন অধ্যাপকে কবিকঙ্কণের শ্লোকের ন্যায় শিবসঙ্কীর্ত্তনেরও অনেক শ্লোক আদরপূর্ব্বক আবৃত্তি করিয়াথাকেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ অপেক্ষা কাশীরামদাসের মহাভারতে ছন্দের বর্ণবৈষম্যাদি দোষ যেরূপ অল্পপরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ। ইহাতেও নূতনরূপ ছন্দের রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়াযায়না। পয়ার দীর্ঘত্রিপদী ও লঘুত্রিপদী ইহাই প্রায় সমুদয়—কেবল ২।১টী স্থলে একাবলী ও ভঙ্গত্রিপদী আছে। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে "পদ্মা কি করি উপায়" "হিমালয় হলো শোকাকুলি" ইত্যাদিরূপ ধুয়ার মতও লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলতঃ মহাভারত অপেক্ষা শিবসঙ্কীর্ত্তনে ছন্দোবিষয়ে কিছু পারিপাট্য হয়নাই।

রামেশ্বরেরও শিবসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ আছে, বা ছিল কি না, তাহার কোন সন্ধান পাওয়াযায় নাই।

রামপ্রসাদসেনের বিদ্যাসুন্দরাদি।

শিবসঙ্কীর্ত্তনের রচয়িতা রামেশ্বরভট্টাচার্য্য ও রামপ্রসাদ সেন বোধহয় এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। তবে রামেশ্বর

প্রাচীন ও রামপ্রসাদ নব্য এইমাত্র। রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তসম্পৃক্ত কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, কিন্তু সে সমস্তেরই মূল কবিবরঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তপ্রকাশিত মাসিক প্রভাকর। প্রাচীন কবিদিগের জীবনবৃত্তসঙ্কলনের জন্য ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তমহাশয়ই অশেষপরিশ্রম স্বীকারকরিয়াছিলেন। অতএব তিনিই এই কার্য্যের জন্য সাধুবাদের প্রথম পাত্র। যাহাহউক আমরা এস্থলে তাঁহার ও অপরাপর মহাশয়দিগের রচিত পুস্তকহইতেই রামপ্রসাদের জীবনসংক্রান্ত কয়েকটী সংবাদ সংগ্রহকরিলাম।

প্রসিদ্ধ হালীসহরের মধ্যবর্ত্তী কুমারহট্টনামক স্থান রামপ্রসাদের জন্মভূমি। তিনি বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বরসেন ও পিতার নাম রামরামসেন ছিল। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যেই নিজবংশের সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নভাগে তাহাই উদ্ধৃত হইল—

"ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাসতুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত, ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ি! ময়ি কুরু দয়া॥"

"জ্যেষ্ঠাভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥ ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥ ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥ সর্ব্বাগ্রজ ভগ্না বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥ গুণনিধি নিধিরাম

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥ জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥ শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মা গো দেহ পদধূলি॥"

উপরি লিখিত উক্তিদ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইতেছে যে, কবির রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং জগদীশ্বরী নামে এক কন্যা ছিলেন। বাসস্থানের কথাও তিনি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্টগ্রাম" ইত্যাদি।

বোধহয় রামপ্রসাদসেন বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় কৃত্যবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বনকরেননাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কলিকাতার কোন ধনিকের* সংসারে মুহুরিগিরিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই পরমার্থ-চিন্তাতেই রত থাকিত, বিষয়কার্য্যে বড় ব্যাপৃত হইতনা। বাল্যাবধিই তাঁহার কবিত্বশক্তি সমুদ্ভূত হইয়াছিল; ঐ শক্তি-সহকারে তিনি কালীবিষয়কগীতি রচনাকরিতেন। সেই সকল গীতি এবং কালীনাম আপনার নিকটস্থ হিসাবের খাতার প্রান্তভাগেই লিখিয়ারাখিতেন। একদিন উক্ত ধনিকের প্রধানকর্ম্মচারী তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রভুকে প্রদর্শনকরেন। প্রভু পরমশাক্ত

* কাহারও মতে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের, কাহারও মতে দুর্গাচরণ মিত্রের।

ও গুণজ্ঞলোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের লেখা আদ্যোপান্ত পাঠকরিলেন এবং তন্মধ্যে এই গানটী—

আমায় দেও মা তবিলদারী। আমি নেমক্ হারাম নই শঙ্করি। পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি। ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।। শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি। অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি॥ আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল চরণধূলার অধিকারী।। যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি। যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি।। প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি। ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লয়ে বিপদ সারি।।

পাঠ করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন, রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে অনর্থক সংসারচিন্তা হইতে বিরত হইয়া কেবল উক্তরূপকার্য্যেই সময়াতিপাত করিতে উপদেশ দিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়াদিলেন।

তদনুসারে রামপ্রসাদ বাটী আসিয়া নিশ্চিন্তমনে পরমার্থচিন্তা ও নানাবিধ গীতরচনা করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের গানের সুর নূতনরূপ, উহা যার পর নাই মধুর এবং সহজ—অর্থাৎ যাহাদের তাল মান কিছুই বোধনাই, তাহারাও অনায়াসে রামপ্রসাদের গান গাইতে পারে। কৃষ্ণনগরের অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সময়ে নিজাধিকার কুমারহট্টে মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় গুণজ্ঞ ও বিদ্যার উৎসাহদাতা লোক এদেশে কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তিনি

রামপ্রসাদের গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গান শুনিয়া ও তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া পরমানন্দে থাকিতেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতবিদ্যা অধিক ছিলনা এবং স্বরও অত্যন্ত মধুর ছিল না—কিন্তু স্বরচিতপদের গানে তাঁহার এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল যে, তদ্দারা তিনি লোককে আর্দ্র করিয়া দিতেন। কথিত আছে রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শীদাবাদে আসিয়াছিলেন, এবং তথায় গঙ্গার উপর নৌকার মধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে নবাব সিরাজউদ্দৌলাও নৌকাকরিয়া নিকটদিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে নিজনৌকায় আনাইলেন, এবং গান করিতে আজ্ঞা করিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের নিকটে বসিয়া হিন্দীগান আরম্ভ করিলেন, নবাব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, " না না ওগান নয়—ওনৌকায় যে গান গাইতেছিলে, সেই গান গাও " অনন্তর রামপ্রসাদ এরূপ নৈপুণ্যসহকারে স্বরচিত গানসকল গাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে নবাবের পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়াগেল।

কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদকে ক্রমে ক্রমে অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি উহাঁকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ তাহাতে সম্মত হন নাই। রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীতশ্রবণ

করিতেন এবং তাঁহাকে ও তত্রত্য আজুগোসাঁইকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বিবাদ লাগাইয়াদিয়া কৌতুক দেখিতেন। আজুগোসাঁইকে সকলে পাগল মনেকরিত। কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে কিছু কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল। রামপ্রসাদ কোন গান রচনাকরিলেই আজুগোসাঁই তাহার একটী উত্তর দিতেন। নিম্নভাগে রামপ্রসাদ ও আজুগোসাঁইএর দুইটী গানের কিয়দংশ লিখিতহইল। রামপ্রসাদের গান—

এই সংসার ধোঁকার টাটী। ওভাই আনন্দবাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্যে অতি পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি॥ ইত্যাদি।

আজুগোসাঁইএর উত্তর—

এই সংসার রসের কুটী। খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটী॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি এবং 'কবিরঞ্জন' এই উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ রাজদত্ত সম্মানের প্রতিদানস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর নামে এক পদ্যগ্রন্থরচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের 'কবিরঞ্জন' নাম দিয়া রাজাকে অর্পণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে আর দুই খানি গ্রন্থও রচনাকরিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের একটী গানে "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই কথার উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গীত রচনা করি-

য়াছিলেন। তাহা সম্ভব না হউক, তিনি যে, বহুসংখ্যক গীতরচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয়নাই। এই সকল গীত কুত্রাপি একত্র পাওয়াযায়না, 'কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ' নামক পুস্তকেও কয়েকটী মাত্র আছে। অনেক ভিক্ষুকে রামপ্রসাদী পদ গানকরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিকমতাবলম্বী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গবোধে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিত—কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। একদা তত্রত্য প্রসিদ্ধঅধ্যাপক বলরাম-তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞাকরায় তিনি নিম্ন-লিখিত গানটীদ্বারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন যথা—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মনমাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বলে॥"

এইরূপ সাংসারিক সকলবিষয়েই সামান্য সামান্য কথায় মুখে মুখে গানরচনাকরিবার শক্তি থাকায় রামপ্রসাদকে অনেকে কালীর বরপুত্র বা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিশ্বাসকরিত। রামপ্রসাদেরও মনেমনে বোধছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মেও কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এ জন্মে তিনি আপন স্ত্রীকে আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনেকরিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী কালী স্বপ্নযোগে তাঁহার পত্নীকে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন; বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অনেক স্থলে এই কথার উল্লেখ আছে, যথা

"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বি-

মুখ আমারে ॥ জন্মে২ বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব ॥"

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, নীলুপাটুনিনামক কবিওয়ালার দলেও রামপ্রসাদ নামে একজন কবি ছিলেন। নিম্নলিখিত গীতাংশে তাহার উল্লেখ পাওয়াযায় যথা—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেম্‌নি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন ॥"

কেহ২ অনুমানকরেন প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী পদসকল এই কবিওয়ালা রামপ্রসাদের রচিত—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নহে। কিন্তু গীত ও বিদ্যাসুন্দরাদি গ্রন্থের ভাষাদির সৌসাদৃশ্য দর্শনকরিয়া অপরে এ কথায় কোনরূপে বিশ্বাস করেন না।

কবিরঞ্জনরামপ্রসাদের জীবনবৃত্তবিষয়ে কতকগুলি অলৌকিক উপাখ্যান আছে। অদ্যাপি অনেকলোকে তাহাতে বিশ্বাস করেন, এই জন্য নিম্নভাগে কয়েকটী লিখিত হইল— একদা রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন; তিনি বেড়ার যে পার্শ্বে বসিয়া দড়িতে গাঁইট দিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাহার অপরপার্শ্বে বসিয়া আবশ্যকমতে দড়ী ফিরাইয়াদিতেছিলেন; হঠাৎ কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়ায় জগদীশ্বরী তথা হইতে চলিয়াযান—রামপ্রসাদ তাহা দেখিতে পাননাই, কিন্তু দড়ী পূর্ব্ববৎ সময়মত ফিরিয়াআসিতেছিল; কিয়ৎক্ষণপরে কন্যা তথায় আসিয়া বেড়া অনেকদূর বাঁধাহইয়াছে দেখিয়া, কে দড়ী ফিরাইয়া দিল ? জিজ্ঞাসা-

করায় রামপ্রসাদ কহিলেন 'কেন মা! তুমিই ত বরাবর দড়ী ফিরাইয়াদিতেছ'! তখন্ কন্যা আপনার কার্য্যান্তরগমনের কথা প্রকাশ করিলে রামপ্রসাদের বোধ হইল যে, তবে সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী আসিয়া দড়ী ফিরাইয়া দিয়াগিয়াছেন।

আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী আসিলে তাঁহার মাতা কহিলেন রামপ্রসাদ! 'কে একটী স্ত্রীলোক তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোমার দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া রাখিয়াগিয়াছে, পড়িয়া দেখ'; রামপ্রসাদ পড়িয়া দেখিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন—দেখা না পাইয়া লিখিয়াগিয়াছেন যে, 'তুমি কাশীতে গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আইস'; রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গেলইয়া কাশীযাত্রা করিলেন এবং ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া সে রাত্রি অবস্থানকরিলেন; নিশাযোগে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে জানাইলেন যে, আর তোমার কাশী যাইতে হইবেনা—এই খানেই আমাকে গা[illegible]নাও; রামপ্রসাদ তথায় অনেক গান গাইলেন, তন্মধ্যে [illegible] এই—

কাজ্ কি আমার কাশী।
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
কেনে মার চরণ কাশী, সেই [illegible] ভালবাসি
কাশী বলে হয় মুক্তি, বটে সে[illegible]বের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি মুক্তি তার দাসী॥ ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের মৃত্যুবিষয়েও এরূপ [illegible]ছিল। অন্নদাকালী-

পূজার পর দিন রামপ্রসাদ আপন পরিবারদিগকে আপনার আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া প্রতিমাবিসর্জ্জনের সময়ে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত ৪টী গীত গানকরেন—

"কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনুতরণী ত্বরা করি চলবেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা মন কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মুল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অনিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে"॥ ১॥

"বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে" ॥২॥

"নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষা[illegible] আসান দেমা ফিরে চেয়ে,
আমি [illegible] দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো" ॥৩॥

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এই—কবি[illegible]খলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে॥

শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
মাগো ওমা—ফাঁকীর উপরে ফাঁকী, ডানচক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা—দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা—আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে" ॥ ৪ ॥

প্রবাদ এইরূপ যে, এই শেষোক্তগানের "দক্ষিণা হয়েছে" এই অংশটুকু গাইবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। এই সকল উপাখ্যান কতদূর সত্য বা সম্ভব, তাহালিখিবার প্রয়োজন নাই, বিজ্ঞপাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহাহউক রামপ্রসাদের বংশীয়েরা কলিকাতায় বাস করিয়াছেন। তাঁহার প্রপৌত্র বাবু গোপালচন্দ্রসেন ও বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবু কালীপদসেন কলিকাতাতেই বিষয়কর্ম্ম করেন। ইহাঁদের কুমারহট্টস্থ বাসস্থান পড়াটিবি হইয়া রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের জীবনবৃত্ত লইয়া অনেকক্ষণ গেল; এক্ষণে তদীয়গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকর্ত্তব্য। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ ও প্রধান কবিরঞ্জন বা বিদ্যাসুন্দর। কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে তাঁহার যে অপর দুইগ্রন্থ আছে, তাহা ক্ষুদ্র ও কেবল গানময়। তাঁহার কোনগ্রন্থেই সময়নির্দেশক কোন কথা নাই। সুতরাং তাঁহার কবিরঞ্জন কোন্ শকে রচিত হইয়াছে, তাহা স্থির বলাযায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বোধহয় যে, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলরচনার ২।১ বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। অন্নদামঙ্গল

১৬৭৪শকে সমাপ্ত হইয়াছে, একথা তদ্‌গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; সুতরাং কবিরঞ্জন ১৬৭০।৭২শকে রচিত হইয়াছে, অনুমান করাযাইতেপারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপরীত অনুমানও করিয়াথাকেন—তাঁহাদের বোধে কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলের পর। কিন্তু একথা কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়াবোধহয়না। যেহেতু অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াও কবিরঞ্জনরচনা করা প্রবহমাণ নদীসন্নিধানে সরোবরখননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য হয়। প্রধানকবি রামপ্রসাদ তত অবিবেচক ও অসহৃদয় ছিলেন, ইহা সম্ভবহয়না। বরং এইরূপ সম্ভব যে, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনাকরিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করিলে তিনি উহা পাঠকরিয়া পরমপরিতুষ্ট হয়েন; কিন্তু উহাকে আরও বিশোধিত ও সুমধুর করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সভাসদ ভারতচন্দ্ররায়গুণাকরের হস্তে সমর্পণ করেন। রায়গুণাকর উহা বিশোধিত না করিয়া ঐ মনোরম উপাখ্যানকে অস্থিস্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক মাংসাদিযোজনা করিয়া নিজে এক বিদ্যাসুন্দর লেখেন, এবং তাহা কৌশলক্রমে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াদেন এবং রচনামুখে উপাখ্যানাংশেও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তকরেন। সে পরিবর্ত্ত প্রধানতঃ এই—কবিরঞ্জনের হীরামালিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের

পরস্পর সন্দর্শনাদির পর, তাঁহারা যেরূপে গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন; তৎসমস্ত অবগত ছিল—রায়গুণাকরের মালিনী সমাগমের বিষয় কিছুই জানিত না এবং কবিরঞ্জন বিদ্যার গৃহ ও শয্যায় সিন্দূর মাখাইয়া চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন, রায়গুণাকর বিদ্যাকে বাসগৃহ হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া কোটাল ও তাহার ভ্রাতাদিগকে স্ত্রীবেশে সেইগৃহে রাখিয়া মহারসিকতাসহকারে চোরকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুন্দরের পরিচয় দিবার জন্য শারীশুক দুইটী গুণাকরের নিজের পোষাপক্ষী। এ ছাড়া আর আর যে বিভিন্নতা আছে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী রামপ্রসাদেরও স্বকপোলকল্পিত নহে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সে পুস্তক পাইলাম না। জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী বাগেরহাট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবুপঞ্চাননঘোষমহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক "সুন্দরকাব্য" নামে দ্বাদশসর্গে বিভক্ত একখানি সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দর আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীনগ্রন্থ নহে—একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত। ঐ গ্রন্থে কবিত্বশক্তির পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত বৈচিত্র্য

নাই—তজ্জন্য উহা রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমানকরাযায়না। যেহেতু তাহা হইলে উহাঁদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যেসকল বৈচিত্র্য আছে, তাহা তিনি কখনই ছাড়িতেন না। বরং এরূপও কতক বোধহয় যে, রামপ্রসাদ ঐ গ্রন্থ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থ দেখিয়াই কবিরঞ্জন রচনাকরিয়াছিলেন; কারণ ঐ উভয় পুস্তকের অনেক অংশে ঐক্য আছে। স্থূলকথা এই যে, উক্ত-গ্রন্থবর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিদ্যাসুন্দরের চলিত উভয়বিধ উপাখ্যানেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তবে হীরার স্থলে বিমলা, গঙ্গারামের স্থলে মাধব, বাঘাইএর স্থলে রাঘব ইত্যাদি কয়েকটী নামঘটিত যাহা বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু চোরধরা প্রকরণে কবিরঞ্জন ও গুণাকরের যে দুইরূপ কৌশল আছে, উহাতে তাহার কোন রূপই নাই। সুন্দর ও বিদ্যার পরিচয়দানস্থলে ও বিচার-সময়ে উক্ত দুই বিদ্যাসুন্দরেই যে সংস্কৃতশ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—উহাতে সে শ্লোকগুলি নাই কিন্তু সেস্থলে অপরবিধ শ্লোক রচিতহইয়াছে। চোরপঞ্চাশৎ নামক শ্লোকের একটীও উহাতে নাই—তবে ২। ৪টী কবিতায় চোরপঞ্চাশদ্বর্ণিত কোন কোন শ্লোকের ভাব লক্ষিতহয় এইমাত্র। ফলতঃ উক্ত সংস্কৃতবিদ্যাসুন্দরহইতে ভাষা দুইখানিই বিদ্যাসুন্দর রচিতহইয়াছে? কি ভাষাবিদ্যাসুন্দরের অন্যতরকে অবলম্বন করিয়া ঐ 'সুন্দরকাব্য' রচিতহইয়াছে? তাহার কোন স্পষ্টপ্রমাণ পাওয়াযায়না।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক* আমরা পাইয়াছি—এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তিপ্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনেসমাগমবিহার ও রাজসমীপে তাহাপ্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যন্ত ৫৬টী শ্লোকে বর্ণিত আছে। বর্দ্ধমান বীরসিংহ সুরঙ্গ প্রভৃতির কোন কথা নাই। এপুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু ইহা বররুচিপ্রণীত সেই পুস্তক কি না? তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহাহউক, রচনাদৃষ্টে এখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধহয়না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার-স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষাপুস্তকরচয়িতার যে, কাহারও নিজের রচিত নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফল কথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে—যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারই স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূলখানি কোন গ্রন্থ*? তাহা স্থির বলিতে পারযায়না।

* এই প্রস্তাবের মুদ্রণকালে আমরা "বররুচিবিরচিতং সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্" নামে একখানি মুদ্রিত পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। উহা আমাদিগের উল্লিখ্যমান এই গ্রন্থই প্রায় অবিকল। কেবল উহাতে চোরপঞ্চাশৎটী অধিক আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকে চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি একেবারে নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্ব্বেও প্রাণরামচক্রবর্ত্তী নামে এক কবি বররুচিপ্রণীত প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কালিকামঙ্গল নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদ সেই উপাখ্যানকে আদর্শ করিয়া কবিরঞ্জন রচনা করেন—কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াও কোথাও কালিকামঙ্গলের একখণ্ড পাইলাম না—সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারাগেলনা। কিন্তু এস্থলে একথা অবশ্য বলাযাইতেপারে যে, কবিরঞ্জন নিজগ্রন্থমধ্যে রাজসমক্ষে বিদ্যার রূপাদিবর্ণনাপ্রসঙ্গে যে পাঁচটী শ্লোক উদ্ধারকরিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্র ঐস্থলে যে ৫০টী শ্লোক 'চোরপঞ্চাশৎ' নামে তুলিয়া তাহার দুইপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি বর্দ্ধমানস্থিত সুন্দরচোরের রচিত নহে। ঐ সকল শ্লোক 'চোর' নামক একজন প্রাচীন কবির রচিত। জয়দেব প্রসন্ন রাঘবনাটকের প্রথমে ঐ চোরের নামোল্লেখ করিয়াছেন যথা—

যস্যা শ্চোর শ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥

"যার শিরে শোভে 'চোর' চিকণ চিকুর।
'ময়ূর' যাহার কর্ণে মণিকর্ণপুর॥
'হাস' যার হাস, 'হর্ষ' হর্ষের প্রকাশ।
কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস যাহার বিলাস॥

"পঞ্চবাণ 'বাণ' যার হৃদয়মাঝারে।
কবিতাকামিনী হেন না ভুলায় কারে॥" (র. স.)

এভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে—যথা—

"কবি রময়ঃ কবি রমকঃ কবী চোরময়ূরকৌ"। ইত্যাদি।

যাহাহউক, ঐ চোরকবির প্রকৃত্নাম বিহ্লণ; তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দেশের কোন রাজকন্যার অধ্যাপনাকার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয়বন্ধ হওয়ায় গোপনে গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়—রাজা তাহা জানিতে পারিয়া বিহ্লণকে বধকরিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলে তিনি তথায় বসিয়া ঐ সকলশ্লোক রচনাকরেন *। এক্ষণে কালিকামঙ্গলকারই হউন, বা রামপ্রসাদই হউন প্রথমে ঐ শ্লোক তাঁহাদের বর্ণনীয়বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নামান্তরে প্রবেশিত করিয়াছেন।

কবিরঞ্জন, গ্রন্থমধ্যে পুষ্পচয়নানন্তর সুন্দরসমীপাগতা হীরামালিনীর চরিত, চৌরান্বেষণসময়ে বিদু ব্রাহ্মণীর বিদ্যাসন্নিধানে যাইয়া কথারম্ভ, কোটালচরগণের বৈষ্ণব, ফকির, উদাসীনপ্রভৃতির বেশধারণপ্রসঙ্গে উঁহাদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা, চৌরদর্শনে নাগরিকদিগের মনেরভাব প্রভৃতি অতি প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন—

* রহস্যসন্দর্ভের ১ম পর্ব্বের ১১ খণ্ডে এবিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে।

"কাল কর পৃথক্ চিন্ত হে মনে এই। লকারে ঈকার দীর্ঘ অসি বটে সেই॥" "যৌবনজলধিমধ্যে মগ্ন মত্তগজ। উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল নহে সে উরজ॥" "উথলে বিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু। মনোমীন ধরিল ধীবরমীনকেতু।" "কান্তাকুচে জ্বলদগ্নি বিচারিয়া কবি। করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥"

"ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা, বিন্দুঃ বহে পড়ে রক্ত। তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার, গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥" "কোন্ ধর্ম্ম, হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম, গাত্রচর্ম্ম, দিয়া দিব পাদুকা চরণে। হৃদয়েশ, এই বেশ, পায় ক্লেশ, কৃপালেশ, কর ভাই অকাল মরণে॥"

এইরূপ ভূরি ভূরি স্থলে তিনি যে, কতই ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থানেস্থানে তাঁহার স্বভাবোক্তিবর্ণন যে, কিরূপ সুমধুর হইয়াছে, তাহা বলা-যায়না। ইহাঁর রচনায় "বিদ্যা মর্ লো কলঙ্কিনী ঝী।" ইত্যাদি রূপ, ২। ১টী ধুয়াও আছে। বিদ্যাপতির রচনার ন্যায় 'কৈসন' 'যৈসন' ইত্যাদি হিন্দিশব্দমিশ্রিত এবং মাধবভাট প্রভৃতির উক্তিতে শুদ্ধহিন্দিগ্রথিত বর্ণনাও অনেক দেখিতেপাওয়াযায়। ইতিপূর্ব্বে রামেশ্বরের যে শিব সঙ্কীর্ত্তনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার রচনায় যেরূপ অনুপ্রাস-চ্ছটা লক্ষিত হয়, ইহার রচনায়ও প্রায় সেইরূপ। উদাহরণস্বরূপ নিম্নভাগে কয়েকটী লিখিত হইল—

"ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুশোভায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়॥" "সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়। তপ্ত-তপনীয়-তনু তারাপতি প্রায়॥" "নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে॥" "শিরে হানি পানি বাণী বলে কব কি। শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝী॥" ইত্যাদি—

এইরূপ অনুপ্রাসানুসন্ধানের জন্যই হউক বা যেকারণেই হউক রামপ্রসাদের রচনা সকলস্থলেই ললিত কোমল ও সুমধুর হয়নাই। অনেকস্থলে অসুন্দর ও কর্কশ লাগে। এবং কয়েকস্থলে, নিতান্ত গ্রাম্য ও অশ্লীলবর্ণনাও আছে। তিনি নিজেই একস্থলে প্রকারান্তরে গর্ব্ব করিয়াছেন—

"কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার।
সে বোঝে অক্ষরকালী হৃদে আছে যার॥"

একথাও যথার্থবটে, তাঁহার কাব্যের অনেকস্থান সকলের বোধগম্য হয়না। কিন্তু সেরূপ অবিশদরচনা কবির প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয়, তাহাপাঠকগণেই বিবেচনা করিবেন। তিনি কয়েকস্থলে কতকগুলি সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ করিয়াদিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদগুলি এতই অস্পষ্ট যে, যাঁহারা সেই মূলশ্লোক না জানেন, তাঁহাদের উহা বোধগম্যহয়না।

পূর্ব্বে যেসকলগ্রন্থের সমালোচনা হইয়াছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা কবিরঞ্জনে অধিকপ্রকার নূতনছন্দ আছে। পয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ লঘু ও ভঙ্গত্রিপদী, চতুষ্পদী, তোটক, একাবলী, দিগক্ষরা এবং আরও দুই একটী নূতনগোছ ছন্দ ইহাতে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যেও অক্ষর, মাত্রা ও মিলের বৈষম্যাদি দোষও দেখিতে পাওয়াযায়॥

রামপ্রসাদপ্রণীত কালীকীর্ত্তনের রচনা মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খলরূপে নিবদ্ধ নহে—উহার অধিকাংশই কেবল গানময়। অন্যছন্দোরচিতও যাহা আছে, তাহাতে অক্ষর বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। কি অভিপ্রায়ে কবি এরূপরচনা করি-

য়াছিলেন, বলিতে পারাযায়না। বোধহয় ওগুলি কোনরূপ গীত হইবে। কিন্তু ঐসকলগীতে যে অতি উৎকৃষ্টভাব আছে, তাহা সকলকেই স্বীকারকরিতেহইবে। গান স্বরসংযোগে গাইলে যেরূপ মিষ্টলাগে, কথায় বলিলে সেরূপ লাগেনা; অতএব গানশক্তিসম্পন্ন পাঠকমহাশয়দিগের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা গাইয়া দেখিবেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন কিরূপ মধুরপদার্থ। উহার একটী গান এই—

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধদিতে উমারে। উমা কেঁদেকরে অভিমান, নাহিকরে স্তনপান, নাহিখায় ক্ষীরননী সরে॥ অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা, ধরে দে উহারে। কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিনও মুখদেখি, মায়ে ইহা সহিতে কিপারে? আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি, যেতে চায় না জানি কোথারে। আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরাযায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥ উঠেবোসে গিরিবর, করি বহুসমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে। সানন্দে কহিছে হাসি, ধরমা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে॥ মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

রামপ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে যেগ্রন্থের কথা শুনাযায়, তাহা দুষ্প্রাপ্য। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তমহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উহার কয়েকটী শ্লোক বৈ বাহির করিতে পারেন নাই। অতএব তাহার সমালোচনাকরার আর প্রয়োজন হইতেছেনা। যাহাহউক এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে কোনপুস্তকে অমুদ্রিত আর কয়েকটী রামপ্রসাদী গীতমাত্র নিম্নভাগে লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করাগেল—

" মন কৃষিকাজ তোয় এসেনা।
এমন মানবজনম রইল পড়ে, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালীনামের দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবেনা।
সে যে শক্ত বেড়া মুক্তকেশী, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।
অদ্য অব্দশতান্তেবা বাজাপ্ত হবে জাননা।
এখন্ আপন ভেবে যতন করে, চুটিয়ে ফসল্ কেটে নেনা।
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, তায় ভক্তিবারি সেঁচে দেনা।
ওরে একলা যদি না সেচ্‌তে পারিস্, রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা " ॥ ১ ॥

" মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক্‌ঢাকা বলদের মত ॥
বেঁধে দিয়ে ভবের গাছে, পাকদিতেছ অবিরত——
একবার খুলে দেমা চখের ঠুলি, হেরি তোর ঐ অভয়পদ " ॥ ২ ॥

" এবার কালী তোমায় খাব।—খাবগো ওদীনদয়াময়ি।
এবার তুমি খাও কি আমি খাইমা, দুটার একটা করে যাবো।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন্ শমন কর্‌বে দমন, সেই কালী তার মুখে দিবো " ॥ ৩ ॥

" এবার আমি বুঝ্‌বো হরে।
ঐ যে ধরবো চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে,
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দেক্ আমারে।
মায়ের ধন পায়না বেটায়, সেধন নিলে কোন্ বিচারে,
ভোলা, মায়ের চরণ, করে ধারণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥ ৪ ॥

মধ্যকালের বিবরণে আমরা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত হইতে আরম্ভকরিয়া কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর পর্য্যন্তের এক প্রকার সমালোচনা করিলাম। ঐকালের মধ্যে আমাদিগের সমালোচিত কয়েকখানি ভিন্ন যে আর কোনগ্রন্থ রচিত হয়নাই, একথা কে বলিতে পারে? আমরাই কয়েক খানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াও অনাবশ্যকবোধে সমালোচনা করি নাই। তদ্ভিন্ন হয়ত অনেকমহাশয়রচিত অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে, অথবা বিদ্যমান থাকিতেও আমরা অনেকগ্রন্থের সন্ধান পাইনাই। যাহাহউক, মধ্যকালে ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যথাক্রমে সমালোচিত তত্তদ্‌গ্রন্থের বিবরণেই একপ্রকার ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবত—কবিকঙ্কণ—মহাভারত ও কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের ভাষা কিছু একরূপ নহে। উহা যে, ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত, বিশদ ও অধিকসংস্কৃতশব্দগর্ভক হইয়াআসিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতেপারাযায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতেহইবে যে, ঐ সময়ের যে ভাষা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তৎসমুদয়ই পদ্যময়। পদ্য দেখিয়া ভাষার অবস্থা সম্যক্‌রূপে বোঝাযায়না; কারণ যে সকল কথা লোকে কথোপকথনে ব্যবহার করেনা, পদ্যমধ্যে তাদৃশ অনেক কথাও ব্যবহৃত হইয়াথাকে। অতএব ভাষারবিষয়ে বিবেচনাকরিতেহইলে শুদ্ধ পদ্যগ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া গদ্যগ্রন্থের প্রতিও দৃষ্টিপাতকরা কর্ত্তব্য। কিন্তু মধ্যকা-

লের গদ্যগ্রন্থ আমরা একখানিও দেখিতে পাইনাই। শুনিতে পাওয়াযায়, ত্রিপুরার রাজাবলী ও রামরামবসুর প্রণীত প্রতাপাদিত্যচরিত, এই দুইখানি গদ্যগ্রন্থ ঐকালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহার একখানিও দেখিতেপাওয়াগেলনা—অনেক চেষ্টা করাগেল, কোনরূপে সুযোগ হইয়াউঠিলনা। সুতরাং তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলিতেপারাগেলনা। তাহা না পারাযাউক, ইহা বেশ দেখা যাইতেছে যে, মধ্যকালেও গদ্যগ্রন্থ প্রায় হয়ই নাই। ভাষার প্রতি দেশবাসী লোকদিগের যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গদ্যগ্রন্থে লোকের অনুরাগ জন্মে, মধ্যকালে তাহার কিছুই হয় নাই—হইলে ঐ কালের মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ রচনা করিতেন—কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা অভিধানও একালের মধ্যে রচিত হয়নাই। সুতরাং এ অংশে আদ্যকাল ও মধ্যকালের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই।

তবে এই কালের মধ্যে ছন্দের অনেক পারীপাট্য হইয়াছে—কিন্তু সে পারীপাট্যও প্রথমে হয় নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে কিছু হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যকালও ইদানীন্তন কালের যেসন্ধিস্থল—রামপ্রসাদের কাল—তাহাতেই উহার প্রচুরপরিমাণ লক্ষিতহইতেছে। রামপ্রসাদের রচনাতেও প্রাচীনকবিদিগের ন্যায় মিলের দোষ দেখিতেপাওয়াযায়—যথা ময়ি=হই; কি=ঝী; থো=পো ইত্যাদি। এই

মিলদোষজন্যই রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হইলেও ইহাঁকে আমরা মধ্যকালের শেষে এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তনকালের প্রথমে উপবেশিত করিলাম—নচেৎ ইহাঁদিগকে একগৃহে বসাইলেই চলিত। যাহা হউক এই কালে যে সকল নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিরঞ্জনের তোটকটী কেবল সংস্কৃতের অনুকৃতি—উহার প্রতি অৰ্দ্ধ-দ্বাদশঅক্ষরে ঘটিত এবং প্রতিতৃতীয়অক্ষর গুরু। তদ্ভিন্ন আর আর সকল ছন্দই পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র। পয়ারেরই প্রতি চতুর্থবর্ণে মিল ও যতি থাকিলে মালঝাঁপ, কয়েকটী বর্ণ কমাইয়া দিলে একাবলী; ত্রিপদীরই পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুই চরণ না থাকিলে ভঙ্গত্রিপদী প্রভৃতি হইয়াথাকে। ঐ মালঝাঁপপ্রভৃতি নামসকল প্রাচীন নহে; বোধ হয় প্রথমকবিরা রচনাসময়ে ওরূপ নাম জানিতেন না—অক্ষর যতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তাদি করিলে আর এক প্রকার নূতন মিষ্ট ছন্দ হয়, দেখিয়া তাঁহারা ঐ সকল ছন্দের সৃষ্টি করিয়াগিয়াছেন। পরবর্ত্তী লোকেরা ঐ সকলের অর্থানুরূপ নামকরণ ও লক্ষণ স্থির করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৪	ত্রিকোণে	ত্রিকোণ
২	৯	জেষ্ঠা	জ্যেষ্ঠা
৩	৩	আকবর	সায়দ হোসেন
১১	১	লৌলিক	লৌকিক
১৪	১৪	অর্দ্দ	অৰ্দ্ধ
১৭	১৯	বিদ্ধ	বদ্ধ
৩০	৫	বিদ্য	বিদ্যা
৩০	১৭	পঙ্ক॥	পঙ্ক॥ (প, ক, ৩, ৮৬৮)
৯৩	২০	পারিনা; কিন্তু	পারিনা।
১২১	৭	গঙ্গাধর	গদাধর
১৩১	১৩	মাহামার	মহামাঁর
১৩৬	১৮	তদ্রাশ্রয়ে	তদাশ্রয়ে
১৪৬	১১	কৃত্যবিদ্য	কৃতবিদ্য
১৫৪	৮	ব্রহ্মরন্ধ	ব্রহ্মরন্ধ্র

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

দ্বিতীয় ভাগ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইদানীন্তন-কাল।

এইবার আমরা মহাসঙ্কটে পড়িলাম। আদ্য ও মধ্যকালের যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা প্রথমভাগে করা হইয়াছে, তাহার রচয়িতাদিগের কেহই জীবিত নাই—সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ে যাহা প্রশংসা করাহইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা আনন্দিত হননাই, এবং যাহা নিন্দা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তাঁহাদের কোপ জন্মে নাই। সুতরাং তাঁহাদের বিষয়ে যাহা মনে উঠিয়াছে—যাহা ইচ্ছা হইয়াছে—অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাই বলিতে পারাগিয়াছে—আমাদিগের কোনরূপ উক্তির জন্য কাহারও সন্তোষ বা অসন্তোষ হইবে, এরূপভাব একবারও মনে উঠে নাই। কিন্তু এখন্ আর সে যো নাই। ইদানীন্তনকালের যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা করিবার মানস করা গিয়াছে, তাহার রচয়িতাদিগের মধ্যে প্রথম কয়েক জন ভিন্ন অধিকাংশই অদ্যাপি জীবিত আছেন; তাঁহাদিগের অনেকে আবার ধনে, মানে, পদগৌ-

বেে ও ক্ষমতায় দেশের ভূষণস্বরূপ। সুতরাং তাঁহারা সন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইলে ‘কাহারও কিছু এসে যায়না’ এমত নহে। অতএব তাঁহাদের বিষয়ে যাহা মনে আইসে, তাহাই ব্যক্ত করায় শঙ্কা জন্মিতে পারে। যদি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারাযায়, তবেত কোন কথাই নাই। কিন্তু যদিই কোন স্থলে অপ্রশংসার কথা লিখিতে হয়, তবেই বিপদ। অথবা প্রশংসা করিতে পারিলেই যে, কোন কথানাই তাহাও নহে। মনে কর—কাহারও মনে মনে অভিমান আছে যে, তাঁহার গ্রন্থের মত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় হয়নাই—হবে না। আমরা তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা করিলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সেরূপ অভিমানটী বজায় রাখিতে পারিলামনা। ইহাতেও তিনি চটিতে পারেন। যাঁহারা চটিবেন, তাঁহারা যে, আমাদিগকে অজ্ঞ, অবিবেচক, ঈর্ষ্যাসম্পন্ন বা পক্ষপাতী বলিয়া ভাবিবেন না—বা কথাপ্রসঙ্গে লোকের নিকট বলিবেননা—বা হাতে কোন অস্ত্র থাকিলে তদ্দারা প্রকাশ করিবেননা,– তাহা সম্ভব নহে। যাহাহউক, আমরা বিনয়বচনে সকলকে জানাইতেছি যে, অজ্ঞতা বা অবিবেচকতা জন্য যদি কোন গ্রন্থের উপর আমাদের অযথাভাষণ হইয়া পড়ে, তাহা বিজ্ঞ ও বিবেচক মহাশয়দিগের নিকট অবশ্যই মার্জ্জনীয় হইবে—তদ্ব্যতিরেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ঈর্ষ্যা বা পক্ষপাতবশতঃ আমরা কোন গ্রন্থের নিন্দা করিবনা—যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের এই সঙ্কীর্ণমনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে, তাহাই লিখিব এবং সে সময়ে কাহারও রাগদ্বেষের ভয় করিব না। তাহাতেও যদি কোন মহাশয় চটেন, তবে—নাচার।

এস্থলে একথাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আদ্য ও মধ্যকালোৎপন্ন গ্রন্থসকলের সমালোচনাসময়ে তত্তদ্ গ্রন্থের রচয়িতাদিগের জীবনবৃত্ত সংগ্রহে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি এবং সমালোচনার প্রথমেই তাহা নিবিষ্ট করিয়াছি। কারণ ঐ সকল গ্রন্থকারের জীব-

নবৃত্ত সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয়; অথচ তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। কিন্তু ইদানীন্তনকালের গ্রন্থকারদিগের অনেকেই অদ্যাপি জীবিত আছেন, অতএব তাঁহাদের জীবনবৃত্ত লোকের তত দুর্জ্ঞেয় নহে; বিশেষতঃ তাঁহাদের সংখ্যা অনেক অধিক—সুতরাং সকলের জীবনবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশকরা সাধ্যায়ত্ত নহে—হইলেও সকলেরই জীবনবৃত্ত সাধারণের শুশ্রূষণীয় হইবে, তাহাও বোধহয়না। অতএব এপরিচ্ছেদমধ্যে গ্রন্থকারমাত্রেরই সাধারণতঃ সকলের সবিস্তরজীবনবৃত্ত দিতে আমরা সমর্থ হইব না, গ্রন্থকারগণ তজ্জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনাকরিবেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালাগ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সকলগুলিই যদি গ্রন্থের মত গ্রন্থ হইত, তাহাহইলে এই অবস্থাকে ভাষার যারপর নাই সৌভাগ্যের অবস্থা মনেকরা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে—তাদৃশ গুণজ্ঞান থাকুক না থাকুক, যাহা কিছু একটা লিখিয়া ও ছাপাইয়া প্রকাশকরা একপ্রকার অদ্ভুত রোগ দাঁড়াইয়াছে। স্কুলের অনেক দুগ্ধপোষ্য বালকেও গ্রন্থকার হইবার অভিমানে মত্ত হইয়াছে—যে কোনরূপে হউক কোন পুস্তকের টাইটেল্‌পেজের উপর মুদ্রিতনাম বাহির করিতে পারিলেই অনেকে জীবন সার্থক মনে করিতেছে। এইরূপে যে সকল গ্রন্থ বহির্গত হইতেছে, সে সকল গ্রন্থ কিছু সাধারনের পাঠ্য হইবেনা এবং অধিককাল স্থায়ীও হইবেনা—দিনকত পরেই কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ তন্মধ্যে এমতসকল গ্রন্থও আছে, যাহা একবারে নিতান্ত পুতিগন্ধি গলদ্ঘোমময়। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেননা যে, আমরা সে সকলেও হস্তক্ষেপ করিব।

৺ভারতচন্দ্ররায়ের অন্নদামঙ্গলাদি।

তৃতীয়পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রামপ্রসাদসেনের সমকালেই এই মহাকবি প্রাদুর্ভূত হয়েন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভূরশুট পরগণার মধ্যে 'পেঁড়ো' নামক গ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। ইহাঁর পিতার নাম রাজানরেন্দ্রনারায়ণরায়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ। নরেন্দ্রনারায়ণ একজন বিখ্যাত জমীদার ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননীর সহিত কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উক্ত রাণীকর্ত্তৃক একেবারে হৃতসর্ব্বস্ব হয়েন। ভারতচন্দ্র এই সময়ে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া মাতুলালয়ে গমনপূর্ব্বক তথায় সজ্ক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধানাদি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। তৎকালে পারসী অর্থকরী বিদ্যা ছিল; তাহা না পড়িয়া অকেজো সংস্কৃত অধ্যয়নকরায় তাঁহার জ্যেষ্ঠেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি অভিমানবশতঃ পুনর্ব্বার বাটী হইতে পলাইয়া হুগলীর সমীপস্থ দেবানন্দপুরগ্রামে মুন্সীবাবুদিগের বাটীতে অবস্থিতিপূর্ব্বক [illegible]স্যভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

ভারত যে, নিগূঢ় কবিত্বরত্নের আকর, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না। তিনিও এপর্য্যন্ত রীতিমত কোনরূপ রচনাই করেন নাই। একদা ঐ বাবুদিগের বাটীতে সত্যনারায়ণের সির্ণি উপস্থিত হওয়ায় ভারতচন্দ্রই পাঁচালী পড়িবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি পররচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া নিজেই ত্রিপদীচ্ছন্দে এক পাঁচালী রচনাকরিয়া সভামধ্যে পাঠকরিলেন। তাহা শুনিয়া সভাস্থসকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং ভারতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আর একবার তথায় সির্ণিদেওয়ার ব্যাপার উপস্থিত হইলে ভারত পূর্ব্বরচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া চৌপদীছন্দে হিন্দি-

মিশ্রিত অপর এক পাঁচালী রচনাকরিয়া পাঠ করেন। এই উভয় পাঁচালীরই শেষভাগে ভারতের পরিচয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে যথা—

—"দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়াকর মহাশয়, নায়কেরে গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বল, দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত"॥ তথা

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হতকংস, ভূরশূটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সঙ্ক্ষেপে করিতে পুঁতি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রতকথা সাঙ্গপায়, সনে রুদ্র চৌগুণা" ॥ (১১৩৪)

যৎকালে এই পাঁচালী রচিত হয়, তৎকালে ভারতের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক নহে। এরূপ অল্পবয়সে এতাদৃশ মনোহর রচনা করিতে দেখিয়া "উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায়" ন্যায়ে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ভারতচন্দ্র ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ কবি হইবেন।

পারস্যভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া বাটী গমন করিলে পর ভারতচন্দ্রের জ্যেষ্ঠেরা তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণ বোধকরিয়া আপনাদিগের ইজারালওয়া বিষয়ের খাজনা দাখিলাদিকার্য্যের তত্ত্বাবধানকরণার্থ মোক্তারস্বরূপ করিয়া বর্দ্ধমানরাজভবনে প্রেরণ করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের সেই ইজারাসংক্রান্ত বিষয়ের খাজনা দাখিল না হওয়ায় গোলযোগ উঠে এবং সেই গোলযোগে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান-রাজকর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হয়েন। ভদ্রলোকের পক্ষে কারাবাস যে কিরূপ

ক্লেশকর, তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। ভারতচন্দ্র কিছু দিন সেই ক্লেশ সহ্য করিয়া কারাধ্যক্ষের অনুকূলতায় তথাহইতে পলায়ন করেন— এবং রাজার অধিকার যতদূর ছিল, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন নাপিত ভৃত্য সমভিব্যাহারে একেবারে কটকে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয় লয়েন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কিয়ৎকাল পুরুষোত্তমে যাইয়া বাস করেন। তথায় তিনি শ্মশ্রুধারণ গেরুয়াবস্ত্রপরিধানপ্রভৃতি উদাসীনের বেশ পরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবদিগের দলে মিশিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৃন্দাবনযাত্রা করিয়া পথিমধ্যে একদিন খানাকুল কৃষ্ণনগরগ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে তাঁহার শালীপতিভ্রাতার বাটী, ইহা ঐ ভৃত্য অবগত ছিল। সে গোপনে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তাঁহারা অনেকে আসিয়া ভারতকে ধরিলেন, এবং নানারূপ বুঝাইয়া উদাসীনবেশ অপনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে সংসারধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর ভারত শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক পরমানন্দসহকারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন এবং পত্নীকে সেই স্থানেই রাখিয়া পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া ফরাসডাঙ্গার ফরাসীগবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণচৌধুরীর নিকট আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলেন, কিন্তু ফরাসীদের গৃহে কর্ম্মকাজ করিয়াদিলে তাঁহার প্রকৃতগুণের প্রকাশ হইবে না, এই জন্য তাহা না দিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা পরমগুণজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। এত দিনের পর ভারতচন্দ্রের অন্তরায়মেঘ অপগত হইল—এখন তাঁহার সুবিমলপ্রভা দিন দিন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতেলাগিল। গুণজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'গুণাকর' এই উপাধি দিলেন এবং মাসিক ৪০ টাকা বেতন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সভাসদরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এক্ষণে গুণাকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কবিতাদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতেলাগিলেন এবং রাজার অনুমতি অনুসারে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকৃতিরূপে, অন্নদামঙ্গলের রচনা করিলেন এবং তাহারই মধ্যে পরমকৌশলসহকারে বিদ্যা-সুন্দরের ও মানসিংহের উপাখ্যান যোজনাকরিয়াদিলেন। এই গ্রন্থ ১৬৭৪ * শকে সমাপ্ত হয়। তৎপরে তিনি রসমঞ্জরী নামে আর একখানি কাব্যরচনা করেন, এবং "আ আরে বসন্ত" "আ আরে বর্ষা" "আ আরে বাসনা" "আ আরে মামী" "আ আরে ভাগিনা" "বাহ-বারে হাওয়া" "পায় পায় পায়না" "পায় পায় পায়" "ধেড়ে" প্রভৃতি সমস্যাসকল পূরণকরিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা যে, কতই করেন তাহার সঙ্খ্যা নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা হিন্দি ও সংস্কৃতমিশ্রিত "চণ্ডী নাটক" নামে একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে, উহা সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে তিনি মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ নিযুক্ত হয়েন এবং ৪৮ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৬৮২ শকে পরলোকযাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালাসাহিত্যসংসারের যে ক্ষতিটী হইয়াছে, তাহা আজিও—একশত বৎসরের অধিককাল মধ্যেও—কেহই পূরণ করিতে পারিলেন না।

এস্থলে ইহাও লেখা আবশ্যক যে, কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালেই তিনি আপন ইচ্ছা ও রাজার অনুমতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধু-রীর বাটীর সমীপে ফরাসডাঙ্গার পরপারবর্ত্তী মূলাজোড় নামক গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই পরিবারাদি আনয়ন পূর্ব্বক বাস করি-য়াছিলেন। রাজা ঐ গ্রামখানি প্রথমে তাঁহাকে ইজারা দেন ; পরে কোন কারণবশতঃ বর্দ্ধমানরাজের একজন কর্ম্মচারী রামদেবনাগকে উহা

---

* বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

পুনর্ব্বার ইজারা দিতে হইয়াছিল। উক্ত নাগ ভারতচন্দ্র ও অপরাপর লোকের প্রতি অত্যাচার করায় গুণাকর নাগাষ্টক নামে ৮টী সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নিজদুঃখ নিবেদনকরিয়াছিলেন। এই সকল শ্লোকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে, তন্মধ্যে পঞ্চচামর ছন্দে একটী গঙ্গাষ্টক আছে। উহা রহস্যসন্দর্ভের প্রথম পর্ব্বস্থ নবমখণ্ডের ১৩৯ পত্রে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া পারসী হিন্দি শ্লোকও তিনি রচনা করিতেপারিতেন। তাঁহার গ্রন্থমধ্যেও স্থানে স্থানে ইহার নিদর্শন আছে। পূর্ব্বোক্ত মূলাজোড়গ্রামেই ভারতচন্দ্রের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্ররায় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁর সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

অন্নদামঙ্গল—রায়গুণাকরের গ্রন্থের মধ্যে অন্নদামঙ্গলই বৃহৎ ও প্রধান। এই গ্রন্থের তিনটী ভাগ আছে। তন্মধ্যে প্রথমভাগে দেবদেবীর বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা পর্য্যন্ত যাহা যাহা বর্ণিত আছে, তাহা কবিকঙ্কণচণ্ডীর অনুকৃতি। তৎপরে—অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য, কাশীনির্ম্মাণ, ব্যাসদেবের আচরন, তাঁহার অপর কাশীনির্ম্মাণচেষ্টা, ব্যাসের প্রতি অন্নপূর্ণার ছলনা প্রভৃতি বর্ণনসকল কাশীখণ্ডমূলক। অনন্তর বসুন্ধরে অন্নদার শাপ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, নলকূবরে দেবীর শাপ, ভবানন্দ মজুন্দারের জন্মবিবরণ, হরিহোড়কে ত্যাগকরিয়া অন্নপূর্ণার ভবানন্দভবনে গমন ইত্যাদি বিবরণ সকল কবির স্বকপোলকল্পিত। এই ভবানন্দমজুন্দারকে দেবাংশ বলিয়া বর্ণনকরা মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল; কারণ তাঁহার দেবাংশতা প্রথিত হইলে মহারাজের বংশের গৌরব হয়—যেহেতু মহারাজ উক্ত ভবানন্দ মজুন্দারেরই বংশীয় এবং উহাঁর অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

যাহাহউক যদিও এই প্রথম ভাগের অনেক স্থলেই ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের চণ্ডী এবং বোধহয় কোন কোন স্থলে রামেশ্বরের 'শবসঙ্কীর্ত্তন হইতেও অস্থি সঙ্কলনকরিয়া তদুপরি মাংসযোজনা করিয়াছেন—তথাপি ইহাতেও তাঁহার মাসান্য কবিত্ব ও সামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়নাই। উভয় গ্রন্থের সেই সেই স্থল পাঠকরিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভব হইবে। এইগ্রন্থস্থ দক্ষকৃতশিবনিন্দা, শিবের দক্ষালয়ে গমন, দক্ষযজ্ঞনাশ, শিববিবাহের সম্বন্ধ, রতিবিলাপ, নারীগণের কন্দল, শিবনিন্দা, হরগৌরীর কন্দল, শিবের ভিক্ষা প্রভৃতি বর্ণনগুলি যে, কিরূপ সুন্দর ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষকরা-যায়না। ঐ সকল স্থান যখন পাঠকরাযায়, তখনই নূতন বোধহয়। বিশেষতঃ দক্ষযজ্ঞপ্রসঙ্গে ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তূণক ছন্দটী যে, কিরূপ উপযুক্তস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তদ্দারা ঐ স্থলের কিরূপ চমৎকারিতা জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা কালিদাসকৃত রতিবিলাপ পাঠকরিয়াছি কিন্তু তাহাতেও—

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে, না জানি বাড়িল কিবা গুন।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন ॥"
"অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান, আগে যারে পথ দেখাইয়া।
চরণরাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহরে বহিয়া ॥

এরূপ মনোহর ভাব দেখিতে পাই নাই। নারদ হিমালয়ে গমন করিয়া সখীগণের সহিত রমমাণা পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলে, পার্ব্বতী রোষভরে যেরূপে মাতার নিকটে গিয়া যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা কি সাধারণলেখনী হইতে বাহির হইবার বিষয়?। শিবনামাবলী ও হরিনামাবলীর রচনা দুইটী পাঠকের রসনায় যেন নৃত্য করিতে থাকে। গঙ্গা ও ব্যাসের কথোপকথন এবং পরস্পরকৃত পরস্পরনিন্দার প্রসঙ্গে কতই পাণ্ডিত্য, কতই পরিহাসরসিকতা ও সংক্ষেপের মধ্যে মহাভারতের কতই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলা যায়না। হরিহোড়ের বৃত্তান্তে দুঃখিনী পদ্মিনী বর্ণন ও হরিহোড়ের

কাষ্ঠাহরণ বিবরণদ্বারা দারিদ্র্যবর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও কালকেতুব্যাধের নিকটে ভগবতীর ছলে পরিচয় প্রদান আছে সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে ভবানন্দমজুন্দারের গৃহে যাইবার সময়ে ঈশ্বরীপাটুনীর সমীপে অন্নপূর্ণার পরিচয়দান তদপেক্ষা অনেক বিশদ ও অনেক মনোরম হইয়াছে। ফলতঃ রায়-গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনীশক্তি যে, উহার কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয়না। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কোন্ সন্দর্ভ যে, আমরা উদ্ধৃত করিব, তাহা স্থিরকরিতে পারিনা। যাহাহউক নিম্নভাগে দুই তিনটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

অন্নদার মোহিনীরূপ।

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদি-মূলে।
ধরেছে কামের কেশ রোমাবলী ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হাসিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী।
পৃষ্ঠতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
কলঙ্কে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধররঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥

রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখে শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সেরূপ কিরূপ কব আমি।
যেরূপ হেরিয়া কামরিপু হন কামী॥

অন্নদার জরতীবেশে ছলনা।

মায়াকরি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি।
কোটি২ কাণকোটারীর কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া চুপড়ী লড়ী আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুতি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠ দাঁড়া ভূমিতে লোটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুল্‌কান চুল॥

মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥

ঈশ্বরীপাটুনীকে ভগবতীর ছলে পরিচয় দান।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরি! আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয়ভাগের নাম মানসিংহ। বিদ্যাসুন্দর ইহারই অন্তর্গত বৃহৎউপাখ্যান—সুতরাং উহাকেই দ্বিতীয়ভাগরূপে নির্দ্দেশ করাযাইতেপারে। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ, যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার বাসনায় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যশোহরযাত্রাকালে প্রথমে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত ভবানন্দ

মজুন্দার কাননগোঁই পদাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মানসিংহের বর্দ্ধমানগমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যর্থনার্থ নানাউপহারসমেত উক্ত নগরে গমনকরেন। মানসিংহ তথায় কয়েকদিন অবস্থানকরিয়া প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসুন্দরের কথা শুনিতে পাইলেন এবং ভবানন্দমজুন্দারকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক সুরঙ্গাদর্শন করিতে যাইয়া তথায় মজুন্দারের মুখেই বিদ্যাসুন্দরের আদ্যোপান্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। ফলতঃ গুণাকর ভবানন্দমজুন্দারকেই উক্ত উপাখ্যানের বক্তা করিয়াছেন।

এস্থলে বোধহয় অনেকেরই জানিবার ইচ্ছা হয় যে, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল কি না? এবং তথায় যে সুড়ঙ্গের কথা শোনা যায়, তাহা কিরূপ?—ইহার প্রথমপ্রশ্নের উত্তর লেখা অনাবশ্যক। কারণ বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় অলৌকিক কাণ্ড কোথাও কখনও বাস্তবিক ঘটে? কি কেবল কবিদিগের কল্পনাবলেই সঙ্ঘটিত হয়? তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই—বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু যেরূপ শোনাযায়, তাহাতে বোধহয়, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড উজ্জয়িনীনগরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বররুচিকর্ত্তৃক বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদসেনের জীবনবৃত্তে উল্লিখিত সংস্কৃত ‘সুন্দরকাব্য’ রচয়িতাই হউন বা যে কেহই হউন, বোধহয় প্রথমে উহাকে দূরদেশ হইতে আপনদেশ বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপিত করেন; তৎপরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রও দেশের মায়ায় মুগ্ধহইয়া তাহার অন্যথা করিতে পারেননাই। যাহাহউক উক্ত কয়েকখানি গ্রন্থরচনার পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও সুড়ঙ্গের কথা প্রচারিত ছিল, তাহা আমাদের বোধহয়না। এমন কি বোধহয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলরচনার পর হইতেই লোকে ঐ কল্পিতকাণ্ডের ক্রমেক্রমে স্থানসমাবেশ করিয়া দিয়াছে। যাহাহউক তত্রত্য সুরঙ্গার অবস্থা—যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা—নিম্নভাগে লিখিত হইল।

আমরা যৎকালে বৰ্দ্ধমানে ছিলাম, তখন একদিন—১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি—কয়েকজন বন্ধুসহ সুরঙ্গাদর্শনার্থ কৌতুকাকুলিত-চিত্তে বাসাহইতে নির্গত হইলাম এবং ইহাকে উহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর নগরের প্রান্তবর্ত্তী পীরবর্হাম্ নামক একটী স্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে বাঁকা নদীর নিজ উত্তরতীরেই একটী প্রাচীন ইষ্টকময় বাটীর ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে রহিয়াছে ও তদুপরি বন জঙ্গল অনেক হইয়াছে, দেখিতে পাওয়াগেল। ঐ স্থানেই সুড়ঙ্গ আছে, এই কথা তত্রত্য কয়েকজন লোক বলিয়া দিলে আমরা বহুকষ্টে তথায় উঠিলাম, কিন্তু দেখিলাম কোন ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের মধ্যভাগে একটী পীরের আস্তানা আছে। একজন ফকীরের মত লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সির্ণির জন্য পয়সা চাহিল। তাহাকেই সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে ঐ আস্তানারই পার্শ্ববর্ত্তী ভগ্নপ্রাচীরস্থ কুলুঙ্গির মত একটী গর্ত্ত দেখাইয়াদিল—কিন্তু তাহা দেখিয়া আমাদের পরিশ্রম পোষাইল না। পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিল যে, "এই স্থানকেই বিদ্যাপোঁতা কহে; ইহার একক্রোশ পূর্ব্বে 'বীরহাটা' নামক যে স্থান আছে, ঐ খানেই রাজাবীরসিংহের রাজভবন ছিল—এবং ইহার একক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের সমীপে মালিনীপোঁতা আছে, ঐ স্থানে হীরামালিনীর বাটী ছিল; সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তের চিহ্নও তথায় আছে" ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে একথাও কাহার কাহার মুখে শুনিয়াছি যে, মালিনী সুন্দরের নিকট হইতে হাটে যাইবার সময়ে—

"নাগর হে চলিলাম নাগরীর হাটে।"

এই যে, নাগরীহাট বা নাগরীহট্টের উল্লেখ করিয়াছে, উহা এক্ষণকার নাকুড়ডি; এবং ঐ নাকুড়ডির উত্তরমাঠের মধ্যে যে স্থানে 'দুর্লভা' নামে কালী আছেন, ঐ স্থানই উত্তরমশান—অর্থাৎ যেখানে সুন্দ-

রকে কাটিতে লইয়া গিয়াছিল ; সেই স্থান——বলিয়া প্রথিত। যাহা হউক আমরা বিদ্যাপোঁতাদর্শনের পর মালিনীপোঁতাদর্শনার্থ বাঁকা-নদী উত্তরণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম কিন্তু অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলামনা। পরে একজন ইতরজাতীয় প্রাচীন লোক একটী উচ্চ মৃণ্ময় ঢিবি দেখাইয়া তাহাকেই মালিনী-পোঁতা কহিল। সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে একটী পুষ্করিণী দেখাইয়া কহিল যে, "ইহারই ভিতরে সুড়ঙ্গ আছে ; গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুখাইলেও তাহা বাহির হয়না——ঢাকা থাকে। একবার একজন ঐ স্থান খুঁড়িতেগিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া মারা পড়িয়াছিল ; তদবধি আর কেহ উহা খুঁড়িতে সাহসী হয়নাই"—ইত্যাদি——

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ—উহা অবলম্বন করিয়া অনেকানেক যাত্রা হইয়াছে, সুতরাং আপামরসাধারণ কেহই প্রায় উহার বিষয়ে অনবগত নহে। বিশেষতঃ গুণাকর উহাকে এমনই মধুর করিয়াগিয়াছেন যে, একবার পড়িলে কেহই আর ভুলিতে পারে না। ভারতচন্দ্রের ভিন্ন অন্যের রচিত যে, বিদ্যাসুন্দর আছে, তাহা অনেকে অবগতই নহেন; সুতরাং ঐ উপাখ্যানের এতাদৃশ সর্ব্বজনী-নতা হওয়া বিষয়ে ভারতের লিপিনৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই কারণ নহে। আমরাও পূর্ব্বে রামপ্রসাদাদির বিদ্যাসুন্দরের কথা জানিতাম না—ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়াছিলাম এবং সেই রচনা আমাদের হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় একেবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমাননগরের বর্ণন পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিত্তপটে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং যত দিন আমরা বর্দ্ধমান না দেখিয়াছিলাম, তত দিন উহা অবিকৃত ছিল। ঐ মানচিত্রে বর্দ্ধমানকে কি সুখের, কি ঐশ্বর্য্যের, কি বিলাসের ও কি রমণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। রাজপুরীর সৌন্দর্য্য, পরিখার অলঙ্ঘ্যতা, সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদের

আখ্ড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাঁধাঘাট, তথায় বিদ্যা-ধরীসদৃশী বর্দ্ধমানাঙ্গনাদিগের জলানয়নার্থ সবিলাসভাবে আগমন, এ সকলকাণ্ড বর্দ্ধমানে যাইলেই দেখিতেপাওয়াযায়, বলিয়া মনোমধ্যে একপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানদর্শন করিবার পর তথাকার রাজপথের ধূলা লাগিয়া, আমাদের সে মানচিত্রখানি মলিন হইয়াগিয়াছে, সুতরাং এখন তাহাতে সকলবস্তুর তাদৃশ সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়াযায় না।

অনেকে কহিয়াথাকেন যে, বর্দ্ধমানাধিপের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঈর্ষ্যাভাব ছিল। এই জন্য তিনি উক্ত রাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সভাসদ ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান এবং বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজবংশীয়েরাও ঐ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমাননগরের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করিতে দেন নাই। কিন্তু একথা সঙ্গতবলিয়া বোধহয় না। বীরসিংহ নামে বর্দ্ধমানে কোন রাজা ছিলেন কি না? তাহাই সন্দেহস্থল; থাকিলেও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান রাজপরিবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল, এমত বোধহয় না। সুতরাং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে তাহা বর্ত্তমান রাজপরিবারে সংলগ্নহওয়ার কোন কারণ নাই। তদ্ভিন্ন কলঙ্কেরই বা কথা কি? যেরূপ বর্ণনা আছে, যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যাসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; মানবাবস্থাতেও ভগবতী সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহারই উপদেশমতে সুন্দর অলৌকিক সন্ধিখনন করিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন; সুন্দরের বিপৎপাত হইলে কালী স্বয়ং বিদ্যাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক শ্মশানস্থলে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শাপাবসানে দুইজনকে সঙ্গে

করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব বিবেচনা করিতেহইবে যে, এরূপ কন্যা যেকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং এরূপ বর যেকুলে বিবাহ করেন, সেকুল কলঙ্কিত হয়? না পবিত্র, মহোজ্জ্বল, পরমগৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় হয়?—ফলকথা, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানপ্রচারের দ্বারা বর্দ্ধমানের বর্ত্তমানরাজপরিবারের প্রতি কলঙ্কারোপচেষ্টার কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতেহইবে যে, ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানরাজভবনে কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুলক্লেশভোগ করিয়াছিলেন—সেই ক্রোধে, সুন্দরকে দেখিয়া নাগরীগণের স্বস্বপতিনিন্দাকরণাবসরে মুন্সী, বক্সী, পোদ্দার, দপ্তরীপর্য্যন্ত কোন রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীকে গুণাকর ছেড়ে কথা কন নাই। ঐ লেখা তাৎকালিক রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ত্রীগণের চরিত্রের প্রতি কটু-কটাক্ষ ভিন্ন আর কিছুই বোধহয়না।

বিদ্যাসুন্দর আদিরসপ্রধান। ইহার কয়েকস্থলে কতকগুলি অশ্লীল বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য এক্ষণকার বিজ্ঞদিগের রুচিতে নিন্দনীয় হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ছাড়িয়াদিয়া ধরিলে ইহার অপর সমুদয় অংশ আগাগোড়া মধুর ও মনোহর। সুন্দর, মালিনী, বিদ্যা, রাণী, রাজা ও কোটাল প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিত্রগুলি যে, কিরূপ যথোচিতরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করাযায়না। যদিও এই সকল চরিত পূর্ব্বে অপর চিত্রকরেরাও চিত্রিত করিয়াছিলেন, তথাপি ভারতের ন্যায় কেহই রঙ্ ফলাইতে পারেননাই। ইহাঁর রচনার আদ্যোপান্তই যেন মাজাঘষা ও পরিষ্কার করা। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই যেন মধুবৃষ্টি হইবে। পঙ্ক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তমালা। বিশেষতঃ—

"দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥"

"বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥"

"বাপ্‌ধন বাছারে বালাই যাক্ দূর।
দাসীরে বল্লিলে দাসী ও মোর ঠাকুর॥"

" বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥ "
" এস বৈস এয়ো, হৌক মেনে যেও, বল সে কেমন জন। "
" আঁখিবীথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা ছুঁহারে দেখায় ॥ "
" একি লো একি লো, একি কি দেখিলো, এ চাহে উহার পানে ॥ "
" হাসি ঢলেপড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি— "
" যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥"
" হায় বিধি পাকা আম্র দাঁড়কাকে খায়। "
" ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায় ॥ "
" মিছা কথা সেঁচাজল কতক্ষণ রয় ॥ "

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠমাত্র বোধহয় নিতান্ত অসামাজিকের হৃদয়েও একেবারে শঙ্কিত না হইয়াথাকেনা। যাহাহউক আমরা বিদ্যাসুন্দরের অধিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থবাহুল্য করিবনা; কেবল প্রদর্শনার্থ একটী স্থলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম——

গর্ভের সংবাদশ্রবণে বিদ্যার নিকটে রাণীর গমন।

——" শুনি চমকিয়া, চলে শীহরিয়া, মহিষী যেন তড়িৎ ॥
আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে, উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর, দেখি হৈল ডর, রাণীর না সরে বাণী ॥
প্রণমিতে মা রে, বিদ্যা নাহি পারে, লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া, বৈস বৈস বলে মায় ॥
গালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া, অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, কহে ভালে কর হানি ॥
ওলো নিঃশঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনী, পাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায়, আনিলি কাহায়, ডাকিয়া ডাক ডাকিনী ॥
ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে, ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সেবা ॥
না মিলিল দড়ী, নামিলিল কড়ী, কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ, কেমনে একাজ, করিলি খাইয়া মোরে ॥

রাজা মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ, কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি, কি পণ করিলি, প্রমাদ পাড়িলি শেষে ॥
এল কতজন, রাজার নন্দন, বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে, শেষে মিটে গেলি চোরে ॥
শুনি তোর পণ, রাজপুত্রগণ, অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন, হইবে কেমন, বল কি তার উপায় ॥
সন্ন্যাসীটা আছে, ভূপতির কাছে, নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায়, নাদিল তাহায়, তবে কি এপাপ থাকে ॥
আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা, ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণযুত, যোগ্য রাজসুত, হইবে মোর জামাই ॥
রাজার ঘরণী, রাজার জননী, রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ, অপবাদ কত সব ॥
বিদ্যার মা ছলে, যদি কেহ বলে, তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে, কাতি দিব গলে, পৃথিবী বিদার দিস ॥
আলো সখীগণ, তোরা বা কেমন, রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া, চূণকালী দিলি গালে ॥
তোরা ত সঙ্গিনী, এরঙ্গে রঙ্গিণী, এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায়, দানীভাঁড়া যায়, সঙ্গীভাঁড়া যায় কবে ॥
থাক্ থাক্ থাক্, কাটাইব নাক, আগেতে রাজাতে কহি।
মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি ॥ ”

রাজার নিকটে রাণীর গমন।

“ ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, অঞ্চল ধরায় পড়ে, আলুথালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘনডাক, চমকে সকল পুরজন ॥
শয়নগৃহেতে রায়, বৈকালিক নিদ্রাযায়, সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধমনে, নূপুরের ঝনঝনে, উঠে বৈসে বীরসিংহরায় ॥
রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল, কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ, কি কব কহিতে লাজ, কলঙ্কে পূরিল সবদেশ ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে, বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবেসুখ, দেখিবে নাতির মুখ, এড়াইলে ঝীর বিয়া দায় ॥
কি কহিব হায় হায়, জ্বলন্ত আগুনপ্রায়, আইবড় এত বড় মেয়ে।

কেমনে বিবাহ হবে, লোকধর্ম্ম কিসে রবে, দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চমাথা হৈল হেঁট, বিদ্যার হয়েছে পেট, কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব, অহঙ্কারে গেলে ছারেখারে ॥
বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ, বিয়া হৈলে হৈত কতছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা, কদিন সহিবে বালা, কপায় রাখিব কত ঠেলে ॥
সদামত্ত থাক রাগে, কোঁনভার মাহিলাগে, উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
একভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার, আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥”

এখন্ পাঠকগণ বিবেচনাকরিয়া দেখুন, যে, উল্লিখিতরূপ রচনা কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাবসঙ্গতও সময়সমুচিত! ভারত-চন্দ্রের যদি আর কোন রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণীপনার বর্ণনদৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেপারাযাইত। এমন স্বভাবসঙ্গত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা কোন কবির লেখনীহইতে নির্গত হয়নাই! ইঙ্গরেজিতে পোপের ও সংস্কৃতে বাল্মীকির রচনা যেরূপ মধুর, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গলাতে ভারতচন্দ্রের রচনাও সেইরূপ। কিন্তু বলিতে দুঃখও হয়—হাসিও পায় যে, সম্প্রতি ইঙ্গরেজিবিদ্যা-সম্পন্ন একদল নব্যসম্প্রদায় বাঙ্গালাভাষার এরূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন যে, তাঁহারা মিল্টনের অনুকারক অমিত্রাক্ষরছন্দের কবিতালেখক মাই-কেল্ মধুসূদনদত্তকে দেখিয়া এ হেন ভারতচন্দ্রকেও সিংহাসন হইতে অবতরণকরিতে অনুরোধ করিয়াছেন! ধন্য অনুকৃতি! তোমার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এক সময়ে মাথায় টীকি রাখিয়া ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া তারস্বরে বেদপাঠ করিয়াছি—এক সময়ে মোগলাইপাগড়ী মাথায় দিয়া ঢিলা ইজের চাপ্কান পরিয়া এবং লক্কাজুতা পায়দিয়া পারসীর জবান দোরস্ত করিয়াছি এবং আজি আবার টুপি মাথায়, বুটজুতা পায় ও কোট পেণ্টুলুন পরিধানে মাতৃভাষায় কথোপকথনের মধ্যেও ইঙ্গরেজির বারআনা দখলীস্বত্ত্ব সাব্যস্ত করিয়াদিয়াছি—ইঙ্গরেজি ভূত পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছি—এবং ইঙ্গরেজি মিল্টনের

অনুকারক অমিত্রাক্ষরছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধকে বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট-কাব্য বলিতেছি এবং তত্রচয়িতা মাইকেলকে ভারতের সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি!! ভারত! তুমি স্থির থাক। তুমি ও সকল লোকের কথায় ক্ষুব্ধ হইওনা। তোমার সিংহাসনের নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এ পর্য্যন্ত জন্মেনাই,—পরেও জন্মিবে কি না, সন্দেহ স্থল।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়ভাগ প্রকৃত মানসিংহ। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, মানসিংহ বর্দ্ধমানহইতে যশোহরাভিমুখে যাত্রাকরিয়া ভবানন্দ মজুন্দারের বাসস্থল বাগোয়ানে উপস্থিত হইলে অন্নপূর্ণার মায়ায় তাঁহার সৈন্যের উপর তুমুল ঝড় বৃষ্টি হইল। তাহাতে অনেক সৈন্য মারাগেল এবং কয়েকদিন খাদ্যসামগ্রী কিছুই পাওয়াগেলনা। মজুন্দার ইহা শুনিতেপাইয়া অন্নপূর্ণার কৃপায় সপ্তাহকাল সমুদয় সেনার আহারের সমবধান করিলেন এবং অন্নপূর্ণার পূজার ক্রম তাঁহাকেও জানাইলে তিনিও পূজা করিয়া সমুদয় বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে উভয়েই যশোরযাত্রা করিয়া তুমুলসংগ্রামে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিলেম এবং বাদসাহের নিকট উপহার দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পিঞ্জরমধ্যে পূরিয়ালইলেন। অনন্তর মানসিংহ রাজ্যপ্রদান করাইবার আশা দিয়া ভবানন্দকে দিল্লীর রাজসভায় লইয়াগেলেন। বাদসাহ প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ে হৃষ্ট হইয়া পুরস্কারপ্রার্থনা করিবার আদেশ করিলে মানসিংহ, অন্নপূর্ণার কৃপায়ও ভবানন্দের অনুগ্রহে বিপদহইতে রক্ষা হইয়াছে, এই জন্য তাঁহাকে স্বদেশমধ্যে রাজত্ব প্রদানকরিবার নিমিত্ত বাদসাহের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। জাহাঙ্গীর হিন্দুদেবতার ক্ষমতাবর্ণনশ্রবণে কষ্টহইয়া ভূত বলিয়া তাঁহাদের যথোচিত নিন্দা করিলেন। ভবানন্দ দেবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সমুচিত উত্তর প্রদান করিলে বাদসাহ কুপিত হইয়া "তোদের ভূত কোথা দেখা" বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করি-

লেন। দিল্লীতে ভয়ঙ্কর ভূতের উপদ্রব হইল। জাহাঙ্গীর তাহাতে ভীত হইয়া অন্নপূর্ণাদেবীর স্তবাদি করিলে দেবী প্রসন্না হইলেন, ভূতের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল এবং ভবানন্দমজুন্দার রাজত্বের ফরমান পাইয়া স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক পূজাদি করিয়া কিছুদিন সুখে রাজত্ব করিলেন। অনন্তর দেবী তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত শ্রবণকরাইয়া এবং ভবিষ্যতে তাঁহার বংশে যেরূপ যেরূপ হইবে, তাহা কহিয়া চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম্নী দুই পত্নীর সহিত স্বর্গধামে লইয়া গেলেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে জগন্নাথপুরী, বারাণসী, অযোধ্যা ও রামচন্দ্র প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং শেষে সমুদয় অন্নদামঙ্গলকে অষ্টমঙ্গলানামে আটভাগে বিভক্তকরিয়া প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনরুল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাগের উপাখ্যানাংশে বিশেষ কিছু বৈচিত্র্য নাই। পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে, 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজবংশের গৌরবপ্রকাশার্থই স্বকীয়পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দমজুন্দারকে অন্নপূর্ণার বরপুত্ররূপে বর্ণিত করিবার অভিলাষেই এই ভাগ রচনাকরান। কিন্তু কবি ইহাতেও আপনার কবিত্ব যতদূর প্রকাশকরিতেহয়, তাহার ত্রুটি করেননাই। সৈন্যমধ্যে ঝড় বৃষ্টি, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, মানসিংহ-জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের কথোপকথন, দাসু বাসুর খেদ, ভূতের উপদ্রব, বাটী আসিয়া দুই নারী লইয়া ভবানন্দের কৌতুক, সাধী মাধীর ঝগড়া, ইত্যাদি বিবরণ সামান্যকৌশলে, সামান্যপাণ্ডিত্যে ও সামান্যরসিকতা সহকারে বর্ণিত হয়নাই। যাহাহউক উহার মধ্যে অন্নদার মায়াপ্রপঞ্চে যে সকল অদ্ভুতকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি কোন পুরাণ বা তন্ত্র মূলক? কি কেবল ভয় ও বিস্ময়ের প্রাদুর্ভাব করণার্থ অদ্ভুতবর্ণনমাত্র? তাহা স্থিরকরিতে পারাগেলনা। দ্বিতীয়পক্ষই আমাদের মনে লাগিতেছে।

সমুদয় অন্নদামঙ্গলের মধ্যে মিত্রাক্ষরতার দোষ আমাদের দৃষ্টি-

গোচর হইলনা। তবে যতিভঙ্গের দোষ স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্তু তাহা সামান্য। কেহ কেহ কহেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সভাসদ-গণদ্বারা অন্নদামঙ্গলকে বিলক্ষণরূপে বিশোধিত করাইয়াছিলেন, সেই জন্যই উহাতে দোষের ভাগ প্রায় লক্ষিত হয়না। সে কথাও সঙ্গত বোধহয়,—কিন্তু হউক তাহাতেও কবির কবিত্বের অল্পতা হয়না। যাহাহউক ভারতের প্রায় কোন রচনাই অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ-হয়না, কিন্তু বিদ্যাসুন্দরমধ্যে রাধা ও কৃষ্ণবিষয়ক ধুয়াগুলি যে, কেন লিখিলেন, তাহা বুঝিতে পারাযায়না—সেগুলি আমাদের রুচিতে অপ্রাসঙ্গিক বোধহইল।

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে ভঙ্গত্রিপদী, লঘুভঙ্গত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী, মালঝাঁপ, একাবলী, ললিত, ভঙ্গপয়ার, দিগ-ক্ষরা, তূণক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন ছন্দ আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটী সংস্কৃতমূলক। এই সংস্কৃতমূলক ছন্দে কয়েক স্থলে গুরুলঘুব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে।

রায়গুণাকরের অপরগ্রন্থের নাম রসমঞ্জরী। এখানি সংস্কৃতের অনুবাদ। সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণাদি অলঙ্কারগ্রন্থে নায়িকা ও নায়ক-দিগের যে সকল লক্ষণ, ভেদ ও উদাহরণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং নায়কসহায় পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষকের যে সকল স্বরূপ-নিরূপণাদি বর্ণিত আছে—শৃঙ্গাররসের যেরূপ লক্ষণ ও প্রকারভেদ কথিতহইয়াছে—আলম্বন, উদ্দীপন ও সাত্বিকভাবের যেপ্রকার লক্ষ-ণাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয় বাঙ্গালীছন্দোবন্ধে ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের রতিমঞ্জরীতে পদ্মিনীপ্রভৃতি চারি জাতীয় স্ত্রীর ও শশকাদি চারিজাতীয় পুরুষের যেরূপ স্বরূপাদি নিরূপিত আছে, তাহাও ইহাতে অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। এ

গ্রন্থ যে, অবশ্যই অশ্লীল হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গ্রন্থের ভাষামাধুর্য্য ও ছন্দের লালিত্যবিষয়ে ভারতের নিকট হইতে যেরূপ আশা করিতে পারাযায়, তাহার অন্যথা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

স্বীয়া নায়িকা।

নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু, অন্যজনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা, অন্যদিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয়সখী বিনা কভু, অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পায় না॥

আমাদের এ প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব ইহার আর বাহুল্য না করিয়া ভারতচন্দ্রের বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও হিন্দিতে অপর যে-সকল রচনা আছে, দিঙ্মাত্র উদাহরণস্বরূপ তাহাদের এক একটী উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম।

সমস্যা—"বাহবারে হাওয়া"

পূরণ———চন্দনের দণ্ডধোরে, ফণি ফণা ছত্র কোরে,
মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া।
রসন্ত সামন্ত সঙ্গে, শৈত্যগন্ধ মান্দ্য অঙ্গে,
কাবেরী ভরিয়া রঙ্গে, হিমালয়ে ধাওয়া॥
বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে, সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে,
যোগি-যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কামগুণ গাওয়া।
মর্ম্মীরে প্রকাশিয়ে, গর্ম্মীরে বিনাশিয়ে,
শীতল করিলি হিয়ে, বাহবারে হাওয়া॥

নাগাষ্টকের একটী।

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তত্ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

চণ্ডীনাটকে।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাসানিলচলদচলপ্রান্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছঘাতোচ্ছলদুদধিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্যো
ঘর ঘর্ ঘর্ ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥

ঐ

শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ, ছোড় দে উপাস রোগ,
মানহোঁ আনন্দভোগ, ভৈঁষরাজ যোগমে।
আগ্‌মে লাগাও ঘীউ, কাহে কো জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পীউ, ভোগ এহি লোগ মে।
আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থনার (?) আবজান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগ মে॥

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

অন্নদামঙ্গলের অব্যবহিত পরেই কোন ভাল বাঙ্গালাগ্রন্থ রচিত হইতে দেখাযাইতেছে না। উপরিউল্লিখিত পুস্তক অর্থাৎ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীই বোধহয়, অন্নদামঙ্গলের ঠিক পরেই রচিত। এ গ্রন্থ তত উৎকৃষ্টকবিত্বশক্তিসম্পন্ন নহে—কিন্তু ইহা প্রাচীন সম্প্রদা-

য়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ, এবং মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামরমন্দিরাসহযোগে সঙ্গীত হইয়াথাকে, এই জন্য ইহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক হইতেছে। কৃষ্ণনগরজিলার অন্তর্গত উলাগ্রামনিবাসী ৺দুর্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনাকরেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপে নিজপরিচয় দিয়াছেন—

"নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি, গোষ্ঠীপতি-পতি যারে বলে।
ভাঁর অধিকারে ধাম, দেবীপুত্র আত্মারাম, মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দহ কুলে সার, বশিষ্ঠ তুলনা যাঁর, জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর, শিব শিবা অবতার, ব্যবহারে হেন অনুমানি॥
তাঁহার তনয় দীন, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ, দয়া দারা হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাষাগান রচিবারে, স্বপন কহিলা ভগবতী॥
কোটিচন্দ্র আভা যেন, জাহ্নবীর রূপ হেন, ব্রাহ্মণবালিকা বেশধরি।
নানা আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়, বিচিত্র বসনখানি পরি॥
কহেন করুণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই, ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে তবে, বাঞ্ছা যা করিবে দিব তাই॥
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী, প্রভাতে উঠিয়া অতি, ভক্তিভাবে পতিরে কহিলা।
নিবাস উলায় যার, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার, কথা শুনি ভাবিতে লাগিলা॥"

দুর্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায়ের প্রৌঢ়বয়স্ক প্রপৌত্র শ্রীযুত চন্দ্রমণি মুখোপাধ্যায় অদ্যাপি উলায় বাস করেন। প্রচলিত হিসাব ধরিয়া তাঁহাদের ৪পুরুষের সময় মোটামোটি গণনাকরিলে উক্ত পুস্তকের বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ বৎসর হয়।

সূর্য্যবংশীয়রাজা ভগীরথ, তপস্যাদ্বারা প্রসাদিত করিয়া স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নপূর্ব্বক কপিলশাপদগ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করেন, ইহাই গ্রন্থের মূল বিবরণ। তবে অনুষঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়েরও বর্ণন আছে। গ্রন্থকার কবিকঙ্কণচণ্ডীর অনুকরণে গঙ্গার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম নগরাদির বর্ণনকরিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে চাকদহের বর্ণনপ্রসঙ্গে বঙ্গদেশবাসীদিগের প্রতি

অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন। এতাবতা দেখাযাইতেছে,—বাঙ্গাল-দিগের সহিত এপ্রদেশীয়লোকের বিসদৃশভাব নূতন নহে; উহা কবি-কঙ্কণের সময়ে ছিল, দুর্গাপ্রসাদের সময়ে ছিল, এবং এখনও আছে। যাহাহউক এই গ্রন্থের ভাষা তত সুশ্রব্য এবং ছন্দও তত পরিশুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়াযায়। প্রদর্শনার্থ একটী স্থল উদ্ধৃত হইল—

গঙ্গার ষষ্ঠীপূজায় নারীগণের আগমন।

"প্রেমরসে অবশেষে রামাগণ যত।
রাণীপুরে বসি বেশ করে নানা মত॥
চাঁচর চিকুরজাল চিরুনে আঁচড়ি।
বিনাইয়া বান্ধে খোঁপা দিয়া কেশাদড়ি॥
খোঁপায় সোণার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে।
কেহ বা পরিল সিঁথি মতি তার কোলে॥
কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয়।
মণিময় টীকা যেন ভানুর উদয়॥
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি।
কামের সর্ব্বস্ব ধন লয়েছে কামিনী॥
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখী।
দ্বন্দ্ব করে নাসা তিল ফুলমধ্যে রাখি॥
ঢেঁড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল।
কেহ পরে হীরার কমল নাহি তুল॥
নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুনী ভালে।
লবঙ্গবেসরে কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে।
দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দকলিকার মত কারো দন্তপাঁতি।
দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্ত ভাতি॥
মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত-মধ্যে কালরেখা।
মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥

মুখশোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি।
সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনুরী সোণার।
মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে।
সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়ৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে।
পরণে বান্ধান লোহা সকলের হাতে॥
পাতামল পাশুলি আনট্ বিছা পায়।
গুজরি পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥
আনন্দে বসিলা যত রসিকা কামিনী।
সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি॥"

উপরিউদ্ধৃত সন্দর্ভটী দর্শনকরিয়া বুঝাযাইতেছে যে, পূর্ব্বে ঝাঁপা, চাঁপি, লবঙ্গবেসর, পাতামল, পাশুলি, আনট্, কঙ্কণ প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কার আমাদের কামিনীগণ পরিধানকরিতেন, এক্ষণে তাহাদের আর প্রায় প্রচলন নাই—তবে নিতান্তমফস্সলস্থানে কখনও ২।১টা ঐরূপ অলঙ্কার দেখিতেপাওয়াযায়। এস্থলে আর একটী বিষয়ে দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক হইতেছে—কবি লিখিয়াছেন, "মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্তমধ্যে কাল রেখা"। এতদ্দর্শনে স্থির হইতেছে যে, ঐ সময়েও স্ত্রীলোকদিগের দাঁতে মিশি দিবার রীতি ছিল। তৎপূর্ব্বে রামপ্রসাদও বিদ্যার রূপবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "দন্তাবলী শিশুঅলি কুন্দকলি মাঝে"। এতাবতা রামপ্রসাদের সময়েও মিশির ব্যবহার অনুমিত হইতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোন কবি ওরূপ বর্ণন করেননাই। এমন কি, ভারতচন্দ্রও দন্তবর্ণনস্থলে "কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার" এইরূপ লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কোন সংস্কৃত কবি দন্তকে কুন্দকুসুমসদৃশ ভিন্ন পক্কজম্বূফলতুল্য বলিয়া বর্ণনকরেননাই। অতএব ইহা স্থির বুঝাযাইতেছে যে, মিশি দিয়া দাঁত কালকরা আমাদের এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতি নহে। চীনবাসিনীরা দন্ত কৃষ্ণবর্ণ করিয়া-

থাকেন, বোধহয় তাঁহাদের নিকটহইতে মুসলমানীরা এবং মুসলমানীদের নিকটহইতে আমাদের মনোমোহিনীরা ঐ ব্যবহার গ্রহণকরিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, এই ব্যবহার এক্ষণে উঠিয়াযাইতেছে—কলিকাতার তন্তুবায় ও সুবর্ণবনিক্ সুন্দরীরা উহা একেবারে ত্যাগকরিয়াছেন,—অন্যান্য মহলেও উহার প্রচলন অতি অল্পই আছে এবং পল্লীগ্রামেও ক্রমে ক্রমে কলিকাতার তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছে। যাহাহউক নিরপেক্ষভাবে বলিতেগেলে ইহা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, ওষ্ঠ অধর ও দন্ত এ সমুদয়কে বার্ণিষকরা কাল করিতে না দিয়া যদি কেবল দন্তের মধ্যস্থরেখাগুলিতে 'মিশির ছোপ্‌দিতে দেওয়াযায়, তাহাতে মুখখানি বড় মন্দদেখায়না। পাঠকগণ! নিজ নিজ অন্তঃপুরে ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে পয়ার ও ত্রিপদীচ্ছন্দই প্রায় সমুদায়, তোটক বা অন্যবিধ ছন্দ দুই একটী যাহা আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে।

গীত ও কবিতা।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত ভাল বাঙ্গালাগ্রন্থ অধিক হইয়াছিল কি না, তাহা বলাযায়না; কিন্তু দেখাযাইতেছে যে, ১৭০০ শকের কিছু পূর্ব্ব হইতে ১৭৫০—৫৫ শক [১৮২৮—১৮৩৩ খৃঃঅ] পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকানেক মহাত্মা নানাবিষয়ের নানাবিধ গীত রচনাকরিয়াছিলেন। সেই সকল বিচিত্রপদাবলীসমন্বিত চমৎকারজনকভাবসম্পন্ন গীতদ্বারাও বাঙ্গালাভাষার কম পুষ্টিসাধন হয়নাই। ঐ সকল গীত এক্ষণে সমগ্ররূপে কোথাও পাওয়াযায়না, কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মহাশয় বহুপরিশ্রমস্বীকারপূর্ব্বক ঐ লুপ্তপ্রায় গীতের অনেকগুলি সঙ্গ্রহকরিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেই সেগুলি আবার জীবনলাভ করিয়াছে।

ঐ সকল গীতরচকদিগের মধ্যে প্রাচীনতা ও গুণগৌরব উভয়েই ৺ নিধিরামগুপ্ত সর্ব্বাগ্রে উল্লেখের যোগ্য। ইনি ১৬৬৩ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৫৬ শক [১৮৩৪ খৃঃঅঃ] পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৯৭ বৎসর জীবিত ছিলেন—সুতরাং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে ইহাঁর বয়স ১৯ বৎসর ছিল। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী 'চাঁপ্তা' নামক গ্রামই ইহাঁর প্রকৃত বাসস্থান; পরে ইনি কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারটুলি নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানির অধীনে ইনি কর্ম্মকার্য্য করিতেন। আদিরসঘটিত গীতরচনায় ইহাঁর অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইহাঁর গীতসকল 'নিধুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ। আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অন্যরূপ গীত অল্প আছে।

নিধুবাবুভিন্ন অপর গীতরচকদিগের মধ্যে রামবসু, হরুঠাকুর, রাসুনৃসিংহ, নিত্যানন্দবৈরাগী প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা "কবিওয়ালা' নামে বিখ্যাত। বোধহয় 'কবি' নামক গীতপ্রণালী ইহাঁদিগের হইতেই প্রথমসৃষ্ট না হউক গৌরবাস্পদ হইয়াছিল। কবির গানে দুই দল থাকে—এক দল কোন গান গাইয়া নিবৃত্ত হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তররূপ গান বাঁধিয়া গাইতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল উত্তরপ্রত্যুত্তর গীত শ্রবণকরিয়া সভাসদেরা কাহার জয় কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসাকরিয়া দেন। ইহাঁদের প্রতিদলেই এক জন বা দুই জন করিয়া গীতরচক থাকেন; রামবসু হরুঠাকুর প্রভৃতি ঐরূপ গীতরচক ছিলেন। গীতরচকেরা কেহই বিদ্যাবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেননা; কিন্তু আসরে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্তরূপ প্রত্যুত্তরগীতরচনা করিবার অলৌকিকশক্তি থাকায় ইহাঁদিগকে সকলেই যথেষ্ট সমাদরকরিত। বিশেষতঃ তাদৃশ স্বল্পসময়ের মধ্যে রচিত গীতেও অসাধারণ কৌশল ও পাণ্ডিত্যপ্রকাশ থাকিত, এজন্য তাৎকালিক বিজ্ঞলোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়েরা কবির গান শুনিতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। যা-

ত্রার গানপ্রণালীও তৎকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকেরা কবি শুনিতে পাইলে কেহ যাত্রার নিকট ঘেঁসিতেননা। কবিতে লোকের ঐরূপ অনুরাগ হওয়ায়, উহার পরবর্ত্তী সময়েও পরাণদাস, উদয়-দাস, নীলুপাটুনি, রামপ্রসাদ, ভোলাময়রা, চিন্তাময়রা, আণ্টুনী সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন কবিওয়ালা বিশেষগৌরবসহকারেই কাল-যাপন করিয়াগিয়াছেন। এখনও কবির গানের প্রথা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহাতে লোকের সেরূপ অনুরাগও নাই সুতরাং সেরূপ ভাল গীতরচকও আর জন্মেনা। মধ্যে কবির গানের অনুকরণেই কলি-কাতার ধনিসন্তানেরা 'হাফ্ আক্ড়াই' নামক গানপ্রণালীর আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও অপ্রচলন হইয়া আসিতেছে।

রামবসু—কলিকাতার পরপারবর্ত্তী শালিকাগ্রাম ইহাঁর জন্মস্থান। ইনি ১৭০৯ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৫১ শকে [১৮২৯ খৃঃ অঃ] পরলোকগমন করেন। ইহাঁর রচিত গীতের প্রতি প্রাচীন লোক-দিগের বড়ই অনুরাগ দেখিতেপাওয়াযায়। অপরাপর গীত অপেক্ষা ইহাঁর বিরহবর্ণনা অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগনিত। আমরা শুনিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞব্যক্তি রামবসুর 'বিরহ' শুনিয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমার টাকা থাকিত, রামবসুকে লাখ্ টাকা দিতাম!"।

হরুঠাকুর—ইনি ১৬৬১শকে কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী সিমুলিয়া নামক স্থানে জন্মলাভ করিয়া ১৭৩৬ শকে [১৮১৪ খৃঃঅ] সংসারত্যাগ করেন। ইহাঁর প্রকৃতনাম হরেকৃষ্ণদীর্ঘাড়ী। ইনি রামবসুঅপেক্ষা বয়সে প্রাচীন ছিলেন। প্রথমে ইহাঁর পেসাদারী দল ছিলনা—সক্ করিয়া কবির দলে মিশিয়া গান গাইতেন। একদা রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার গানে মুগ্ধহইয়া পারিতোষিকস্বরূপ একজোড়া শাল দেন। হরুঠাকুর শালপুরস্কারে অপমানবোধ করিয়া ঢুলির মাথায় তাহা নিক্ষেপ করেন। ইহাতে রাজা প্রথমে কুপিত হন, পরে তাঁহার পরিচয় পা-ইয়া পরম সমাদর করেন। অনন্তর রাজা নবকৃষ্ণের প্ররোচনাতেই হরু-

ঠাকুর পেসাদারীদল করিয়াছিলেন, এবং নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগকরিয়াছিলেন। হরুঠাকুরের গান অনেকের মতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কবিওয়ালাদলের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবসুর মত অপর কেহই তাদৃশ প্রথিতনামা নহেন, অতএব তাঁহাদের বিষয় লিখিয়া গ্রন্থবাহুল্য না করিয়া পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ উহাঁদের কয়েক জনের রচিত কয়েকটী গীত নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপন করাগেল।

"নয়ননীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্যবারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনা তার সকলই বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল॥" (নিধুবাধু)

সখীসংবাদ।—মহড়া।

"ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী, বধিলে।
বলনা কি বাদ সাধিলে॥—
নবীনো পিরীতো, না হইতে নাথো, অঙ্কুরে আঘাতো, করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো, কে আনিল রথো, গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে, বুঝি মথুরাতে, চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুন হে মাধবো, তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥"
(হরুঠাকুর)

বিরহ।—মহড়া।

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন্ যায়গো সে, তারে বলি বলি বলা হলো না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে; নিলজ্জা রমণী বলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে, নারীজনম যেন করেনা॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথো প্রবাসে গেলো।
যখন্ হাসি হাসি সে আসি বলে,—সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে॥
তারে পারি কি ছেড়েদিতে, মন চায় ধরিতে, লজ্জাবলে ছি ছি ধরোনা॥"

(রামবসু)

ইঙ্গরেজদিগের কৃত বাঙ্গালার উন্নতি।

পূর্ব্বোল্লিখিত কবিওয়ালাদিগের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেও ভারতবর্ষাগত কয়েকজন ইঙ্গরেজমহোদয়দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা যদিও ১৬৮৭ শকে [১৭৬৫ খৃঃ অঃ] বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ১৬৯৪ শকের [১৭৭২ খৃঃ অঃ] পূর্ব্বে তাঁহারা রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণকরেন নাই। উক্ত অব্দে তাঁহারা ঐ ভার গ্রহণ করিলে এতদ্দেশীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষাকরা ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের আবশ্যক হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে অসাধারণ-বুদ্ধি-শক্তি-সম্পন্ন হালহেড্ সাহেব সিবিলি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমপূর্ব্বক বাঙ্গালা পাঠকরিয়াছিলেন, এবং বোধহয় ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খৃঃ অঃ] তিনি বাঙ্গালাভাষার এক ব্যাকরণ প্রকাশকরেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র ছিলনা; বিশেষতঃ বাঙ্গালার ছাপা অক্ষর তৎপূর্ব্বে সৃষ্ট হয়নাই। চিরস্মরণীয় চার্লস

উইল্কিন্স্ নামা এক সাহেব ঐ সময়ে এদেশে অবস্থিত ছিলেন। তিনি প্রগাঢ়পরিশ্রমসহকারে সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশের নানাভাষা অধ্যয়নকরিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও উৎসাহশীল ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে স্বহস্তে ক্ষুদিয়া ও ঢালিয়া একশাট বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড্ সাহেবের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, মুদ্রাযন্ত্রদ্বারা এক্ষণে ভাষার যে, এতদূর উন্নতি হইয়াছে, উল্লিখিত মহাত্মা উইল্কিন্স্ সাহেবই তাহার আদিকারণ।

১৭১৫ শকে [১৭৯৩ খৃঃ অঃ] লর্ডকর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর যে সকল আইন সঙ্গৃহীত করেন, ফরষ্টর সাহেব সেই সকল আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদকরিয়াছিলেন। এই সাহেব তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন। ইহার কিয়ৎকালপরে ইনিই বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। সে অভিধান এখন আর প্রায় দেখিতেপাওয়াযায়না।

১৭২১ শকে [১৭৯৯ খৃঃ অঃ] মার্শমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি একদল পাদরী সাহেব শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থান করেন। পাদরী কেরি সাহেব ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হয়েন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকরা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালাপদ্যরচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদরী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালাগদ্যরচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে। ঐ সকল সাহেবেরা শ্রীরামপুরে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনকরিয়া দেবনাগর বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নানাবিধ অক্ষর প্রস্তুত করাইলেন, এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি নানাভাষায় বাইবেল অনু-

বাদিতকরিয়া ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসীরামায়ণ, কাশীদাসীমহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ সকলও উহাতে মুদ্রিত হইতেলাগিল। ঐ সকল পাদরীমহোদয়েরা ঐ সময়ে কয়েকটী বাঙ্গালাস্কুলও স্থাপনকরিয়াছিলেন। তাহারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তকসকল ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভহওয়ায় ঐ নগর অদ্যাপি ছাপা-অক্ষর নির্ম্মাণবিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিতেছে।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখকরিতেছি, ঐ সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত হালহেড, উইল্কিন্স, ফরষ্টার, কেরি, মার্সমান এবং কোল্‌ব্রুক, সর্ উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইঙ্গরেজমহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষাসকলের অনুশীলনে ও উন্নতিবিধানে সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। সুতরাং দেশীয়ভাষার উন্নতিপ্রার্থীদিগের পক্ষে উক্ত মহোদয়দিগের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের এতদ্দেশীয়ভাষাশিক্ষার জন্য ১৭২২ শকে [১৮০০ খৃঃঅ] কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়মকালেজ' নামক যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, উক্ত সাহেবদিগের কেহ কেহ তাহাতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালাপুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কেরি সাহেব ঐ স্থানে থাকিয়াই বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজিতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ব্যাকরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু অভিধান এখনও অনেকস্থলে দেখিতেপাওয়া যায়। ঐ অভিধানরচনায় উক্ত সাহেবের সামান্য বিদ্যা, সামান্য যত্ন ও সামান্য অধ্যবসায় প্রদর্শিত হয়নাই। মার্সমান সাহেব উহাকেই সঙ্ক্ষিপ্তকরিয়া অভিধান প্রস্তুতকরিয়াছেন। সাহেবভিন্ন কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ কালেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি পুস্তক রচনা-করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামরামবসু অতি কদর্য্য গদ্যে 'প্রতাপাদিত্য-

রচিত' নামে এক পুস্তক লেখেন এবং পণ্ডিতবর ৺মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কার 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনাকরেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা।

এই পুস্তকের রচয়িতা মৃত্যুঞ্জয়তর্কালঙ্কারের জন্মভূমি উৎকলদেশ। ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায় ইনি প্রথমে ফোর্ট-উইলিয়ম্ কালেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হয়েন, তৎপরে কিয়ৎকালের জন্য তত্রত্য সদরদেওয়ানি আদালতের জজপণ্ডিতও হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকা উক্ত কালেজের ছাত্রদিগের নিমিত্তই রচিত হয়। উহা ১৭৫৫ শকে [১৮৩৩ খৃঃঅ] প্রথমমুদ্রিত হয়। তৎ-কালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেননা।

প্রবোধচন্দ্রিকা আদ্যোপান্ত সমুদয়ই গদ্যে লিখিত। ইহা বড় ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। 'স্তবক' নামে ইহার ৪টী ভাগ আছে—প্রতিভাগের আবার 'কুসুম' নামে অনেকগুলি অবান্তর অংশ আছে। গ্রন্থের প্রথমেই ভাষার প্রশংসা। পরে বিক্রমাদিত্যতনয় বৈজপালরাজা শ্রীধরাধরনামক স্বীয় পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিলাষে তৎ-সমক্ষে বিদ্যার অনেকরূপ গুণানুবাদ করিয়াছেন; তৎপরে আচার্য্য-প্রভাকরের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রভা-কর রাজপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বর্ণবিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাক-রণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনেক বিষয়ের উপদেশ দিয়া-ছেন এবং তৎপরে হিতোপদেশদানচ্ছলে লৌকিক শাস্ত্রীয় নানা-কথাসমেত নানারূপ বিষয়ের নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে "এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতেপারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন বলাযাইতেপারে"।

একথা অযথার্থ নহে। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরেকে এ গ্রন্থের সমুদয়ভাগ কেহই বোধহয় বুঝিতেপারেন না। এখানি সম্যক্ বুঝিতেপারিলে যে, অনেকবিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার ইহাতে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার ছন্দ স্মৃতি ন্যায় সাঙ্খ্য জ্যোতিষ রাজনীতিপ্রভৃতি শাস্ত্রের কত কথাই যে, মধ্যে মধ্যে উল্লেখকরিয়াছেন তাহার সঙ্খ্যা নাই। তদ্ভিন্ন উপাখ্যান-কথনাবসরে বনিক্ কৃষক গোপ সূত্রধর রজক চর্ম্মকার প্রভৃতি নানা ব্যবসায়িক স্ত্রী পুরুষ সাধারণের তত্তদ্ব্যবসায়সম্পৃক্ত চলিতভাষাসকল এত প্রয়োগকরিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এত প্রহেলিকা ও জনপ্রবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে, তৎপাঠে ভিন্নজাতীয় লোকদিগের বাঙ্গালার অনেক বিষয়জ্ঞতালাভ হইতেপারে। বোধহয় এই জন্যই বাঙ্গালাপরীক্ষাপ্রদানার্থী সাহেবদিগের নিমিত্ত অদ্যাপি ঐ গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

এ সকল গুণ থাকিলেও প্রবোধচন্দ্রিকা কোনরূপে উৎকৃষ্টগ্রন্থমধ্যে গণ্য হইতেপারেনা। এই গ্রন্থে উপদেশজনক ভূরি ভূরি কথার সমাবেশ আছে, সত্যবটে কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অভাবে সে সকল সুশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ হয় নাই। কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া থালা ঘটী বাটী বস্ত্র পুস্তক পেড়া বাক্স, স্বর্ণ রৌপ্য মনি মুক্তা প্রবাল, লেপ কাঁথা ছেঁড়ামাদুর প্রভৃতি বস্তুসকল একত্র বিশৃঙ্খল ও উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থাপিত দেখিলে নয়নের যেরূপ অপ্রীতি জন্মে, প্রবোধচন্দ্রিকাপাঠেও সেইরূপ অপ্রীতি উপস্থিত হয়;—ঐ সকল বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে যথাযথস্থানে সজ্জীকৃত দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, ইহাতে সে আহ্লাদ জন্মে না। তদ্ভিন্ন ইহার ভাষাও নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অত্যন্ত নীরস। কোন স্থল দীর্ঘদীর্ঘসমাসসমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দদ্বারা গ্রথিত, কোন স্থল বা একান্ত অপভ্রংশ-পদদ্বারা বিরচিত। কোন কোনস্থানের বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতা

জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠেনা। বাঙ্গালাপরীক্ষাপ্রদানার্থী সাহেব মহোদয়েরা সেই সকল স্থলে যে, কিরূপে দন্তস্ফুট করেন, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। কিন্তু এস্থলে একথাও অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, ভাষার এরূপ অপ্রাঞ্জলতাজন্য গ্রন্থকার অধিকদূষণীয় হইতে পারেন না, কারণ তিনি যে সময়ের লোক এবং যেরূপে শিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে উহা অপেক্ষা প্রাঞ্জল তর ভাষা বহির্গত হইবে, এরূপ আশা করা একপ্রকার অসঙ্গত। আজিও সংস্কৃতশাস্ত্রে পরমপ্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে একপাত বাঙ্গালা লিখিতেদিলে তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন জটিল ও দুর্ব্বোধ রচনাতেই পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে, একসময়ে কৃষ্ণনগররাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণকরিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—"এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে!—এ যে অনায়াসে বোঝাযায়!!"

৺রামমোহনরায়ের কৃত পুস্তকসকল।

বাঙ্গালাভাষার উন্নতিচিকীর্ষু উল্লিখিত ইঙ্গরেজমহোদয়দিগের সমকালেই মহাত্মা রামমোহনরায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাঁদ্বারা বাঙ্গালাভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছে। ১৬৯৬শকে [১৭৭৪ খৃঃ অ] হুগলীজিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী খানাকুলকৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগরনামকগ্রামে ৺রামকান্তরায়ের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। রামমোহন শৈশবকালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি

পাটনানগরীতে গমনপূর্ব্বক পারসী ও আরবী অধ্যয়নকরেন। এই ভিন্নদেশীয়ভাষার অনুশীলনকালেই হিন্দুদিগের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। তৎপরে তিনি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সংস্কৃতভাষা শিক্ষাকরিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভকরেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলনদ্বারা তাঁহার প্রথমোদ্বুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতি বিদ্বেষভাব বিচ্ছিন্ন নাহইয়া বরং দৃঢ়বদ্ধ হইয়াউঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মনহইতেঅপনীতহয়, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশমধ্যে প্রচারিতহয়, তদর্থ যত্নবান হইলেন এবং তদুপায়স্বরূপ ১৬বর্ষ বয়ঃক্রমসময়েই "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গালাগ্রন্থ রচনা[illegible]
এই গ্রন্থদর্শনে তাঁহার পিতা বড়ই বিরক্ত ও কুপিত [illegible]
রামমোহন দুঃখিত হইয়া পিতৃভবন পরিত্যাগ[illegible]
স্থানের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর অবগতি
করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তম
তিব্বৎদেশে গিয়া ৩ বৎসরকাল
র্ব্বার বাটী আসিয়া শাস্ত্রানু[illegible]
সতত উদ্যত রহিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকা[illegible]
ছিলেন এবং ক্রমাগত ৬ [illegible]
ক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলে[illegible]
কগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ
অধ্যবসায়সহকারে [illegible]
ফরাসী প্রভৃতি সমুদ
ছিলেন। তাঁহ[illegible]
নিকট প্রথমে [illegible]

জনরব এই যে, ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০,০০০ টাকা আ-
য়ের এক জমীদারী ক্রয়করিতে পারিয়াছিলেন! রঙ্গপুর ভিন্ন ভাগল-
পুর এবং রামগড়েও তিনি কয়েক বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। অনন্তর
১৭৩৬ শকে [১৮১৪ খৃঃ অঃ] কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই
সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থান-
কালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারদ্বারা কুসংস্কা-
রাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্টপথে আনয়ন এই দুই কার্য্যের
চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদে-
শীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে
হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না—লিখিত হইত।
তাঁহাকে ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বেদান্ত উপ-
নেক শাস্ত্রের অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনা-
তাঁহার বিপক্ষেরাও পাষণ্ডপীড়ন ও অপরাপর
তাঁহার মত খণ্ডনকরিতে চেষ্টা করিয়া-
করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে—
পথিমধ্যে প্রহারকরিবার চেষ্টা
ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষিবে-
কিন্তু তিনি এসমস্ত অক্ষুব্ধ-
ক্ষণমাত্র ঔদাসীন্য প্রদ-
ঘোরতরবিদ্বেষী হইয়া-
ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা
যন্ত্রালয়" নামক একটী
গ্রন্থ এবং বিপক্ষ-
কাশকরিতে আরম্ভ

কর্ত্তৃকই ১৭৫০

শকে [১৮২৮ খৃঃ অঃ] প্রথম সংস্থাপিত হয়। ১৭৫১ শকে [১৮২৯ খৃঃ অঃ] রাজবিধিদ্বারা যে, হিন্দুজাতীয় সতীদিগের মৃতপতির সহিত সহমরণপ্রথা নিবারিত হয়, রামমোহনরায় তদ্বিষয়েও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহনরায়ের এই সকল কার্য্যকলাপসন্দর্শনে মহাদুঃখিত, ভীত ও কুপিত হইলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা সংস্থাপনকরিলেন। কিছুকালপর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভায় নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। এক্ষণে সে ধর্ম্মসভা আর জীবিত নাই।

রামমোহনরায় বহুদিন হইতে বিলাত যাইবার জন্য বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সুযোগ হইয়াউঠেনাই। এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার নিজের কোন কার্য্যসাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলেন, তদনুসারে তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন দেশীয় লোক সমভিব্যাহারে বিলাতযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধহয় কোন হিন্দু বিলাতগমন করেননাই। বিলাতে যাইবার সময়ে জাহাজে তিনি কেবল শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াই পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ ও বাক্পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহার পরম সমাদর ও মহাসম্ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতেই রুগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যান এবং সেই স্থানেই ১৮৩৩ খৃঃঅব্দের ২৭এ সেপ্টম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ব্রিষ্টল্‌নগরের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছে।

'পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী' 'বেদান্তের অনুবাদ' 'কঠোপনিষদ্'

'বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্' 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ্' 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি রামমোহনরায়রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতেপাওয়াযায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয়গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিকমতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানাশাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়নকরিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়। সে সকল ধর্ম্মসম্পৃক্তবিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শনকরান আমাদিগের অভিমত নহে, ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সেইসকলগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারিবেন। যাহাহউক ইহা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, রামমোহনরায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিতরূপ গ্রন্থসকল এবং তদুত্তরে' পৌত্তলিকমতাবলম্বী ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গালাগদ্যরচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামমোহনরায়রচিত ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য অপর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহার সন্ধান পাওয়াযায়নাই। কেবল 'গৌড়ীয়ভাষার ব্যাকরণ' নামে একখানি ব্যাকরণ দেখিতেপাওয়াযায়। উহা তিনি মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত বিলাতগমনের পূর্ব্বে কলিকাতাস্কুলবুকসোসাইটীকে প্রদানকরিয়া যান। অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচারকরিবার উদ্দেশে কতিপয় ইউরোপীয় ও দেশীয় মহোদয়দিগের যত্নে ১৭৩৯ শকে [১৮১৭ খৃঃ অঃ] এই সোসাইটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। রামমোহনরায়ের ঐ ব্যাকরণ উক্ত সোসাইটীদ্বারা অদ্যাপি প্রকাশিত হইতেছে। বোধহয় ঐ ব্যাকরণখানি বাঙ্গালাভাষার তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যাকরণ। উহা ইঙ্গরেজীব্যাকরণের রীতি অবলম্বনকরিয়া লিখিত— উহাতে বাঙ্গালাভাষাশিক্ষার্থীদিগের অনেকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয় নিবেশিত আছে।

ইঙ্গরেজিতেও তাঁহার ঐরূপ একখানি ব্যাকরণ দেখিতেপাওয়াযায়। বাঙ্গালাখানি ঐ ইঙ্গরেজিরই অনুবাদ।

রামমোহনরায়ের যে আর একটী মহতী শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করাযায় নাই। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গানরচনা করিতেপারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বোধহয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতেপারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ়ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধরাগরাগিণীসমন্বিত; অনেক কলাবতেরা সমাদরপূর্ব্বক উহা গাইয়াথাকেন। তাঁহার রচিত প্রায় দেড়শত গান আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নভাগে দুইটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম——

"মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে॥
এই আশা তরুতলে, বসিয়াছ কুতুহলে,
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।
অরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখেরি ভার, বহিতে হবে——
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ,
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥ ১॥"

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর" ॥ ২॥

৺মদনমোহনতর্কালঙ্কারপ্রণীত রসতরঙ্গিণী প্রভৃতি।

৺রামমোহনরায়ের মৃত্যুসময়ে মদনমোহনতর্কালঙ্কার যুবাপুরুষ ছিলেন। ইহাঁর জীবনবৃত্তসংক্রান্ত ২। ৩ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—তন্মধ্যে একখানি "কবিবর ৺মদনমোহনতর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থসমালোচনা" নামে তাঁহার নিজজামাতার রচিত। ইহাতে সমুদয় বিষয়ের বিস্তৃত ও সঠীক সংবাদ আছে। অতএব আমরা এ বিষয়ে কিছু বাহুল্য না করিয়া সঙ্ক্ষেপেই তাঁহার জীবনবৃত্ত প্রকটিত করিলাম।

এই মহোদয় ১৭৩৭ শকে [১৮১৫ খৃঃ অঃ] নদিয়া জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ৺রামধনচট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের একজন পুস্তকলেখক ছিলেন। তাঁহার পর তদীয় ভ্রাতা ৺রামরত্নচট্টোপাধ্যায় ঐ পদ প্রাপ্তহয়েন। ইনিই প্রথমে মদনমোহনকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া সংস্কৃতকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়াই মদনমোহন রোগাক্রান্ত হইয়া দেশে আইসেন এবং সেই স্থানেই কিয়ৎকাল চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পুনর্ব্বার তিনি কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ক্রমে ক্রমে অধ্যয়নকরেন। এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পঠদ্দশাতেই শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার অনির্বচনীয় প্রণয় জন্মে। তৎকালে তাঁহারাই দুইজনে যে, সংস্কৃতকালেজের সমুজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। পঠদ্দশাতেই মদনমোহন রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়নকরেন। বাল্যকালহইতেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তিসন্দর্শনে সুকবি ৺জয়গোপালতর্কালঙ্কার ও সহৃদয়াগ্রগণ্য গুণনিকষ পূজ্যপাদ

৺প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি কালেজের তাৎকালিক অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিত্বের অনুরূপ 'কাব্যরত্নাকর' এই উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা জানিনা, কি জন্য তাঁহার বন্ধুগণকর্ত্তৃক 'তর্কালঙ্কার' উপাধিদ্বারা সেই উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাঠ সমাপ্ত করিয়া তর্কালঙ্কার কলিকাতার বাঙ্গালাপাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতাফোর্ট উইলিয়মকালেজ ও কৃষ্ণনগরকালেজ, এই কয়েক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিয়া পরিশেষে ১৭৬৯ শকে [১৮৪৭খৃঃঅ] কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। তাঁহার সেই সহাস্যবদনবিনির্গত রসপূর্ণ মধুর অধ্যাপনা যেখানকার যে ছাত্র একবার শ্রবণকরিয়াছেন, তিনি তাহা আর এজন্মে ভুলিতে পারিবেননা। তর্কালঙ্কার কেবল নামেই মদন ছিলেননা—রমণীয় রূপ ও সর্ব্বজন-হৃদয়াহ্লাদক রসিকতাতেও মদন ছিলেন। তিনি ৩ বৎসর মাত্র সংস্কৃতকালেজে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তাঁহাদ্বারা তথায় অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল। কলিকাতায় 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামক মুদ্রাযন্ত্র তাঁহারই যত্নে স্থাপিত এবং তাহাতে বাঙ্গালা সংস্কৃত অনেকগুলি প্রাচীনগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই সময়েই শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারের গুণগান শুনিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করেন। নিস্বার্থ পরহিতৈষী সাহেবমহোদয় অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন এতদ্দেশীয় কামিনীদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপনকরিতে ইচ্ছুক হইলে তর্কালঙ্কারই প্রধান উদ্যোগী হইয়া হেদুয়ার তীরস্থ বালিকাবিদ্যালয়সংস্থাপনে তাঁহার সহায়তা করেন এবং "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াঽতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এই বচন উদ্ধৃতকরিয়া সাধারণের যাহাতে স্ব স্ব বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষাপ্রদানে অনুরাগ জন্মে, তদর্থ বিবিধরূপে উৎসাহ দেন এবং দেশে

সমাজচ্যুত হইবার ভয়েও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৃষ্টান্ত দর্শাইবার জন্য আপনার দুই কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণকরেন। তিনি ইহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে—কিয়ৎকালপর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বয়ং ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে শিশুবোধক ও নীতিকথা প্রভৃতি ভিন্ন বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী কোন ভাল পুস্তক ছিলনা; তর্কালঙ্কারই সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাবের পূরণার্থ ৩ ভাগ শিশুশিক্ষা প্রণয়নকরেন। এই সময়েই সর্ব্বশুভকরীনাম্নী একখানি মাসিকপত্রিকা তাঁহারই যত্নে প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার রচিত এমত একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালারচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয়নাই। বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন "আমি ঐ প্রস্তাব কখনই ওরূপ লিখিতেপারিতামনা"। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত বেথুনসাহেব তর্কালঙ্কারের প্রতি যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন; এবং তর্কালঙ্কারের কোনরূপ উপকার করিবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তর্কালঙ্কার তেজস্বিতাবশতঃ এই কার্য্যের জন্য কোনরূপ উপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করেননাই।

১৭৭২ শকে [১৮৫০খৃঃঅ] তর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগকরেন এবং ক্রমাগত ছয় বৎসরকাল ঐ কার্য্য করিয়া এই স্থানেই ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মুর্শীদাবাদ আগমনের পর তিনি গ্রন্থরচনা একেবারে ত্যাগকরিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার যে সকল মনোবৃত্তি যেরূপ প্রবল ছিল, মুর্শীদাবাদে তাহা সেরূপ ছিলনা, এই জন্যই সুধীরঞ্জন * রচয়িতা বঙ্গভাষাও ইঙ্গরেজিভাষার পরস্পর বিবাদোপলক্ষে কহিয়াছেন——————

* কৃষ্ণনগরকালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গোস্বামীদুর্গাপুরনিবাসী

"কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার।
দুইজন আছে স্বদেশ বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদনমোহন।
পড়িলে কবিতা তাঁর মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাকরকর।
ধরিয়াছে কিবা দৈবশক্তি মনোহর॥
চাহিলে তপনপানে তুনয়ন খরে।
জুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে॥" (বঙ্গভাষা)
"ভাল আশা সুবদনি! করিয়াছ মনে।
বাড়াবে তোমার মান এরা দুই জনে॥
এতদিন তুমি কি গো করোনি শ্রবণ।
মদন কবিতা আর করেনা রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ।
তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক।
লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক॥"(ইঙ্গরেজিভাষা)

মুর্শীদাবাদ (বহরম্পুর) ত্যাগকরিয়া তিনি এই জেলারই অন্তর্বর্ত্তী কান্দীনামক স্থানের ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট হইয়া গমন করেন এবং ঐ স্থানেই ১৭৭৯ শকে [১৮৫৮ খৃঃ অঃ] ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার হতভাগ্যা বৃদ্ধা জননী ও পত্নী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল। এক্ষণে পাঁচটী কন্যামাত্র জীবিত আছেন—তাঁহাদেরও কেহ কেহ পৈতৃক

৮ দ্বারকানাথঅধিকারী এই গ্রন্থ প্রণয়নকরেন। ইহাতে গদ্য ও পদ্যে অনেকগুলি নীতিগর্ভপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা বিশুদ্ধ বটে—সকল রূপকগুলিই ভাল না লাগুক, অনেকগুলি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ১৭৭৭ শকে [১৮৫৫ খৃঃঅঃ] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার কিছু অধিক দিন জীবিত থাকিয়া আর কোন রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেননাই—অকালেই কালকবলে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত সজীব করিয়া রাখিবে।

কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ উত্তরাধিকারিণী হইয়াছেন। দেশীয় কামিনীগণ! তোমরা মদনতর্কালঙ্কারের জন্য অন্ততঃ একবারও অশ্রুপাত কর। তিনি তোমাদের নিমিত্ত বিস্তর ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন! বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যাপ্রেরণ ও বিধবাবিবাহের সহায়তাকরণ অপরাধে তাঁহাকে নিজ বাসগ্রামে ৮।৯ বৎসর সমাজবহিষ্কৃত হইয়া বাস করিতে হইয়াছিল!

রসতরঙ্গিণী।——এই গ্রন্থখানি তর্কালঙ্কারের প্রথম রচনা। ইহা আদিরসসংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কৃত (অধিকাংশ উদ্ভট) শ্লোকের পদ্যে অনুবাদ। অনুবাদকর্ত্তা ঐ অনুবাদেই আপন কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃতকবিতার ওরূপ সরল ও মধুর অনুবাদ, বোধহয় ভারতচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেননাই। তর্কালঙ্কারেরও রচিত সকলকবিতা অপেক্ষা ইহাই সমধিক মধুর বোধহয়। কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত নিরবগুণ্ঠন আদিরসময় হওয়ায় সর্ব্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হয়না। যাহাহউক আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার দুইটী সংস্কৃত-শ্লোক ও তাহার অনুবাদ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম——

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধি র্বিদধে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥"

"নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভোগে॥
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
অতএব একেবারে বিজ্ঞহওয়া ভার।
দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥"

"ইন্দীবরেন নয়নং মুখ মম্বুজেন কুন্দেন দন্ত মধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"

"নয়নে কেবল, নীল উতপল, মুখে শতদল, দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন, পল্লব দিল॥

শরীর সকল, চম্পকের দল, দিয়ে অবিকল, বিধি রচিল। রচনা.
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে, পাষাণে তব, মন গড়িল ॥"

বাসবদত্তা—তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয়গ্রন্থ বাসবদত্তা। ১৭৫৮ শকে [১৮৩৬ খৃঃ অঃ] যশোহর জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী নওয়াপাড়া নামক স্থানের জমীদার ৺ কালীকান্ত রায়ের প্রবর্ত্তনায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। সুবন্ধুনামা প্রাচীন কবি সংস্কৃত গদ্যে বাসবদত্তা নামে যে এক আখ্যায়িকা রচনাকরেন, এই গ্রন্থ তাহারই স্থূল উপাখ্যানমাত্র লইয়া পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে বিরচিত। অনেকের বোধ আছে যে, তর্কালঙ্কার মূলগ্রন্থের সমস্ত ভাব লইয়াই এই কাব্য রচনাকরিয়াছেন——ইহাতে তাঁহার নিজের কবিত্ব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম। মূল বাসবদত্তার রচনা আদ্যোপান্ত অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, উপমা, রূপক, বিরোধ, অসঙ্গতি প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কারে একেবারে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতে সে সকল অলঙ্কারে যেরূপ বৈচিত্র্য হয়, বাঙ্গালায় সে বৈচিত্র্য কোনমতেই আনিবার যো নাই। সুতরাং তর্কালঙ্কার সে দিকে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি ইহাতে যে সকল রসভাবের যোজনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের; তবে স্থানে স্থানে মূলগ্রন্থ হইতেও কোন কোন ভাব গ্রহণকরা-হইয়াছে এই মাত্র। তদ্ভিন্ন তর্কালঙ্কার উপাখ্যানাংশেও মূলগ্রন্থ হইতে অনেক নূতন যোজনা করিয়াছেন।

মূলগ্রন্থের স্থূল বিবরণ এই—মহেন্দ্রনগরে চিন্তামণিনামক রাজার কন্দর্পকেতু নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি একদা স্বপ্নে অপরূপরূপা এক কামিনীকে দর্শনকরিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া প্রিয়বন্ধু মকরন্দকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক ভবন হইতে নির্গত হয়েন, এবং বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য এক জম্বুবৃক্ষের তলভাগে রাত্রিযাপন করেন। সেই বৃক্ষের শাখারূঢ় শুক ও শারিকার কথোপকথনশ্রবণে জানিতে পারেন যে, তিনি যে কামিনীকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তিনি

কবিতুমপুরের রাজা অনঙ্গশেখরের কন্যা—নাম বাসবদত্তা। বাসবদত্তা স্বয়ম্বরসভায় কাহারও গলে বরমাল্য না দিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া অধীরা হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ তমালিকানাম্নী শারিকা দ্বারা পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কন্দর্পকেতু ঐ শারিকার নিকট হইতে পত্রগ্রহণ করিয়া উহারই সহিত কুসুমপুরে গমনপূর্ব্বক গোপনে একাকী বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং শ্রবণ করেন যে, বাসবদত্তার পিতা পরদিনই অন্যবরে তাঁহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছেন; এইজন্য উভয়ে পরামর্শ করিয়া রজনীতেই পলায়নপূর্ব্বক সেই বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া রাজকুমার নিদ্রিত হয়েন। কিন্তু নিদ্রোত্থিত হইয়া বাসবদত্তাকে না দেখিতে পাইয়া প্রায় এক বৎসরকাল বনে বনে কাঁদিয়া বেড়ান। পরিশেষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া আকাশবাণীশ্রবণে পুনর্ব্বার বিন্ধ্যাটবীতে আগমনপূর্ব্বক প্রস্তরময়ী বাসবদত্তার গাত্রে করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করেন। অনন্তর, 'বাসবদত্তা লইবার জন্য দুই রাজার যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুনির আশ্রমধ্বংস হয়, মুনি আসিয়া সেই ক্রোধে তাঁহাকে পাষাণময়ী হইতে শাপ দেন, এবং প্রিয়করস্পর্শপর্য্যন্ত সেই শাপের অবধি করেন' ইত্যাদি পূর্ব্ব বিবরণ বাসবদত্তার মুখেই শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সহসাসমাগত মকরন্দ সমভিব্যাহারে পরমানন্দে গৃহে গমন করেন।

বাঙ্গালা বাসবদত্তায় বিন্ধ্যবাসিনীদর্শন, যোগমায়ার পূজা, ককারাদিক্রমে স্তব, হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন, কুসুমপুরে সরোবরতীরে রাজকুমারের বিশ্রাম, তথায় ষষ্ঠীপূজোপলক্ষে নাগরিকাদিগের আগমন, বাসবদত্তা বা কামিনীর সহিত কন্দর্পকেতুর বিবাহ বিহার প্রভৃতি যাহা২ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তর্কালঙ্কারের স্বকপোলকল্পিত। এই উপাখ্যানবর্ণনাবসরে তর্কালঙ্কার অনেকস্থলে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ ও তাঁহার উদ্ভাবিতভাবাদি গ্রহণকরিয়াছেন, সত্যবটে; কিন্তু তাহা

হইলেও ইহাঁকে সামান্যকবিমধ্যে গণনা করাযায় না। ইহাঁর রচনা ভারতচন্দ্রেরন্যায় আদ্যোপান্ত তত সরল ও সুমার্জ্জিত না হউক, পয়ারাদি ছন্দের বিশুদ্ধপ্রণালী সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত না হউক কিন্তু ঐ রচনা যে, অনেকস্থলেই পরমরমণীয় ও অসাধারন বৈচিত্র্যসংযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভারত বয়সের যেরূপ পরিপাকাবস্থায় গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তর্কালঙ্কার সেরূপ অবস্থায় গ্রন্থরচনা করিলে বোধহয় বাসবদত্তা অন্নদামঙ্গলের সমান মধুর হইতেপারিত। বাসবদত্তারচনাসময়ে তর্কালঙ্কারের বয়ঃক্রম ২১ | ২২ বৎসরমাত্র ছিল!

পয়ার ত্রিপদীপ্রভৃতি চলিত ছন্দ ছাড়া তর্কালঙ্কার ইহাতে অনুষ্টুপ্, তোটক, পজ্ঝটিকা, একাবলী, দ্রুতগতি, গজগতি, কুসুমমালিকা, দিগক্ষরা প্রভৃতি অনেক নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই সকল ছন্দ সংস্কৃতমূলক, কিন্তু তর্কালঙ্কারই তাহার অনেকগুলিকে বাঙ্গালায় প্রথম অবতারিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রন্থমধ্যে ভৈরবী, সিন্ধু, ভয়রোঁ, বেহাগ, মল্লার প্রভৃতি অনেকগুলি রাগরাগিণী এবং ঠেকা, জৎ, ছেপ্‌কা, তিওট্, পোস্ত প্রভৃতি নানাবিধ তাল ব্যবহারকরিয়াছেন। পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে ইহার প্রমাণ দর্শনকরিবেন।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ বাসবদত্তার অধিক অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অল্পমাত্র যাহা উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় হইবে——

কামিনীর সজ্জা।

"হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচকলসে কৃতকসনা॥
স্মর অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥
জঘনতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিতদশনা॥
জিতবরটা গজগমনা। অরুণঘটাসমচরণা॥
কনকছটা জিনি বরণা। চমরসটা কচরচনা॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা॥"

কামিনীর রূপবর্ণন ।

"কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী ।
কুণ্ডলী করিয়া যেন কালকুণ্ডলিনী ॥
রমণীস্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে ।
তার চোরে অপাঙ্গভঙ্গীর বিষে জারে ॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে ।
মুখপদ্ম মধু আশে অলি আসে পাশে ॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখসুষমা ।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা ॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূধনু ।
অভিমানে হরহুতাশনে ত্যজে তনু ॥
নাসাবংশ নয়নযুগল মাঝে শোভে ।
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিম্ব লোভে ॥
কিম্বা নেত্র সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু ।
তার মধ্যে বুঝি বিধি বান্ধিয়াছে সেতু ॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন ।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন ॥
একেত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম ।
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূটসম ॥
কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব ।
অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব ॥
সে বদন বিধু অতি পরমবিভব ।
অধররাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব ॥
কুন্দ সুকুসুমসম দশনের শোভা ।
ঈর্ষায় দাড়িম্ববীজ বুঝি শোণ আভা ॥
হাস্যমুখী সে যখন্ মৃদু মৃদু হাসে ।
পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে ॥
শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্যসরোবরে ।
পাণিপদ্ম প্রকাশে নখররবিকরে ॥

* * * * * *

সুবলনী মধ্যখানি কি বাখানি তার।
আছে কি না আছে অনুমান করা ভার॥
*   *   *   *   *   *
নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে।
অপরূপ রূপ তার স্বজিল জগতে॥
তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত।
নখচন্দ্রে করে পাদপদ্ম বিকসিত॥
বুঝি মণিনূপুরের করি কলধ্বনি।
পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধনী॥
সপ্তস্বরা স্বরসম শুনি তার স্বর।
বুঝি পিক উহু উহু করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়াভার।
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার॥"

স্বয়ম্বরাগত রাজগণের পূর্ব্বরজনীতে উৎকণ্ঠা।

"সন্ধ্যাসহ বন্ধ্যা আশা হইয়া সত্বরা।
নৃপগণে করিতে আইল স্বয়ম্বরা॥
প্রতি নৃপতির প্রতি করিয়া সম্প্রীতি।
নিশাযোগে শুভযোগে চলিল সম্প্রতি॥
বাসায় আশায় পেয়ে যতেক ভূপতি।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা প্রতি হইল বিমতি॥
কেবল অসার আশা মনে করি সার।
কাটায় সুদীর্ঘ নিশা ভাবিয়া অসার॥
আশা সঙ্গে যত সঙ্গ হয় সঙ্গোপনে।
ততই আশার প্রীতি বাড়ে মনে মনে॥
আশার মহিমা সীমা কি কব কথায়।
একা সবাকার মন সমান যোগায়!॥"

১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা——পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কলিকাতার বেথুন সাহেবের বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ এই তিন পুস্তক রচিত হয়। ইহার পূর্ব্বে শিশুদিগের বর্ণশিক্ষা

প্রভৃতি প্রথমহইতেই পুস্তকদ্বারা হইত না—গুরুমহাশয়েরা শিশু-দিগের হস্তে প্রথমে খড়ি দিয়া ক খ প্রভৃতি কয়েকটী হল্‌বর্ণ শিখাইতেন। পরে তালপত্রে লেখাইয়া সমুদয় হলবর্ণ এবং ক্য স্ক স্ক প্রভৃতি সমুদয় সংযুক্তবর্ণ শিখাইয়া তৎপরে "সিদ্ধি রস্তু" বলিয়া অ আ প্রভৃতি সমুদয় স্বরবর্ণ ও তদনন্তর হলবর্ণের সহিত তাহাদের যোগ হইলে কিরূপ আকারপরিবর্ত্ত হয়, সে সকল (বানান নামে) শিখাইতেন। এ স্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, স্বরবর্ণের পূর্ব্বে "সিদ্ধি রস্তু" এই মঙ্গলাচরণসূচক প্রার্থনাবাক্য থাকায় বোধহয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা শিশুদিগকে প্রথমে স্বরবর্ণের ই শিক্ষা দিতেন, কিন্তু শুদ্ধ স্বরবর্ণে অধিক কথা লিখিতে পারাযায় না, অথচ শুদ্ধ হলবর্ণ শিক্ষিত হইলেই তদদ্বারা জল, ঘর, পথ, লবণ প্রভৃতি অনেক কথা লিখিতেপারাযায়, এই সুবিধাদর্শনেই, বোধহয়, পরবর্ত্তী শিক্ষকেরা পূর্ব্বরীতির পরিবর্ত্ত করিয়া প্রথমেই ক খ প্রভৃতি হল্‌বর্ণের শিক্ষাপ্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্কুল ভিন্ন পল্লীগ্রামের সমুদয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে অদ্যাপি এই প্রথা প্রবল আছে। কলিকাতাতেও এই প্রথাই পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এখন্ সকল স্কুলেই ইঙ্গরেজি শিক্ষার অনুকরণে বহি দেখিয়াই শিশুদিগের বর্ণমালাশিক্ষা হয়। তর্কালঙ্কারের পূর্ব্বোক্ত শিশুশিক্ষারচনাই পূর্ব্বপ্রথাবিলোপের মূল বলিতে হইবে। যাহাহউক তৎকালে বালকদিগের পাঠোপযোগী প্রণালীবদ্ধ কোন ভাল পুস্তক ছিল না। তর্কালঙ্কার সেই অভাব মোচনকরিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

১ম ভাগ শিশুশিক্ষায় অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ, ক খ প্রভৃতি হলবর্ণ, অসংযুক্ত হলবর্ণে স্বরের যোগে যেসকল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পদ ও বাক্য হইতে পারে তাহার উদাহরণ, এবং ২য় ভাগে সংযুক্ত হলবর্ণের ঐরূপ উদাহরণ পরমপাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম

ভাগের শেষে অসংযুক্ত হলবর্ণে সরল ও মধুর যে একটী কবিতা রচিত হইয়াছে, সেরূপ কবিতা সামান্যকবির লেখনী হইতে নির্গত হইবার নহে। নিম্নভাগে তাহা উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে ১ম ও ২য় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে অনেকগুলি ঐরূপ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহার কোনখানিই শিশুশিক্ষার ন্যায় কোমল, মধুর ও শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশুদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধহয় এপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয়নাই। উহার বিষয়গুলিও যেমন সুন্দর, রচনাও তেমনই মধুর। তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তিনি এই এক শিশুশিক্ষাদ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। এতদ্দেশীয় সমস্ত বিদ্যালয়েই ঐ পুস্তক ব্যবহৃত হইতেছে এবং উহাই কৃতী পৌত্রের ন্যায় তর্কালঙ্কারের বৃদ্ধা জননীকে কাশীবাস করাইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কবিতাটি এই——

"পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুরপাল লয়ে যায় মাঠে। শিশুগণ দেয় মন নিজ২ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল। পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ। আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর। পাতায়২ পড়ে নিশীর শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

৺ ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের প্রবোধপ্রভাকরাদি।

ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত মদনমোহনতর্কালঙ্কার অপেক্ষা কয়েকবৎসরের বড় ছিলেন। তিনি ১৭৩১ শকে [১৮০৯ খৃঃ অঃ] ত্রিবেণীর পরপারস্থ কাঁচরাপাড়া নামক গ্রামে বৈদ্যবংশীয় ৺ হরিনারায়ণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করেন। বাল্যকালে কোন প্রধান বিদ্যালয়ে

অধ্যয়ন বা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া বিশেষখ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ—এসকল তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে——

"কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।"

এই কবিত্ব ও শক্তি উভয়ই তাঁহার ছিল, এবং তজ্জন্যই তিনি জনসমাজে তত আদৃত ও তত সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি কবিতারচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঐ রচনাশক্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে তিনি উহা প্রকাশের স্থল পাইবার মানসে ১৭৫২ শকের [১৮৩০ খৃঃ অঃ] ১৬ই মাঘ হইতে "সংবাদ প্রভাকর" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্ব্যাহিক ও তৎপরে ১৭৬১ শকের ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিকরূপে বহির্গত হইতে থাকে। ঐ পত্রে গদ্য ও পদ্য দুইই থাকিত, তন্মধ্যে গদ্যের ভাগ অপেক্ষা নানাবিষয়িণী মনোহর কবিতামালাই অধিক। প্রভাকরভিন্ন সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে আরও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পত্রখানির সহিত কিয়দ্দিবসের জন্য ৺গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবাদ হওয়ায় উভয়পত্রই পরস্পরের নিতান্ত অশ্লীল কুৎসাবাদে পূর্ণ হইয়া একান্ত অপবিত্র হইয়াছিল। এক্ষণে পাষণ্ডপীড়ন, সাধুরঞ্জন ও রসরাজ এ তিন পত্রিকাই জীবিত নাই।

এই সকল পত্রিকার আয়তন ক্ষুদ্র; ইহাতে তাঁহার মনোমত বিস্তৃত কাব্যপ্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে স্থান পাইত না, এজন্য তিনি কয়েকবৎসর পরে বিস্তৃত আকারের একখানি মাসিক প্রভাকর প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহা নানাবিধ কবিতাবলীতেই প্রায় সমুদয় পরিপূরিত হইত। এই সময়ে তিনি ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত অনুসন্ধান করিতে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন এবং যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা উক্ত মাসিক

প্রভাকরে ক্রমশঃ প্রকাশকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল ভারতচন্দ্ররায়ের জীবন-চরিত পৃথক্ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতার ধনিসন্তানেরা পাঁচালী, হাফ্‌আক্‌ড়াই প্রভৃতির আমোদে বড় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তকবি তাহার কোন না কোন দলে—হয় ছড়া বাঁধিয়া, নয় গীতরচনাকরিয়া, দিতেন। সুতরাং সকল সমাজেই তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল।

ঈশ্বরগুপ্ত আপনার কবিত্বশক্তি কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশকরিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন—অনেক দিনপর্য্যন্ত কোন পুস্তকরচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই জন্যই সুধীরঞ্জনের ইঙ্গরেজীভাষা আক্ষেপ করিয়াছেন, "তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক। লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক।" সুধীরঞ্জনের এই উত্তেজনাতেই হউক, বা যে কারণেই হউক, তিনি শেষাবস্থায় প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ ও কলিনাটক নামে চারিখানি পুস্তক রচনাকরিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুঃখের বিষয় কলিনাটককে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ১৭৮০ শকে [১৮৫৮ খৃঃ অ] তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্তরামচন্দ্রগুপ্ত অদ্যাপি তাঁহার পত্রিকাখানি চালাইতেছেন; কিন্তু এক্ষণে প্রভাকরের আর সে প্রভা নাই—

"সূর্য্যাপায়ে নখলু কমলং পুষ্যতি স্বা মভিখ্যাম্"।

প্রবোধপ্রভাকর———এই গ্রন্থে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছন্দে "প্রাণিতত্ত্বনিরূপণ" প্রসঙ্গে—দুঃখের ক্লেশানুভবেই লোকের সুখান্বেষণে প্রবৃত্তি হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়না, স্বর্গীয় সুখ চিরস্থায়ী নহে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিনশ্বর সুখলাভ হয়, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই জীবের উৎপত্ত্যাদি হয়, সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বর নিত্য ইত্যাদি অনেকগুলি শাস্ত্রীয় মীমাংসা বিনিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থ-

কার নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না ; একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় গ্রন্থরচনা করা হইয়াছে। এ গ্রন্থে গদ্য পদ্য দুই আছে—গদ্যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, পদ্যে তাহাই আবার [illegible] হইয়াছে ; সুতরাং গ্রন্থখানি অনর্থক কিছু বড় হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ, পদ্য-গুলিও বেশ সরল। এই গ্রন্থ প্রথমখণ্ডমাত্র। ইহা ১৭৭৯ শকে [১৮৫৭ খৃঃ অঃ] মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে ইহার অপরাপর খণ্ডও বহির্গত হইত।

হিতপ্রভাকর—এই গ্রন্থও গদ্যপদ্যময়। ইহাতে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগ অধিক। ১৭৮২ শকে [১৮৬০ খৃঃ অ] ইহা প্রথম মুদ্রিত হয় ; তৎকালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেননা। ইহাতে লিখিত 'ভূমিকার' ভাবে বোধহয়, বেথুনসাহেব কলিকাতাবালিকাবিদ্যা-লয়ের পাঠোপযোগী বাঙ্গালাপদ্যগ্রন্থের অভাব দেখিয়া কবিবর ঈশ্বরগুপ্তকে সরল ও নির্ম্মল ভাষায় তদুপযোগী কয়েকখানি পদ্যপুস্তক লিখিতে অনুরোধকরিয়াছিলেন ; তাহাতেই তিনি বিষ্ণুশর্ম্মার কৃত সংস্কৃত হিতোপদেশকে অবলম্বনকরিয়া গদ্য ও পদ্যে এই পুস্তক প্রণ-য়ন করেন। গদ্যের ভাগ তাদৃশ প্রীতিকর নাহউক, কিন্তু পদ্যগুলি অতীব রমণীয় হইয়াছে। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধপ্রণালী ইহাতে যতদূর অনুসৃত হইয়াছে, এক অন্নদামঙ্গল ভিন্ন, ইহার পূর্ব্বরচিত প্রায় কোন পুস্তকেই ততদূর হয়নাই। গ্রন্থখানি সংস্কৃতের অনুবাদ হউক, কিন্তু কবি তাহাতেও নিজের সামান্য কবিত্ব প্রকাশকরেন নাই। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতেপারিবেন। চতুর্থভাগস্থ সুন্দ ও উপসুন্দ সংক্রান্ত রচনাটী সাধারণকবিত্বপ্রকাশক নহে। ফলতঃ হাস্যরসোদ্দীপক সরল কবিতারচনে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সৌভাগ্যশালী কবি সচরাচর দেখিতেপাওয়াযায়না। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত বেথুনসাহেবের অনুরোধ ক্রমেই যদি কবি এই গ্রন্থরচনা করিয়াথাকেন, তাহাহইলে তিনি

কৃতকার্য্য হন নাই। বেথুনসাহেব বোধহয় তাঁহাকে এরূপ গ্রন্থরচনার জন্য অনুরোধ করেন নাই—ইঙ্গরেজিতে যেরূপ ফার্ষ্ট নম্বর, সেকণ্ড নম্বর পোয়েট্রী [illegible] পুস্তক আছে এবং যাহার অনুকরণে এক্ষণে পদ্যপাঠ, কবিতা[illegible] প্রভৃতি পদ্যপুস্তক রচিত হইয়াছে, বোধহয় তিনি সেইরূপ পুস্তকরচনার নিমিত্তই অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ হিতপ্রভাকর কোনরূপে বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক হয়নাই। ইহার প্রথমে পরমেশ্বরের মহিমবর্ণনা প্রসঙ্গে—

"রে মন! [illegible] পবিত্র প্রেম[illegible] আমোদের আঘ্রাণ একবার নেরে—একবার নে—[illegible] রে মন! ভূতনাথকে একবার দেখ-রে—একবার দেখ-রে, মন-রে—মন-রে—শোন্-রে—শোন্—রে; ও মন! ব্রহ্মরসে গল-রে—গল-রে—গল-রে—ও চিত্ত! এই লৌকিক সামান্যরস রাখ্-রে—রাখ্-রে—রাখ্-রে, তাঁর প্রেমরস চাক্-রে—চাক্-রে—চাক্-রে—তাঁর ভক্তিরস মাখ্-রে—মাখ্-রে—মাখ্-রে, ও মন! তাঁরে ডাক্-রে—ডাক্-রে—ডাক্‌রে"—

ইত্যাদি যে সকল বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা বালকবালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকের কথা দূরে থাকুক, এক্ষণকার সংবাদপত্রেও শোভা পায়না। এখন ওরূপ রচনাকে লোকে 'জেঠামি' বলে। তাছাড়া প্রবোধপ্রভাকরের ন্যায় ইহারও স্থানে স্থানে একই কথা গদ্য ও পদ্যে দুইবার করিয়া বলাহইয়াছে, সে সকল স্থান পাঠকদিগের বিলক্ষণ বিরক্তিকর হয়। তদ্ভিন্ন হিতোপদেশে যেসকল অশ্লীল উপাখ্যান আছে, তাহারও কয়েকটী ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বোধেন্দুবিকাশ———সংস্কৃতপ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ নাটকাকারেই বিরচিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে মাসিক প্রভাকরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে উহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৃথক্ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পরেই গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। তদীয়ভ্রাতা উহার তিন অঙ্কমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, সমুচিত উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে বোধ-

হয় অপরাংশ মুদ্রিত করিতে পারেননাই। ইহার অধিকস্থলেই মূলপুস্তকের অপেক্ষা অনেক বাহুল্যবর্ণন আছে এবং সেই সেই স্থলে প্রচুর কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম, রতি, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, তৃষ্ণা, কলি, দম্ভ, দিগম্বরসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির চরিত্রগুলি যে কত অধিক রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; তরঙ্গলহরী, রণরঙ্গিণী, শেফালিকা, উন্মাদিনী, পঞ্চাল প্রভৃতি কবির স্বোদ্ভাবিত নূতন ছন্দগুলি যে কিরূপ রমণীয় হইয়াছে; হিন্দিমিশ্রিত ভজন ও দোহাগুলি যে কি মধুর হইয়াছে; শ্যামারিষয়ক গীতগুলি যে কিরূপ সুধাবর্ষী হইয়াছে—তাহা লিখিয়া শেষ করাযায়না। ফলতঃ এই পুস্তকখানি পাঠকরিবার সময়ে আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভবকরিয়াছি। স্থলবিশেষে দীর্ঘ দীর্ঘ যে পদ্যগুলি আছে এবং ক্ষপণকাদির সহিত যে অতিরিক্ত মাতলামীটা করা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অপ্রীতিকর বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রায় সমুদয় স্থলই পরমপ্রীতিজনক হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যরচনায়, চেষ্টাকরিয়া অতিরিক্ত অনুপ্রাসযোজনা করিবার যে দোষ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, এগ্রন্থে সে দোষের ভাগও অতি কম দেখাগেল। ফলতঃ ঈশ্বরগুপ্তের মহাকবিত্ব সপ্রমাণ করিবার সময়ে এই গ্রন্থখানিকে সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান করাইলেই মোকদ্দমার জয় হইবে সন্দেহনাই। ইহা অতিদুঃখের বিষয় এবং দেশীয় লোকদিগের কলঙ্কের বিষয় যে, উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে এতাদৃশ কবিত্বপূর্ণ উৎকৃষ্টনাটকও সমগ্ররূপে প্রকাশিতহইতে পায়নাই। পাঠকগণের প্রদশনার্থ ইহার অতি অল্পমাত্র অংশই নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল——

হিংসার উক্তি।—গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে—আজো এরা মরেনি?
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটেমরে,
এখনো এদের ঘরে—যম এসে ধরেনি?

এই সব জামা জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এসব টাকার তোড়া— চোরে কেন হরেনি?
আরে, ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে বড় মান;
গোলাভরা আছে ধান—লক্ষ্মী আজো সরেনি?
মর্ এটা যেন হাতী, দশহাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি—জ্বরে কেন জ্বরেনি?
হাদে মাগী কালামুখী, ঠিক্‌যেন কচিখুকী,
পতিসুখে [illegible]—ঠেঁটী কেন পরেনি?
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে [illegible] চুড়ী,
বেঁকে চলে, মেরে তুড়ি—[illegible] ঝরেনি!
দেখ্ দেখ্ মিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে—ঘুঘু কেন চরেনি?"।

দিগম্বরসিদ্ধান্ত*—ভজন।

"অরহৎ অরহৎ, শির্‌কো জহরৎ, মেরা গুরুজী অহরৎ;
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার হোয়েগা, লেহ এহীকামৎ—
বাবা লেহ এহীকামৎ।
কোহি জাৎকো না মানো বাবা, না মানো দেবী দেবা;
এক্ক মন্‌সে অর্হৎজীঁকো পাঁওমে কর সেবা—
বাবা পাঁওমে কর সেবা।
যব্‌হি যেসা আয়ে মন্‌মে, তেস্‌সে কর ভোগ;
ছোড়্‌দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ, ভুক্কা যাগ যোগ—
বাবা ভুক্কা যাগ যোগ।
আব্‌কি নারী, পর্‌কি নারী, যেস্কে মেলে সঙ্গ;
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসী হায়, কামদেও কি রঙ্গ—
বাবা কামদেও কি রঙ্গ।
এসে পাপ এসে পুণ্য, এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণ্‌সে সব মুক্ত হয় তব্, পাপ যায় কোন্ সাৎ—
বাবা পাপ যায় কোন্ সাৎ।

* অর্হৎ নামা গুরুর শিষ্য—এক প্রকার বৌদ্ধ।

দিন দিন দিন্ গাওমে ঢালো, সব হুঁগঙ্গাজল ;
তবু তেরে কি শোধন হবে, জঠরভরা সব মল—
বাবা জঠরভরা সব মল
অর্হৎ মেরা প্রাণ পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান্,
অর্হৎ পাঁওমে প্রণৎ করো সব, আওর না জানো আন্—
বাবা আওর না জান আন্"।

রাজসী শ্রদ্ধা—গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

"কেরে বামা—বারিদবরণী, তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ ! কি অপরূপ, অনুপরূপ নাহি সরূপ,
মদননিধনকরণকারণচরণ শরণ লয় ॥
বামা হাসিছে ভাবিছে লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে সকলে শাসিছে, নিকটে আসিছে,
বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয় ॥
বামা টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে বলিছে,
গগনে চলিছে, কোপেতে জলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবন ময়।
কেরে—লোলিতরসনা, বিকটদশনা, করিয়ে ঘোষণা,
প্রকাশে বাসনা, হোয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয়" ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কলিনাটক সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিতেপারিলাম না। যাহাহউক এই কয়েক গ্রন্থলিখিত ভিন্ন প্রাত্যহিক ও মাসিকপ্রভাকরে তাঁহার রচিত কত কত হাস্যরসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা নাই। জামাইষষ্ঠী, অরন্ধন, বড়দিন, পিটেসংক্রান্তি বিষয়ক পদ্যগুলি যখন পাঠকরাযায়, তখই নূতনের মত মনকে আমোদিত করে। তাঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক যথার্থই লিখিয়াছেন, "স্বভাববর্ণনে

যেমন কবিকঙ্কণ, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন, আদিরসে যেমন রায়গুণাকর, হাস্যরসে তেমনই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।”

দাশরথিরায়ের পাঁচালী।

১৭২৬ শকে [১৮০৪ খৃঃ অঃ] দাশরথিরায়ের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম ৺দেবীপ্রসাদ রায়। ইহাঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাঁটোয়ার সন্নিহিত বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইহাঁদিগের পৈতৃক বাস। দাশরথিরায় বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তিনি কিতাবতী বাঙ্গালা ও যৎকিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজি শিক্ষাকরিয়া মাতুলের সহায়তায় সাকাঁইএর নীলকুঠীতে সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে পীলাগ্রামে অক্ষয়কাটানী (অক্যবাই) নাম্নী নৃত্যগীতব্যবসায়িনী এক ইতরজাতীয়া কামিনী ছিল। দাশরথির বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে সবিশেষ অনুরাগ থাকায় যৌবনে উহার সহিত প্রণয়সঞ্চার হয়। কিছুদিনপরে অক্যবাই এক ওস্তাদি কবির দল করে—দাশরথি তাহাতে গীত বাঁধিয়া দিতেন। কবির লড়াইএ গানদ্বারা পরস্পরকে গালাগালীদেওয়া হইয়াথাকে। তদনুসারে দাশরথি একদা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে অত্যন্ত কটু গালি খাইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কবির দল ত্যাগকরেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি বিষয়কর্ম্মরহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামে বসিয়া কার্য্যান্তরাভাবে স্বয়ং ছড়া ও গীত বাঁধিয়া দশজন বয়স্যের সহিত সকের এক পাঁচালীর দল করেন—পরে সেই দলই তাঁহার জীবিকা, সৌভাগ্য ও দেশব্যাপিনী “দাশুরায়” নামখ্যাতির কারণ হইয়া উঠে।

তিনি অনেক বিষয়ের অনেক পালা ও অনেক গীত বাঁধিয়াগিয়া-

ছেন, তাহার কয়েকটী লইয়া বটতলার ছাপাখানায় পাঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ কয়েকটী ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেক পালা আছে, এমন কি তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এরূপ অনেকগুলি পালারচনা করিয়াছিলেন, যাহা তিনি নিজেও কখনও ব্যবহার করিতে পান নাই। ১৭৭৯ শকে [১৮৫৭ খৃঃ অঃ] ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র হয় নাই—এক কন্যামাত্র হইয়াছিল, তিনিও বিধবা হইয়া অনেকদিন হইল গতাসু হইয়াছেন—তাঁহার পত্নী প্রসন্নময়ীদেবী অদ্যাপি জীবিতা আছেন।

দাশুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা তিনকড়িরায় এবং তৎপরে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুকাল পাঁচালীর দল রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই গত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বংশে ঐ ব্যবসায় রাখিবার এক্ষণে আর কেহই নাই।

যে পাঁচখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে প্রভাস, চণ্ডী, লবকুশের যুদ্ধ, মানভঞ্জন প্রভৃতি অনেকগুলি পালা আছে। তদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত কত পালা আছে, তাহা স্থির বলাযায় না। ঐ সকল ছড়া ও গীতে কবিত্বপরিচায়ক অনেক স্থল আছে। করুণ ও হাস্যরসের উদ্দীপ্তি স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে, তাহা শুনিয়া মোহিত হইতে হয়। এক সময়ে ঐ পাঁচালী লোকের দ্বারেদ্বারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, এবং অদ্যাপি দাশুরায়ের ২।১টী গীত না জানে, এরূপ লোক প্রায় দেখিতে পাওয়াযায়না। রামপ্রসাদীগানের সুরের ন্যায় দাশুরায়েরও গীতের সুরগুলি নূতনরূপ ও সহজ, এজন্য সকলেই উহা গাইতেপারে। কি ইতর কি ভদ্র কি স্ত্রী কি পুরুষ সর্ব্বসাধারণেই ঐসকল গানের পক্ষপাতী। এরূপ সৌভাগ্য সকললোকের ভাগ্যে ঘটে না।

দাশুরায় সংস্কৃতজ্ঞছিলেন না, কিন্তু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া এবং অভিধান দেখিয়া অনেক সংস্কৃতশব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছড়া ও

গীতে সেই সকল শব্দাড়ম্বর অনেক দেখিতেপাওয়াযায়।, অপভ্রংশ শব্দও ইহাতে অনেক আছে। ছড়াতে পয়ারের ন্যায় অক্ষর পরিমিত নাই—অনিয়মে বেশী ও কম আছে। তদ্ভিন্ন মিত্রাক্ষরতা এত অবিশুদ্ধ যে, তাহা দেখিয়া স্থানে স্থানে কবির প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। তা ছাড়া খেঁউড়নামক উপাখ্যানসকল এত জঘন্য ও এত অশ্লীল যে, তাহা দেখিলে দাশুরায়কে ভদ্রসভায় বসিতে দিতে ইচ্ছা হয়না। যাহাহউক আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলামনা—একটী গীতের উৎকৃষ্ট কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম——

গোপীদিগের নিকটে বৈদ্যবেশী কৃষ্ণের উক্তি।

"ধনী! আমি কেবল নিদানে——
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষগুণ সে জানে।
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়,
গঙ্গাধরচূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে;
অহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারি সৃষ্টিকরা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখ, ভ্রমণ করি এ ভুবনে;"

শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি।

আমরা অনেকক্ষণ হইল ইদানীন্তনকালে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু যাঁহাকে লইয়া ইদানীন্তনকালের এত গৌরব, তাঁহার বিষয়ে এপর্য্যন্ত কিছুই বলাহয়নাই। তিনি—সুগৃহীতনামা শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরমহাশয়। এক স্বতন্ত্রপুস্তকে ইহাঁর জীবনচরিত লিখিবার বিষয়ে অনেক দিন হইতে আমাদের অভিলাষ ছিল। কিন্তু নানাকারণে সে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় অগত্যা এই সাধারণপুস্তকের মধ্যেই—সুতরাং অবশ্যই সংক্ষেপে—তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে হইল।

কিন্তু এতাবর্তা পূর্ব্বের অভিলাষও যে, আমরা একেবারে ত্যাগ করিলাম, তাহাও নহে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর জিলা হুগলীর অন্তর্গত থানাকুলের সন্নিহিত বীরসিংহ (বীরসিংহা) নামক এক সামান্য গ্রামে ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের ৭ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় ১০৲ টাকা বেতনে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। তৎকালে পল্লীগ্রামস্থ বালকদিগের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যেরূপ লেখাপড়া হইত, ঈশ্বরচন্দ্রেরও বাল্যকালে সেইরূপ লেখাপড়া হইয়াছিল। ৯বৎসর বয়ক্রমসময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া খৃঃ ১৮২৯ অব্দের ১লা জুনে সংস্কৃতকালেজে ভর্ত্তিকরিয়া দেন। অবস্থার ক্ষুদ্রতাবশতঃ পুত্রের কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ করা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে বড় কষ্টকর হইত, সুতরাং তথায় অবস্থানকালে অনেকদিনপর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে পাক, কদর্য্যস্থানে বাস, সামান্যদ্রব্যভক্ষণ ও কুৎসিত শয্যায় শয়ন, করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতেহইয়াছিল। এইরূপ ক্লেশভোগ করিয়া তিনি খৃঃ ১৭৪৬ শালের নবেম্বরমাসপর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২ বৎসর ৬ মাসকাল কালেজে থাকিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত ও সাঙ্খ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু-লা-বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হয়েন। তৎকালে সংস্কৃতকালেজে ইঙ্গরেজিঅধ্যয়ন করা না করা ছাত্রদিগের ঐচ্ছিক ছিল। নানাবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ কালেজে ঈশ্বরচন্দ্রের ইঙ্গরেজিঅধ্যয়ন অধিক হয়নাই। ৫।৬ মাসকালমাত্র যাহা পড়িয়াছিলেন, কালেজত্যাগ করিবার সময়ে তাহা লোপ পাইয়াছিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকমাত্রেই বাল্যকালে পড়াশুনায় কিছু অনাবিষ্ট থাকে। অল্প পরিশ্রম করিলেই পাঠাভ্যাস হয়, অথচ অধ্যাপকবর্গের

সমকক্ষ হইতে পারাযায়, এই বুঝিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণীতে অধিক পরিশ্রম করেন নাই; সমগ্রগ্রন্থ না পড়িয়াও কিসে ভাল পরীক্ষাদিতে পারাযায়, সর্ব্বদা তাহারই ফিকির অনুসন্ধান করিতেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়াই অধিককাল কাটাইতেন। এই সময়ে ৺ মদনমোহনতর্কালঙ্কার প্রভৃতি কয়েক জন সহাধ্যায়ী তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়াছিলেন। অনন্তর যখন তাঁহার বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিপাক হইল এবং তিনি অলঙ্কারশ্রেণীতে উঠিয়া কিছু পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যা ও গৌরবের পরিসীমা রহিল না। অতঃপর তিনি যখন যে শ্রেণীতে থাকিতেন, অবিসম্বাদিতভাবে সেই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেন এবং সংস্কৃত গদ্য ও সংস্কৃত পদ্য রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া মধ্যেমধ্যে প্রচুর পারিতোষিক পাইতেন। কালেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহার এইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সন্দর্শনে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহকরিতেন এবং কালেজত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহার বিদ্যার অনুরূপ হইবে বলিয়া "বিদ্যাসাগর" এই উপাধি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এই উপাধি সংস্কৃতব্যবসায়ীমাত্রেরই হইতেপারে সত্য, কিন্তু আজি কালি শুদ্ধ "বিদ্যাসাগর" বলিলে—"হরির্বৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বর স্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ" ইত্যাদিবৎ জনসাধারণে কেবল উহাঁকেই লক্ষ্য করিয়াথাকে।

বিদ্যাসাগরের, কালেজে অবস্থানসময়ে ফোর্টউইলিয়ম্ কালেজের তৎকালীন সেক্রেটরি কাপ্তেন জি, টি, মার্শেলসাহেব কিয়ৎকালের জন্য সংস্কৃতকালেজের সেক্রেটরি হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি বিদ্যাসাগরকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। ফোর্টউইলিয়ম কালেজের প্রধানপণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে মার্শেলসাহেব বিনা প্রার্থনায় তাঁহাকে কালেজহইতেই লইয়াগিয়া ৫০ টাকাবেতনে ১৮৪১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াদেন। ঐ সময়ে সাহেব তাঁহাকে

বলেন যে, ঈশ্বর! তুমি ইঙ্গরেজিশিক্ষা ও বাঙ্গালা পুস্তকরচনা করিতে চেষ্টা কর, নতুবা কাজের লোক হইতে পারিবে না। হিতৈষী সাহেবের এই পরামর্শানুসারে তিনি ঐ সময়ে ইঙ্গরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শিক্ষা দিবার লোকের অভাববশতঃ অচিরেই তাহা ত্যাগ করিতে হয়। মার্শেলসাহেবের জেদ্ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া আবার আরম্ভ করেন, এবং আবার ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ২ অসুবিধাভোগ করিয়াও মধ্যে২ সামান্যরূপ সাহায্য পাইয়া এবং স্বয়ং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া এক্ষণে ইঙ্গরেজিভাষাতে বিশিষ্টরূপ অধিকারলাভ করিয়াছেন।

মার্শেলসাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় মতগ্রহণব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। ঐ সময়ে ডাক্তার মৌএটসাহেব এডুকেশনকৌন্সিলের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি সময়ে২ সংস্কৃতবিদ্যা ও হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে মার্শেলসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেন; মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরেরদ্বারা মৌএটসাহেবের জিজ্ঞাস্যবিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই সূত্রে মৌএটসাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তদবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমেক্রমে তাঁহার পরমাত্মীয় ও যারপরনাই হিতৈষী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে সংস্কৃতকালেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ শূন্য হওয়ায় বেতনের বৈলক্ষণ্য নাথাকিলেও সাহেবেরা বিদ্যাসাগরকেই ঐপদের যথার্থউপযুক্ত বিবেচনাকরিয়া ঐ সালের এপ্রিল মাসে নিযুক্ত করেন। ঐ সময়েই তাঁহাকর্ত্তৃক কালেজের অধ্যয়ন-প্রণালী

অনেক সংশোধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ফোর্টউইলিয়মকালেজে অবস্থান সময়ে তত্রত্য সিবিলিয়ান ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক কদর্য্যভাষারচিত বাঙ্গালাহিতোপদেশের পরিবর্ত্তে মার্শেল্‌সাহেবের আদেশক্রমে বিদ্যাসাগর 'বসুদেবচরিত' নামে সর্ব্বপ্রথম এক বাঙ্গালাপুস্তক রচনা করেন। গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা মুদ্রিত হয়নাই। কিছুদিন পরে উক্তসাহেব গবর্ণমেণ্টকে সম্মত করিয়া হিন্দি বেতাল পঞ্চবিংশতির এবং মার্শমানপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের উত্তরভাগের বাঙ্গালাঅনুবাদ করিতে বিদ্যাসাগরকে অনুমতি করিয়াছিলেন। তদনুসারে এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে [১৯০৩ সংবৎ] বেতালপঞ্চবিংশতিপুস্তক এবং ইহার পরবৎসরে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে [১৯০৪ সং] বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। ঐরূপ কার্য্যের উদ্দেশেই ১৮৫০ খৃঃ অব্দে [১৯০৬ সং] চেম্বর্স বিওগ্রাফী নামক ইঙ্গরেজিপুস্তকহইতে সঙ্কলিত করিয়া জীবনচরিত নামক পুস্তকও বিরচিত হইয়াছে।

সংস্কৃতকালেজে প্রায় এক বৎসর কর্ম্মকরার পর তথাকার তাৎকালিক সেক্রেটরি বাবু রসময়দত্তের সহিত নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের অনৈক্য হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর অতি তেজস্বী লোক; তিনি আপনার মনের মত কাজ হইবেনা, বুঝিয়া বিরক্ত হইলেন এবং টাকার মায়া ত্যাগকরিয়া কালেজে প্রবিষ্ট হইবার ঠিক্ একবৎসর পরেই অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল্‌মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তিন মাসের পর জুলাইমাসে সে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

অতঃপর বিদ্যাসাগর কিয়ৎকালের জন্য বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া লেখাপড়ার চর্চ্চায় বিশেষতঃ ইঙ্গরেজীর অনুশীলনেই সাতিশয় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর ফোর্টউইলিয়ম কালেজের হেড্ কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায় মার্শেলসাহেবের অনুরোধে ৮০৲ টাকাবেতনে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্মরণীয়নামা বেথুনসাহেব শিক্ষা-

সমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) ছিলেন। মৌএটসাহেব বিদ্যাসাগরের গুণগান করিয়া তাঁহাকে বেথুনসাহেবের নিকট পরিচিত করিয়াদেন। তদবধি বেথুনসাহেব বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন এবং নানাবিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া পরম আনন্দিত হইতেন। বেথুনসাহেব কলিকাতায় যে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, বিদ্যাসাগর তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে বেথুনসাহেব উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের সমস্তভার তাঁহার উপর প্রদান করিয়াছিলেন। এই বালিকাবিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থই বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে [১৯০৭ সং] 'চেম্বর্স.রুডিমেণ্ট্স অব নলেজ' অবলম্বনকরিয়া চতুর্থভাগ শিশুশিক্ষা বা বোধোদয় নামক পুস্তক রচনাকরেন। যাহাহউক মার্শেল, মৌএট ও বেথুনসাহেব এই তিনজনই বিদ্যাসাগরের যথার্থ মুরব্বী। যাহাতে তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি ওমানসম্ভ্রমের বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিন জনেই সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। অতএব বিদ্যাসাগরকে উহাঁদের নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

মদনমোহনতর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাদের জজপণ্ডিত হইয়া আসিলে সংস্কৃতকালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মৌএট্সাহেব পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে ৯০৲ টাকাবেতনে বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াদিলেন। ঐ নিয়োগকালে এডুকেশন কৌন্সিলের মেম্বরেরা সংস্কৃতকালেজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং উহা উত্তরকালে কিরূপ হওয়া উচিত? তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। বোধহয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেক্রেটরী রসময়বাবু কর্ম্মত্যাগ করিলেন। তিনি যেমন ছাড়িলেন, অমনি বিদ্যাসাগর সাহিত্যাধ্যাপকের কর্ম্ম হইতে তাঁহার পদে ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর একমাস অতীত না হইতেই কৌন্সিলের সাহেবেরা বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত রিপোর্ট

পাঠকরিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সংস্কৃতকালেজের সেক্রেটরি ও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ উঠাইয়াদিয়া উভয়বেতনে অর্থাৎ মাসিক ১৫০ টাকাবেতনে প্রিন্সিপালের পদ নূতনসৃষ্ট করিয়া ২১এ জানুয়ারি হইতে বিদ্যাসাগরকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যাহাহউক ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই অনুসারে কালেজে সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজি উভয় পাঠনারই পরিবর্ত্ত হইল। পূর্ব্বে ইঙ্গরেজি, ছাত্রদিগের ঐচ্ছিক পাঠ ছিল, এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অবশ্যপাঠ্য হইল। সংস্কৃতেও, নিম্নশ্রেণীতে মুগ্ধবোধব্যাকরণ উঠিয়াগিয়া তৎপরিবর্ত্তে বিদ্যাসাগরকর্ত্তৃক বাঙ্গালাভাষায় রচিত সংস্কৃতব্যাকরণের উপক্রমণিকা, এবং ১ম, ২য় ও ৩য়ভাগ ব্যাকরণকৌমুদী অধ্যাপিত হইতে লাগিল। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক যে তিনভাগ ঋজুপাঠ প্রস্তুত হইল, তাহাও উহারই সঙ্গেসঙ্গে পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ বালক উপক্রমণিকাহইতে সংস্কৃত আরম্ভকরিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতেলাগিল দেখিয়া, ঐ সকল ভাষাব্যাকরণপাঠের পর সংস্কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠনা হইবে, পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর আর বড় মনোযোগ করিলেন না! যাহাহউক বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত নূতনপ্রণালীর সফলতাসন্দর্শনে এডুকেশন কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিনাপ্রার্থনায় ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি হইতে তাঁহার বেতন ১৫০ হইতে ৩০০ টাকা করিয়াদিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকালেজের তাৎকালিক নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহারই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে [১৯১১ সং] কালিদাসপ্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া বাঙ্গালাশকুন্তলা রচনাকরেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে বেথুনসাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহের ভার গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ডালহৌসি স্বহস্তে গ্রহণকরিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবের উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। এই উপলক্ষে হেলিডেসাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। পরিচয়দিবসাবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে যখন্ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মফস্বলে বাঙ্গালা ও ইঙ্গরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিতকরা রাজপুরুষদিগের অভিমত হয়, তৎকালে হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে, তাঁহার মতে যেপ্রণালীতে বাঙ্গালাশিক্ষা হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট দিতে বলেন। তদনুসারে তিনি এক প্রণালী প্রস্তুতকরিয়া সাহেবের নিকট অর্পণ করিলে, সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া লয়েন, এবং অতিরিক্ত ২০০ টাকা বেতন দিয়া তাঁহাকে এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টরের পদপ্রদানপূর্ব্বক হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া এই চারি জেলায় কতকগুলি বাঙ্গালা মডেলস্কুল স্থাপন করিতে অনুমতি করেন। ঐ সকল আদর্শবিদ্যালয় এবং অপরাপর বাঙ্গালাবিদ্যালয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতকরিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অধীনে কলিকাতায় এক নর্ম্মালস্কুল স্থাপিত হয়। এই অবধি তিনি কলিকাতা সংস্কৃতকালেজ, নর্ম্মালস্কুল, চারিজেলার মডেলস্কুল ও কলিকাতাস্থ বাঙ্গালাপাঠশালার তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলায় ৪০টীর অধিক বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। মফস্বলে বালিকা-বিদ্যালয়স্থাপনের এই প্রথম সূত্রপাত। এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতেই পাওয়াযাইবে, পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল, কিন্তু পরে তাহা না হওয়ায়, চাঁদাদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সেই চাঁদায় তিনি স্বয়ংও কিছু দিতেন এবং লেডিকানিঙ, সর্ সিসিল বীডন, সর্ উইলিয়ম গ্রে এবং পাইকপাড়ার রাজা ৺প্রতাপনারায়ণসিংহ প্রচুর-পরিমাণে সাহায্যকরিতেন।

অতঃপর বিদ্যাসাগর এক গুরুতরকাণ্ডে ব্যাপৃত হইলেন। পতির মৃত্যুহইলে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাথাকায় হিন্দুবিধবাদিগের যেসকল ক্লেশ; যেসকল দুরবস্থা ও যেসকল অনিষ্টসজ্ঘটনা হইয়াথাকে, তদ্দর্শনে বিদ্যাসাগরের সদয় অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ব্যথিত থাকিত। তিনি অনেকদিন হইতে ঐবিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন। শাস্ত্রে যে, বিধবাবিবাহের বিধি আছে, ইহা তাঁহার পূর্ব্বে বোধছিল না। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিধবাবিবাহ যে, বিশুদ্ধযুক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তদ্বিষয়ে একপ্রবন্ধ লিখিবেন, এবং তাহাতে, মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যেসকল কার্য্য বিহিত ও নিষিদ্ধ আছে, তৎসমুদের উল্লেখ করিয়াদেখাইবেন যে, হিন্দুদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ উক্ত সংহিতার এত বিধি ও এত নিষেধ আমরা প্রতিপালন করিনা; —যদি অকারণে সেসকল লঙ্ঘন করিয়াও আমাদের জাতিপাত বা অধর্ম্ম নাহয়, তবে এতাদৃশ প্রবলকারণসত্ত্বে বিধবাবিবাহনিষেধরূপ একটী নিয়ম লঙ্ঘনকরিয়া কেন আমরা অধার্ম্মিক বা জাতিচ্যুত হইব? ইত্যাদি যুক্তি ঐ প্রবন্ধে লিখিত হইত। যাহাহউক, একদা 'কলৌ-পারাশরাঃ স্মৃতাঃ' পরাশর সংহিতার এই বচনাংশ দর্শনকরিয়া হঠাৎ তাঁহার সমগ্রপরাশরসংহিতাদর্শনে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং পরাশর-সংহিতা খুলিয়া দেখেন যে, তাহাতে বিধবাবিবাহবিধায়ক——

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতি রন্যো বিধীয়তে"॥

এই স্পষ্ট বচন আছে। এই বচন দর্শন করিয়া চিরাভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া বিদ্যাসাগরের আনন্দের আর সীমা রহিলনা। তিনি ঐ বচন ও অন্যান্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে "বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত কি না?" এই নামে একখানি পুস্তকপ্রচার করি-লেন। এই পুস্তক পাঠকরিয়া হিন্দুসমাজে একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া-

গেল। প্রাচীন সম্প্রদায়ের হিন্দুরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক খৃষ্টিয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন; অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এবং অনেক ধনবান্ লোকে ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের সাহায্যে, বিধবাবিবাহনিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহকরিয়া বিদ্যাসাগরলিখিতপুস্তকের উত্তরস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তকে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ গালীবর্ষণেরও ত্রুটি ছিলনা। প্রায় সকল সংবাদপত্র হইতেই বিদ্যাসাগরের উপর অনবরত প্রস্তরবৃষ্টি হইতেলাগিল। কিন্তু মহামনা বিদ্যাসাগর অবিকৃতচিত্তে সে সমুদয় সহ্য করিয়া ঐ বৎসরেই বিধবাবিবাহসংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারকরিলেন। ঐ পুস্তকে এরূপ পাণ্ডিত্য ও এরূপ গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রতিপক্ষদিগের প্রদত্ত সর্ব্ববিধ আপত্তির খণ্ডন করিলেন, এরূপ নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রার্থের মীমাংসা করিলেন ও দুর্বিগাহ শাস্ত্রীয় বিচারসকল এরূপ সরল ও মধুর ভাষায় রচনাকরিয়া জলবৎ সহজ করিয়াদিলেন যে, তাহা পাঠকরিয়া সকলেরই বিদ্যাসাগরকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া বোধহইল। যাহাহউক এই দ্বিতীয়পুস্তক বহির্গত হইলে অনেক কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরও মনে, বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা অন্ততঃ অপরিস্ফুটরূপেও প্রতীয়মান হইল। এক্ষণে বিদ্যাসাগর পুস্তকরচনায় নিবৃত্ত হইয়া—কিরূপে বিধবাবিবাহ কার্য্যে পরিণত হইবে, তদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরকৃত কোন কর্ম্মই অঙ্গহীন থাকিবার নহে। পাছে বিধবাবিবাহে উৎপাদিত সন্তানগণের উত্তরকালে ধনাধিকারবিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ হয়, এই জন্য তিনি ঐবিষয়ে এক আইন প্রস্তুত করাইতে উদ্যোগী হইলেন। সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপালী কর্ম্মের উপলক্ষে সর্ জেম্‌স্ কল্‌বিল, জে আর কলবিন, জে. পি. গ্রাণ্ট, সিসিল বীডন প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদিগের নিকট বিদ্যাসাগর পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন। বিদ্যাসাগর ঐ সকল

সাহেবদিগের সাহায্যে এবং ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর ৺রামগোপাল ঘোষ ৺রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের উদ্যোগে কলিকাতার বিধিদায়িনী সভা হইতে এই মর্ম্মে এক আইন পাস করাইলেন যে, বিধবাবিবাহে উৎপাদিত সন্তানেরাও হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী হইবে'। এই আইনকে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন কহে।

অনন্তর বিধবাবিবাহের প্রকৃত চেষ্টা হইতে লাগিল। বিধবাবিবাহে কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া অনেক প্রধান প্রধান লোকে পার্চমেণ্টে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্যে সাহায্য করিবার অর্থের জন্য চাঁদা হইতে লাগিল এবং মুর্শীদাবাদ জিলার তাৎকালিক জজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৭৭৮ শকের ২৩এ অগ্রহায়ণে এক বিধবাকামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিলেন। ইহার পর ২।১টী করিয়া বিধবাবিবাহ হইতে লাগিল। যাহাহউক ঐ সময়ে দেশের সকল সমাজেই কেবল বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত কথারই ঘোরতর আন্দোলন হইতে লাগিল, স্থানবিশেষে স্বপক্ষ-বিপক্ষদিগের গালাগালি মারামারি প্রভৃতিও আরম্ভ হইল এবং দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখেই বিদ্যাসাগরের নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত দাশরথিরায় বিধবাবিবাহের একপালা পাঁচালী রচনা করিয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন; বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত নানাবিধ গান পথে—ঘাটে—মাঠে—সর্ব্বত্রই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; এবং শান্তিপুরে "বিদ্যাসাগর পেড়ে" নামক একপ্রকার বস্ত্র উঠিল। উহার প্রান্তভাগে নিম্নলিখিত গীতটী সংনিবদ্ধ ছিল ——

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীব হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥

কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন, দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—বিধবারমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম; মনের সুখে থাকব মোরা মনোমত পতি লয়ে॥

এমন দিন করে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে, আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখ্‌বে তাই——আলোচাল কাঁচকলা মালসার মুখে দিয়ে ছাই ;———এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে ॥ ”

এই সকল বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর গ্রন্থরচনায় বিরত হয়েন নাই। ঐ ১৮৫৬ খৃঃ অব্দেই তিনি দুই ভাগ বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, কথামালা সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এই ৫ খানি পুস্তক রচনা করেন। প্রথম ৪ খানি মডেল স্কুলের বালকদিগের পাঠার্থ রচিত হয়; ৫ম খানি কলিকাতাস্থ বেথুন সোসাইটী নামক সমাজে পঠিত ও পশ্চাৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়েই তিনি কিছুকালের জন্য কলিকাতাস্থ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। এবং সেইকালে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় মহাভারতের উপক্রমনিকাভাগ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই ১৮৬০ খৃঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাসাগর বড় তেজস্বী; তিনি সংসারবিদ লোক নহেন। নিজের অভিমত কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমোদন না করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে ‘ ফিকির জুকির ’ করিয়া কাজ আদায় করিয়া লওয়া বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সুতরাং এইরূপে অব্যাহতপ্রভাবে কিছুকাল কর্ম্মকরার পর নানাকারণে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং সেই বিরক্তিনিবন্ধন ১৮৫৮ খৃঃঅব্দে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন!

আজি ১৫ বৎসর হইল বিদ্যাসাগর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দে সীতার বনবাস ও ব্যাকরণকৌমুদীর চতুর্থভাগ, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মল্লিনাথ টীকাসংস্কৃত মেঘদূতের পাঠাদিবিবেক, পীড়িতাবস্থায় বর্দ্ধমানে অবস্থিতিকালে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ভ্রান্তিবিলাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ ১৮৭১ খৃঃ অব্দে উত্তররামচরিত ও অভিজ্ঞান শকু-

ন্তল নাটকের টীকা এবং 'বহু-বিবাহ হওয়া উচিত কি না' এতদ্বি-ষয়ক প্রস্তাব এই কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রকাশিত পুস্তকগুলি ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি পুস্তক আছে, তাহা এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়নাই। কর্ম্মত্যাগ করার পর এই কয়েক বৎসর মধ্যে সর্ব্বদাই তাঁহাকে অস্বাস্থ্যজন্য কষ্ট পাইতে হই-য়াছে, তন্নিমিত্তই হউক, অথবা নানাকারণে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট বহুলোকের সমাগম হয়, তন্নিবন্ধন অবকাশাভাবেই হউক, তিনি আশানুরূপ অধিক পুস্তক রচনা করিতে পারেননাই। ঐ লোকসমা-গমবিঘ্ননিবারণের জন্য তিনি কখন কখন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করেন, কিন্তু তথা হইতেও নানাকার্য্যে সর্ব্বদাই কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার অনেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়।

এস্থলে অনেকের মনে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বিদ্যাসাগর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কিরূপে চলে?—ইহার উত্তর এই—সরস্বতীর প্রসাদে তাঁহার সে বিষয়ে কোন কষ্ট নাই। কলিকাতার 'সংস্কৃত প্রেস' নামক ছাপাখানা ও স্বরচিতপুস্তকবিক্রয়, এই উভয়ে তাঁহার বার্ষিক যথেষ্ট আয় আছে। অন্য লোক হইলে সেই আয়ে বিলক্ষণ বিষয় করিয়া লইত; কিন্তু বিদ্যাসাগর সে ধাতুর লোক নহেন—তিনি যাহা পান, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। এমন কি, তিনি অদ্যাপি স্বগ্রামস্থ ইঙ্গরেজিসংস্কৃতবিদ্যালয়ের জন্য ২০০৲, ডাক্তার-খানার জন্য ৬০৲, বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য (১/২) ৮ এবং গ্রামস্থ অ-নাথ ও নিরুপায় লোকদিগের সাহায্যার্থ ন্যূনাধিক ৫০৲ টাকা মাসে মাসে নিয়মিতরূপে দান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নৈমিত্তিক ব্যয়ও আছে। উদাহরণস্বরূপ তাহার একটার উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কিয়দ্দিন হইল তিনি ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকারের সামা-জিক বিজ্ঞানসভায় ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন!—দেশের বড় বড় ধনবান্ লোকেরা কয় জন ঐ কার্য্যে অত দান করিতে পারিয়াছেন?—

বিদ্যাসাগরের এইরূপ অদ্ভুত দান দর্শনে কেহ এরূপ মনে না করেন যে, বিদ্যাসাগর একজন ধনশালী লোক—তাহা নহে। তাঁহার কিছুমাত্র সঞ্চিত ধন নাই—প্রত্যুত বিধবাবিবাহের জন্য তিনি কিছু ঋণগ্রস্তও আছেন। সে বৎসর হিন্দুপেট্রিয়ট্, সোমপ্রকাশসম্পাদক প্রভৃতির প্রোৎসাহনায় সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া সেই ঋণ পরিশোধের প্রস্তাব হয়, দেশের নানাস্থানে চাঁদাসংগ্রহের জন্য সভা-স্থাপনাদি হইতে থাকে এবং অনেকে যথার্থ উৎসাহ ও আহ্লাদ-সহকারে ঐ কার্য্যে ব্রতী হয়েন। বিদ্যাসাগর তৎকালে বাটী গিয়াছিলেন, তিনি তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়াই মহাতেজস্বিতাসহকারে সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াদিলেন যে, 'আমার অনবস্থানকালে আমার বন্ধুবর্গেরা যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমার অনুমোদিত নহে, তাঁহারা আমার যত টাকা ঋণের কথা শুনিয়াছেন, বাস্তবিক আমার তত অধিক ঋণ নহে এবং যাহা কিছু ঋণ আছে, তদর্থ এরূপ সাধারণের সাহায্য প্রার্থনাকরি না'।—আমরা তাঁহাকে ঐ ঋণের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, উহা ক্রমশঃ পরিশোধিত হইতেছে; যাহা কিছু আছে তজ্জন্য তিনি ভীত নহেন।

বিদ্যাসাগরের ৪ কন্যা ও একমাত্র পুত্র। পুত্র শ্রীযুতনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১২৭৭ সালের ২৭এ শ্রাবণ এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়া কেবল পরকে মজাইতেছেন, এই কথা পূর্ব্বে যাঁহারা বলিতেন, এক্ষণে নারায়ণের বিধবাবিবাহদ্বারা তাঁহাদের সে মুখ বন্ধ হইয়াছে।

বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে বহুবিবাহবিচার পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের রচিত বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে যে, ৩০ খানি পুস্তক এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম সকল উল্লিখিত হইল। এই সকল পুস্তক দেশমধ্যে অতি বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি

যাঁহাদের কিছুমাত্র আদর আছে, তাদৃশ কোন পাঠকের নিকটই বোধহয় বিদ্যাসাগররচিত কোন পুস্তকই অপরিজ্ঞাত নাই। অতএব এ সকল পুস্তকের পৃথক্ সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে যে সুশ্রব্য সংস্কৃতশব্দসম্লিষ্ট বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিশুদ্ধ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল কারণ। বেতালপঞ্চবিংশতির পূর্ব্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালারচনাই ছিলনা। বিদ্যাসাগরই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। উহাঁর বেতালপঞ্চবিংশতিও প্রথম বলিয়া, বোধহয়, সবিশেষ প্রযত্নে বিরচিত হইয়াছে, এই জন্যই উহার রচনা যাদৃশ কোমল, মনোহর ও মধুবর্ষিণী হইয়াছে, বিদ্যা-সাগরেরও অন্য কোন পুস্তকের রচনা তাদৃশ হয়নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐ পুস্তক যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে বিদ্যাসাগরও ভাবিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস-সমন্বিত রচনা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালার উপযোগিনী হইবে। এই জন্যই প্রথমবার প্রকাশিত পুস্তকের একস্থানে—"উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল উৎফুল্ল ফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি মকর নক্র চক্র ভীষণ স্রোত-স্বতীপতি প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল" এইরূপ রচনা ছিল। কিন্তু ওরূপ রচনা বাঙ্গালার মধ্যে থাকা উচিত নহে, এই বোধ তাঁহার নিজেরই মনে পরে উদিত হওয়ায় এক্ষণকার সংস্করণে ওরূপ ভাগ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই বেতাল পঞ্চবিংশতি যেমন মধুররচনার, জীবনচরিত সেইরূপ ওজস্বিনী রচনার দৃষ্টান্তস্থল—"উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষা তাঁহার অভ্যুদয়াশাঙ্কুরার উচ্ছিন্ন করিল" ইত্যাদিরূপ প্রগাঢ়রচনা বোধহয় এপর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগরের হস্ত হইতেও এরূপ প্রগাঢ়রচনা আর বাহির হইল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃতশিক্ষাবিষয়ে

যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পূর্ব্বে অনেকদিন হইতেই ইঙ্গরেজিভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমূর্ত্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটে ঘেঁসিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর সর্ব্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই যে, কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকাদ্বারা ব্যাকরণের দুর্গমপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূলকারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠকরিয়া সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়নকরিতে হইলে এক্ষণকার সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে সংস্কৃত শিক্ষাকরা ঘটিয়া উঠিত? ফলতঃ বিদ্যাসাগরের যদি আর কোন কার্য্যও না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃতভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়ারূপ এই একমাত্র কার্য্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগররচিত সীতার বনবাসকে অনেকে "কান্নার জোলাপ" কহে। এই পুস্তকের কিয়দংশ মুদ্রিত হইলে আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, উহা ভবভূতিপ্রণীত উত্তররামচরিতের অনুবাদমাত্র। এই জন্য সীতারবনবাস সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া আসিলে অনেকদিন পর্য্যন্ত উহা দেখিতে আমাদের আস্থা হয় নাই; মনে হইয়াছিল যে, সংস্কৃত উত্তরচরিত আমাদের অধীত আছে, অতএব তাহার বাঙ্গালা অনুবাদপাঠে অধিক আর কি লাভ হইবে?— তথাপি কিয়দ্দিনপরে বিদ্যাসাগরের রচনা বলিয়া পুস্তকখানি একবার সমগ্ররূপে পড়িতে প্রবৃত্তি হইল এবং পড়িয়া দেখিলাম যে, উহার প্রথমাংশ উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদই বটে, কিন্তু অপর সমুদয়ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকার ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয়

নহে। বোধহয় উহার এমত একটী পঙ্‌ক্তিও নাই, যাহা পাঠকরিতে পাষাণেরও কণ্ঠরোধ ও হৃদয়দ্রব না হয়। করুনরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাহউক, আমরা ঐ পুস্তকপাঠকরিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের লেখনীই মধুময়ী; উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই মধুবর্ষী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে, ঐরূপ কার্য্যে ব্যবহারার্থ, তাঁহার স্বনামাঙ্কিত একটী স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশসম্পাদকদ্বারা অপ্রকাশ্যভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; লেখনী নির্ম্মাণকরাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু নানাকরণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই—ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদানকরিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না!

বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক বিদ্যাসাগরের নিতান্ত সরলরচনার উদাহরণস্থল। এতাবতা স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী—যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক গ্রহন করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই সেই পুস্তককে আদর্শস্বরূপ স্থিরকরিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহবিচার' নামক পুস্তকদ্বয় সারগর্ভ যুক্তিসমেত রচনার নিকষস্থল। বাঙ্গালা ভাষায় শাস্ত্রীয় বিচার করা এবং সেই বিচার সরলভাষাসহযোগে সাধারনের হৃদয়ঙ্গমকরিয়া দেওয়া, এ উভয়ই কঠিন ব্যাপার। বিদ্যাসাগর যে, কিরূপ পাণ্ডিত্যসহকারে ও কিরূপ চমৎকারিণী প্রণালীতে সেই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সেই সেই গ্রন্থ একবার অধ্যয়ন না করিলে কোন মতেই হৃদয়ঙ্গম

হইবার নহে। তন্মধ্যে বহুবিবাহবিচারে উচিতমত গাম্ভীর্য্যরক্ষার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে, একথা অনেকেই কহিয়া থাকেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহবিচারে যে, কোন অংশে কিছু ত্রুটি হইয়াছে, তাহা শত্রুরাও বলিতে পারেনা। ফলতঃ এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল, বহুদর্শিতা, সারগ্রাহিতা, মীমাংসকতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অশেষ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিতহইয়াছে। আমাদের একজন সুবিজ্ঞ আত্মীয় কহিয়াছিলেন, 'বিধবাবিবাহপুস্তকের শীর্ষস্থ পঙ্ক্তি-গুলি যথা—' পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়—বাগ্দত্তাবিষয় নহে,' ইত্যাদি অক্ষরগুলি ইঙ্গরেজির ইটালিক্ অক্ষরের ন্যায় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত"। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইমাত্র উত্তর করেন, "ইঙ্গরেজি জিওমেট্রির প্রতিজ্ঞাগুলি ইটালিক্ অক্ষরে আছে"! তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি যেরূপ অভ্রান্ত, অকাট্য যুক্তিপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণকরাহইয়াছে, বিধবাবিবাহপুস্তকের শীর্ষকস্থ পঙ্ক্তিগুলিও তৎপরবর্ত্তী বিচারের দ্বারা সেইরূপে নিঃসংশয়িতরূপে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় পুস্তকেরই শীর্ষস্থ প্রতিজ্ঞাগুলি একবিধ অক্ষরে মুদ্রিতহওয়া উচিত"।

বাঙ্গালারচনায় বিদ্যাসাগরের এইরূপ অসাধারণশক্তিদর্শনেই সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা গর্ব্ব করিয়াছেন——

"কি কারণ তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান।
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥"

বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের দ্বারা বঙ্গভাষার যশের তুফানই উঠিয়াছে।

এস্থলে একটী বিস্ময় ও হাসির কথা না বলিয়া থাকাযাইতেছেনা। এক্ষণকার কৃতবিদ্য দলের কতকগুলি লোক এ ছেম বিদ্যাসা-

গরের রচনারও নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন!' তাঁহারা যে.. বাচনিক নিন্দা করিয়াই নিবৃত্ত, তাহা নহে, সংবাদপত্রেও বিদ্যাসাগরের রচনাকে "কর্দ্দয্য—ছাই ভস্ম!" বলিয়া উল্লেখকরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াগিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের ওরূপ নিন্দাদ্বারা সে ভক্তি কোন মতেই কমিবে না,—কেবল তাঁহাদিগেরই উপর অসূয়ী ও নিন্দক বলিয়া বোধ জন্মিবে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিচার্য্য যে, বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি যদি দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই এত ভক্তি জন্মিল, তবে উক্ত কৃতবিদ্যদলেরই তাহা না জন্মিল কেন?—এ প্রশ্নের উত্তরগুলি একটু গূঢ়;—পাঠকগণ স্থিরচিত্তে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই তাহা সমুদয় বুঝিতে পারিবেন। আমরাও একটা কথা প্রকাশকরি,—উক্ত কৃতবিদ্যদল বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি ভক্তি করেন না, এমত নহে—মনে মনে খুবই করেন। তবে কি না, তাঁহারা নিজের বাঙ্গালাভাষাশিক্ষাবিষয়ে উহাঁর রচনার নিকট—যতদূর হইতে পারে, ততদূর—ঋণী। মনুষ্যজাতির স্বভাব যাঁহারা উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিবেন, 'আমরা যাহার নিকট অত্যধিক উপকৃত হই, তাহাকে দেখিতে পারিনা—তাহার প্রতি দ্বেষ করি'। অতএব উল্লিখিত কৃতবিদ্যদলের বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতি যে দ্বেষ, তাহাও এই কারণসম্ভূতভিন্ন আর কিছুই অনুমান হয়না।

অপর এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের বাঙ্গলারচনানৈপুণ্যবিষয়ে অদ্বিতীয়তা অস্বীকারকরেন না, কিন্তু কহেন, 'বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা (Originality) নাই—অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদভিন্ন মূলগ্রন্থরচনা করিতে পারেন না'। একথা একদিন বিচার্য্য বটে। বিদ্যাসাগররচিত যেসকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা

হইয়াছে, তাঁহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবাবিবাহসংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়কপ্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনাকরিয়াছেন, তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনাপ্রণালী পাঠকদিগের সুবিদিত থাকিলেও আমাদিগের অবলম্বিত রীতিঅনুসারে বিধবাবিবাহ পুস্তকের উপসংহারস্থ শেষঅংশটী নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়নকরিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলনকরিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিরাকরণকরিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষাব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারাযায়না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কারবিসর্জ্জন দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরসহৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার-দোষের ওভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্তকরিতে সম্মত নহ! তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণহইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধহয়না, যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধহয়না, দুর্জ্জয় রিপু সকল এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যেনিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণপ্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই; কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে!

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!!!।”

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্তপ্রণীত চারুপাঠ প্রভৃতি।

বাঙ্গালা গদ্যরচয়িতাদিগের গুণানুক্রমে নামকরিতে হইলে বিদ্যাসাগরের পরই শ্রীযুতঅক্ষয়কুমারদত্তের নামোল্লেখ করিতে হয়। ইনি ১৭৪২-শকের শ্রাবণমাসে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ‘চুপী’ নামক

গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺পীতাম্বর দত্ত। অক্ষয়কুমার, বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া কিঞ্চিৎ পারসী অধ্যয়নকরেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা-খিদিরপুরে অবস্থান করিতেন। অক্ষয়কুমায় ১০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে তথায় গমন করিয়া ইঙ্গরেজিশিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবান্ হয়েন এবং ইহাঁর উহার নিকট পড়া বলিয়া লইয়া বাটীতে বসিয়াই ইঙ্গরেজি শিখিতে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সে অধ্যয়নে বিশেষ কোন ফললাভ হইত না, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই ক্ষুন্নমনা থাকিতেন। তাঁহার পিতা এরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন না যে, তাঁহাকে কোন বিদ্যালয়ে রীতিমত পড়াইতে পারেন। যাহা হউক অনন্তর তাঁহার কোন আত্মীয়ের অনুগ্রহে কলিকাতার গৌর-মোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টল্ সেমিনারি' নামক বিদ্যালয়ে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি অধ্যয়নকরিতে পান এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও নিরতিশয় পরিশ্রমসহকারে ২॥০ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় একপ্রকার জ্ঞানলাভ করেন।

অতঃপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে অর্থার্জ্জনের চেষ্টার জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ত্যাগ করিয়াও বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ঐ অবস্থাতেও স্বয়ং অনু-শীলন করিয়া এবং ২ | ১ জন কৃতবিদ্যলোকের সাহায্য লইয়া সমুদয় ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কোনিক্ সেক্সন, ক্যালকুলস্ প্রভৃতি গণিত, ঐ গণিতজ্ঞানসাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও তৎসহ ইঙ্গরেজি সাহিত্যবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের অনু-শীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে ঐ সকল অধ্যয়নদ্বারা সে অনুরাগ কতকদূর চরিতার্থ হইল।

অক্ষয়বাবু অর্থার্জ্জনের চেষ্টারজন্যই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন,

কিন্তু সে বিষয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্য আয়ের নিমিত্ত সামান্যকার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাকে অনেকদিন থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে, যাহাতে স্বদেশীয়দিগের বিশেষ উপকার হয়, তদ্বিষয়ক প্রবন্ধরচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু ইঙ্গরেজিভাষায় সুনিপুণ হইয়া তদ্ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে বিশেষ ফললাভ হইবে না, ইহা তিনি বুঝিয়া বাঙ্গালারচনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদ্বিষয়ে সম্যক্ সমর্থ হইবারজন্য কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিক্ষা করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় পদ্যরচনারই অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, এই জন্য তিনিও প্রথমে পদ্যরচনা করিতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহার অনুরোধে গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিয়দ্দিনপর্য্যন্ত নানাবিষয়ক গদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভাকরপত্রেই প্রকাশ করেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই যে তত্ত্ববোধিনীসভাপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৭৬৫ শকের [১৮৪৩ খৃঃ অ] ভাদ্রমাসহইতে শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে ঐ সভাহইতে 'তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেলাগিল। ইতিপূর্ব্বেই অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীসভার এক সভ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতাকার্য্যে ব্রতীহইয়া ১৭৭৭ শকপর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল অবাধে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালাগদ্যরচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হয়। দেশের হিতকর, সমাজের সংশোধক, বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক কত কত জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ যে, তৎকালে ঐ পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার সঙ্খ্যা নাই। চারুপাঠ ধর্ম্মনীতি

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তকসকলের অধিকাংশই সর্ব্বপ্রথমে ঐ পত্রেই প্রচারিত হয়। তাঁহার ঐ সকলরচনা পাঠকরিবার জন্য গ্রাহকেরা ব্যগ্রভাবে পত্রিকাপ্রকাশের দিনের প্রতি প্রতীক্ষাকরিয়া থাকিতেন এবং অনেকে তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন আচার ব্যবহারের সংশোধন করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীপত্রিকাসম্পাদন দ্বারা অক্ষয়বাবুর আয় কিছু অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তরপরিহারপূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতিবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফলকরণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইঙ্গরেজিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসীভাষা শিক্ষাকরেন, এবং মেডিকালকালেজে গমনকরিয়া দুই বৎসরকাল রসায়ন ও উদ্ভিদশাস্ত্রের উপদেশগ্রহণ করেন। ফলতঃ এই সময়ে তিনি আপনার উন্নতি, বাঙ্গালাভাষার উন্নতি ও পত্রিকার উন্নতিজন্য এতাদৃশ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার জীবনসহচর ভয়ঙ্কর শিরোরোগের উৎপত্তি হইয়াগিয়াছে!

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়া মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতানর্ম্মালস্কুলের প্রধানশিক্ষকেরপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত পীড়ার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় সে কার্য্যে কোন বিশেষ যোগ্যতাপ্রদর্শন করিতে পারেননাই। ২।৩ বৎসরমাত্র তথায় তিনি ছিলেন কিন্তু তাহারও অধিককাল পীড়াবকাশেই যাপিত হইয়াছিল। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, উল্লিখিত পীড়া অক্ষয়বাবুকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়াফেলিয়াছে! তিনি নর্ম্মালস্কুল ত্যাগকরিয়া এপর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে পীড়ার যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন এবং পল্লীগ্রামে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় বালীগ্রামে একটী বাটী করিয়া বাস করিতেছেন।

অক্ষয়বাবুর রচনানৈপুণ্য দর্শনে সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা গর্ব্বিতবচনে কহিয়াছেন—

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয়যশের মালা পরাইবে মায়॥"

বঙ্গভাষার এ গর্ব্ববাক্য নিষ্ফল হয়নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রিয়পুত্র অকালে ওরূপ রোগগ্রস্ত না হইলে তাঁহার মুখ আরও উজ্জ্বল হইত।

অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি হইতে সংগ্রহকরিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনভাগ চারুপাঠ, দুইভাগ বাহ্যবস্তুরসহিতমানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা ও ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় এই কয়েকখানি পুস্তক এপর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় ভাগ চারুপাঠের বিষয়ে কোন কথা বলাই আবশ্যক হইতেছে না। কারণ এই দুইখানি পুস্তক দেশমধ্যে এত প্রচলিত ও এত লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে যে, ইহাদের প্রশংসা করিলে লোকের অনুরাগ আর যে বাড়িবে তাহার সম্ভাবনা নাই; নিন্দাকরিলে ত লোকে আমাদিগকেই হেয়জ্ঞান করিবে। এই দুই পুস্তকে প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটী পূর্ব্বে সংবাদপ্রভাকরেও কতকগুলি তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি গ্রন্থকার এই পুস্তকের জন্যই নূতন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়মও বাস্তবপদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে, কত নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করাযায়না। গ্রন্থকার ইঙ্গরেজি গ্রন্থহইতেই ঐ সকল বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন, সত্যকথা; কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইঙ্গরেজির অনুবাদ? বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূল-

রচনাই হইয়াযাইত। অক্ষয়বাবুর সংস্কৃতশাস্ত্রে তাদৃশ অধিকার নাই, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, এসকল রচনা প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞের লেখনীহইতে নির্গত হয়নাই? তাঁহার রচনা যেমন সরল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞান... তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক এমন সরলভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠমাত্র সেসকল পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াযায়। অধিক আর কি বলিব, তাঁহার দুইভাগ চারুপাঠ বাঙ্গালা শিক্ষার্থী বালকদিগের জ্ঞানরত্নের অক্ষয়ভাণ্ডার স্বরূপ।

৩য়ভাগচারুপাঠও ১ম ও ২য় ভাগের সমানই কৃতার্থতালাভ করিয়াছে; জনসমাজে ইহারও আদরের সীমা নাই। তবে এখানি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রস্তাবগুলিতে কয়েকটী প্রগাঢ়বিষয়ের রূপকবর্ণনা আছে এবং তাড়িত, বিদ্যুত, বজ্রাঘাত, গ্রহণ, জোয়ার, ভাঁটা প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর প্রাকৃতিকঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থলেও, অক্ষয়বাবুর লেখনী যেরূপ সরলতাপাদন করিয়াথাকে, তাহা করিতে ত্রুটি করেনাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাবগাম্ভীর্য্য কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা উহার অন্তর্গত 'মিত্রতা' 'জীববিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা' এবং 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' নামক প্রস্তাব তিনটী অন্ততঃ একবারও পাঠ করেন।

১ম ও ২য় ভাগ বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার এবং ধর্ম্মনীতি এই তিনখানি একরূপ প্রকৃতির পুস্তক। তিনখানিরই প্রস্তাবগুলির এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনীপত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, পরে সেই সকল একত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের প্রতিপাদ্যবিষয়ও প্রায় একবিধ। জর্জ

কুম্বসাহেব 'কান্‌ষ্টিটিউষন্ অব ম্যান' নামক যে এক গ্রন্থরচনা করেন, তাহারই সারসঙ্কলনপূর্ব্বক দুইভাগ বাহ্যবস্তু রচিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিয়ম পালনকরিলেই সুখ, লঙ্ঘনকরিলেই দুঃখ,—জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যপালন সংক্রান্ত নিয়ম—কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার ও কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনকরিলে কিরূপ অপকার—ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের বিচার ও মীমাংসাসকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারিলে সংসারের অনেক দুঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি হয়—ইহা স্বীকার করাযাইতে পারে, কিন্তু সে সমুদয় যথোচিতরূপে পালনকরা কাহারও সাধ্য হয় কি না? তাহা সন্দেহস্থল। ধর্ম্মনীতিতেও শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা আছে। সে সকল বিষয় অভিনিবেশ-পূর্ব্বক পাঠকরিলে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, মন উন্নত হয়, অনেক কুসংস্কার দূর হয় এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা জন্মে। বাহ্যবস্তুতেও এই সকল বিষয়েরই অনেক উপদেশ আছে সুতরাং ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপস্বরূপ হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে এইখানিই অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধহয়। কারণ ইহাতে তত আড়ম্বর নাই—বাহ্যবস্তু অনর্থক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। রচনাও বাহ্যবস্তু অপেক্ষা ধর্ম্মনীতিতে অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লক্ষিতহয়। অক্ষয়বাবুর প্রায়সকল পুস্তকেই অনেক ইঙ্গরেজি শব্দ বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। সেগুলি সুন্দর হইয়াছে।

অক্ষয়বাবু সকল পুস্তকেই 'পরম কারুণিক' 'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল জিনিষ বটেন, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তাস্‌টী পড়িলেই ঈশ্বর চুপ্ করিলেন, পাতাটী নড়িলেই—

ঈশ্বর হাই তুলিলেন, পাখীটী উড়িলেই—ঈশ্বর ফুড়ুৎ করিলেন—ইত্যাদিরূপে সকল কার্য্যে ও সকল কথাতেই যদি লোককে ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহাহইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয়না। ঈশ্বর প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়—অমনতর খেলনার বিষয় নহেন। আমরা জানি, ঘন ঘন উল্লিখিত 'অত্যাশ্চর্য্য' 'অনির্ব্বচনীয়াদি শব্দের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে অনেক পাঠকে বিদ্রূপ করিয়াথাকেন'—ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশকরেননা।

'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' নামক পুস্তকখানি অক্ষয়বাবু অল্প দিনমাত্র প্রচারিত করিয়াছেন। এপর্য্যন্তের কথা বলিতে হইলে ইহাকেই তাঁহার শেষ গ্রন্থ বলিতে হয়। এইচ, এইচ, উইলসন্ সাহেব দুইখানি পারসীক ও কয়েকখানি হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক ইঙ্গরেজিভাষায় "রিলিজস্ সেক্ট্স অব হিণ্ডুস্" নামক যে প্রবন্ধ রচনাকরিয়া এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশকরিয়াছিলেন, এই পুস্তক সেই প্রবন্ধকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহারও অনেকগুলি প্রস্তাব পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেইগুলির সহিত অপর কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে ১০৬ পৃষ্ঠায় একটী দীর্ঘ উপক্রমণিকার যোজনা করিয়াছেন। ঐ উপক্রমণিকা তাহাতেও শেষ হয়নাই—যদি কখনও এই পুস্তকের ২য় ভাগ প্রকাশকরিতে পারেন, তাহাতে উহার শেষ করিবেন, আশা করিয়াছেন। এই উপক্রমণিকাটীই এই গ্রন্থের প্রগাঢ় ও সার পদার্থ। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যার—বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের—অনুশীলনদ্বারা লাটিন, গ্রীক, কেলটিক্, টিউটোনিক, লেটিক, স্লাবনিক, হিন্দু, পারসীক প্রভৃতি বিভিন্নবংশীয় বিভিন্নজাতীয়দিগের যে, একভাষিকতা, একজাতিকতা ও একধর্ম্মিকতার সংস্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয় বহুলপ্রমাণ-

প্রয়োগ ও উদাহরণসহকারে বিবৃতকরিয়া, কিরূপে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিক-ধর্ম্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয়, তাহা অতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক বহু বহু প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সকল সংস্কৃতাদি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে প্রত্যেক গ্রন্থ অধ্যয়নকরিতে হয়নাই— প্রফেসর বপ্ মোক্ষমুলর্ এবং উইল্‌সন্ প্রভৃতির রচিত ইঙ্গরেজি গ্রন্থ হইতেই প্রায় সমুদয় সঙ্গৃহীত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা করিতেও তাঁহার সামান্য বুদ্ধিমত্তা, সামান্য সারগ্রাহিতা ও সামান্য মীমাংসকতা প্রকাশিত হয়নাই। বৈদিক-ধর্ম্মের পর কিরূপে পৌরাণিক ও তান্ত্রিকাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, পীড়াবশতঃ গ্রন্থকার সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেপারেননাই। না পারুন তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার অক্ষয়যশের কারণ হইয়া রহিল। উপক্রমণিকার পর, ভারতবর্ষে বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি যে পাঁচটী সর্ব্বপ্রধান উপাসক সম্প্রদায় আছে, তাহাদের উল্লেখকরিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অবান্তরভেদে রামানুজ, কবীরপন্থী, চৈতন্য, কর্ত্তাভজা, বাউল, চরণদাসী প্রভৃতি যে ৪৭টী সম্প্রদায় সম্প্রতি প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলেরই ইতিবৃত্ত ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিবৃত্ত অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে আমাদের আর কিছু অধিক বক্তব্য নাই। গ্রন্থকার উপক্রমণিকার শেষভাগে অস্বাস্থ্যনিবন্ধন যেরূপ কাতরতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে মনোমধ্যে বড়ই ক্লেশ জন্মে সুতরাং ঐ অবস্থায় প্রকাশিত তাঁহার গ্রন্থের দোষভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্তিহয়না।

যাহাহউক এই পুস্তক পাঠের পর উইলসন সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত ইঙ্গরেজিপুস্তক পাঠকরিয়া আমাদের মনে কিছু লজ্জা ও ক্লেশ বোধ হইল। তাহার কারণ এই যে, আমরা কখন কখন ইঙ্গরেজ জাতির সমকক্ষ হইবার বাঞ্ছা করি, কিন্তু ভাবিনা যে, আমরা উঁহাদের অপেক্ষা কত বিষয়ে কত হীন! ইঙ্গরেজেরা আমাদের

দেশের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী সংগ্রহকরিয়া পুস্তকরচনা করিলেন, আমরা তাহারই প্রায় অনুবাদকরিয়া গ্রন্থরচনাপূর্ব্বক সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন হইলাম!!

শ্রীযুতমাইকেলমধুসূদনদত্তের শর্ম্মিষ্ঠানাটিকপ্রভৃতি।

শ্রীযুতমাইকেল মধুসূদনদত্ত আজি কালি অনেকের মতে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। অনুমান ১৭৫০ শকে জিলা যশোহরের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাগরদাঁড়ি নামক গ্রামে কায়স্থকুলে মধুসূদনদত্তের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা ৺রাজনারায়ণদত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতী করিতেন। মধুসূদন তাঁহারই নিকট অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতার হিন্দুকালেজে ইঙ্গরেজি অধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হয়েন এবং ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই জাতীয়ধর্ম্মকে অসার বোধকরিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনকরেন। ইনি পিতার একমাত্রপুত্র, সুতরাং অন্ধের যষ্টির ন্যায় জীবনের অবলম্বন ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে সেই অবলম্বনচ্যুত হইয়া দত্তজমহাশয় সংসারকে যে, কিরূপ অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনকরা বাহুল্য। তিনি ওরূপ অবস্থাতেও মায়াত্যাগ করিতে না পারিয়া ৪বৎসর পর্য্যন্ত খরচ পত্র দিয়া পুত্রকে বিষপ্-কালেজে অধ্যয়নকরাইয়াছিলেন। অনন্তর মাইকেল্ কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগকরিয়া মান্দ্রাজে অবস্থান করেন এবং তথায় বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ করিয়া ইউরোপীয় পত্নীসমভিব্যাহারে এদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের পর অবধি বাঙ্গালাগ্রন্থরচনা করিতে ইহাঁর প্রবৃত্তি জন্মে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনাকরেন। অনন্তর আইন শিক্ষার অভিলাষে ইংলণ্ডযাত্রা করেন এবং তথায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। এক্ষণে মাইকেল মহাশয়

কলিকাতার হাইকোর্টে বারিষ্টরের কার্য্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি পুস্তকও লিখিতেছেন।

তিনি প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত শর্ম্মিষ্ঠানাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারীনাটক, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী ও হেক্টরবধ এই ১১খানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। এত বড়লোকের রচিত এতগুলি গ্রন্থের তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনাকরা সাধারণ কথা নহে, এবং করিলেও আমাদের এ ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাহার স্থানসমাবেশ হওয়া অসম্ভব, এজন্য সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া স্থূলরূপে কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী, কবিবর এই তিনখানি নাটক রচনাকরিয়াছেন, তন্মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠাই তাঁহার প্রথম চেষ্টার ফল। চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি, শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী ও দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সংক্রান্ত যে উপাখ্যান মহাভারতে বর্ণিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি এই যে, উহাতে নাটকীয়পাত্রেরা একবারে প্রবিষ্ট হয় না। উহার প্রথমে প্রস্তাবনা নামে একটী প্রকরণ থাকে—সেই প্রকরণে সূত্রধার, নট, নটী বা বিদূষক সমবেত হইয়া আপনাদের নিজ নিজ কথাপ্রসঙ্গে নাটকীয় বস্তুর অবতারণা করে—তৎপরে সেই সূত্রে নাটকীয় পাত্র আসিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়। এক্ষনকার চলিতযাত্রার বাসুদেবী, কালুয়া ভুলুয়া, মেথরাণী বা ভিস্তীওয়ালার কাণ্ড যেরূপ, সংস্কৃতনাটকের প্রস্তাবনাও সেইরূপ। তবে চলিতযাত্রাওয়ালারা সহৃদয়তার অভাবে বাসুদেবী প্রভৃতির সহিত প্রধানযাত্রার কোন সম্বন্ধই রাখিতে পারে না, কিন্তু সংস্কৃতনাটকে তাহা হয় না—প্রস্তাবনার সহিত মূল নাটকের বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকে এবং সেই সম্বন্ধ স্থানবিশেষে যে, কিরূপ রমণীয় হয়—যাঁহারা শকুন্তলা, রত্নাবলী, বেণীসংহার ও মুদ্রা-

রাক্ষস নামক সংস্কৃতনাটকের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। ইঙ্গরেজি নাটক এরূপে আরদ্ধ হয় না—উহাতে প্রস্তাবনা নাই—রঙ্গস্থলে একেবারেই নাটকীয় পাত্র প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালিভাষায় যে সকল নাটকরচনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে গ্রন্থকারের রুচিঅনুসারে ঐ দুইরূপ প্রণালীই অনুসৃত হইয়াথাকে। এইজন্য আমরা ঐ দুইরূপ নাটককে পৃথক্রূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে "সংস্কৃতধরণী" ও "ইঙ্গরেজিধরণী" এই দুইটী পৃথক্ নাম দিলাম। ইতিপূর্ব্বে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব প্রভৃতি যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার রচয়িতারা সংস্কৃতজ্ঞলোক—সুতরাং সে সকলে সংস্কৃতধরণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মাইকেলমহাশয়ের নাটক ইঙ্গরেজিধরণ ত্যাগকরিয়া যে, সংস্কৃতধরণী হইবে, তাহা সম্ভব নহে। শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁহার সকল নাটকই ইঙ্গরেজিধরণে আরব্ধ হইয়াছে। এই নাটকে শর্ম্মিষ্ঠার সুশীলতা, দেবযানীর উগ্রভাব ও বিদূষকের পরিহাসরসিকতা উৎকৃষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছে—তবে রাজা দেবযানীলাভে গদ্গদভাবে তাদৃশ আনন্দপ্রকাশ করিয়াও পরক্ষণেই যে আবার শর্ম্মিষ্ঠারপ্রতি সানুরাগ নয়নপাত করিয়াছেন, তাহা পবিত্রপ্রণয়ের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। আর বিদূষক নটী মাগীকে ডুইবার অনর্থক রঙ্গস্থলে আনিয়া যে নস্তানাবুদ করিয়াছে, তজ্জন্যও আমরা কিছু বিরক্ত হইলাম।

পদ্মাবতী, নাটকের উপাখ্যানটী কবির স্বকপোলকল্পিত। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, বিদর্ভনগরাধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল মৃগয়ার্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, দৈবক্রমে ইন্দ্রাণী শচী, যক্ষরাজপত্নী মুরজা ও কামকান্তা রতি তথায় গিয়া উপস্থিত হয়েন। নারদ তাঁহাদিগকে তথায় দেখিয়া কন্দল বাধাইবার অভিলাষে একটী স্বর্ণপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক কহেন যে, "তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তিনিই ইহা গ্রহণ করুন।" অনন্তর তাঁহারা আপন আপন সৌন্দ-

র্য্যের জন্য পরস্পর বিলক্ষণ বিবাদ করিয়া পরিশেষে রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানেন। ইন্দ্রনীল রতিকে সর্ব্বপ্রধান সুন্দরী বলিয়া দেওয়ায় শচী ও মুরজা ক্রুদ্ধ হইয়া যান্ এবং রতি প্রসন্না হইয়া মাহেশ্বরীপুরী-পতির কন্যা অলৌকিকরূপসম্পন্না পদ্মাবতীর সহিত ইন্দ্রনীলের বিবাহ দিয়া দেন। বিবাহের পর শচী ও মুরজার কোপে উভয়কেই বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, শেষে রতিদেবীর অনুকূলতায় সে সকল ক্লেশ দূর হয়।—স্বর্ণপদ্ম লইয়া রূপগর্ব্বিত দেবীগণের বিবাদের উপাখ্যানটী নূতন নহে। ট্রয়নগরের রাজপুত্র পারিসকে মধ্যস্থ মানিয়া এথেনা, জুনো ও বিনস্ দেবীর সুবর্ণআপেলসংক্রান্ত সৌ-ন্দর্য্যবিবাদমীমাংসার যে বিবরণ প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিবরণে প্রসিদ্ধ আছে, উহা তাহা হইতেই গৃহীত। তথাপি কবি উহাকে বাঙ্গালায় অতি মনোরমরূপে অবতারিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকে বিশেষ প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া-যায়না। সংস্কৃতনাটকের অনুকরণে ইহারও আদ্যোপান্তে বিদূষকের সংসর্গ আছে। তদ্ভিন্ন মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনাদি, মরীচিসকাশে শকুন্তলাসহ দুষ্মন্তের মিলনের অনু-কৃতি বলিয়াই বোধহয়। ফলতঃ শকুন্তলাপাঠের পরই যে, কবি এই নাটকরচনা করিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্টপ্রমাণ লক্ষিত হয়। এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গীত দৃষ্ট হইল। পদ্যগুলি নূতনপ্রকার—অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা পয়ারের প্রতি-অর্দ্ধের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এইজন্য উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলা-যায়—অমিত্রাক্ষরে সেরূপ মিল নাই। এই ছন্দ ইঙ্গরেজির মিল্টন্ প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করেননাই—মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তয়িতা, এবং পদ্মা-বতীনাটকই উহার প্রথম প্রয়োগস্থল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের উপাখ্যানটী কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল লইয়া রচিত। বোধহয়, রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" পাঠকরিয়াই কবির, ঐরূপ উপাখ্যানে, নাটকরচনা করিবার, প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। জয়পুরপতি জগৎসিংহ ও মরুদেশাধিপ মানসিংহ ইহাঁরা উভয়েই উদয়পুরাধিপতির দুহিতা কৃষ্ণকুমারীরপ্রতি আসক্ত হইয়া উদয়পুরের প্রতিকূলে ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলে রাজা তন্নির্ব্বাপণে আপনাকে অসমর্থ বোধকরিয়া, সর্ব্ববিবাদের মূলীভূত আপন আত্মজার প্রাণবিনাশে কৃতসংকল্প হয়েন এবং কৃষ্ণকুমারী তাহা জানিতে পারিয়া আত্মহত্যাদ্বারা সকল দিক্ বজায় রাখেন—ইহাই এই গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম। আমরা পুস্তকখানি পাঠকরিয়া পরম প্রীত হইলাম, বিশেষতঃ ধনদাসের লোভ ও ধূর্ত্ততা এবং মদনিকার চাতুরীবর্ণন বড়ই সুকৌশলসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল। এই নাটকের কোন কোন অংশে কিছু কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে হত্যাকরিবার পরামর্শে রাজা ও রাজভ্রাতার বিলাপ এবং আত্মহত্যাকরণসময়ে কৃষ্ণকুমারীর চিরবিদায়গ্রহণ পাঠকরিয়া আমাদের নয়ন এরূপ অশ্রুপ্লুত হইল যে, কোন বিষয়ই আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

সকল সংস্কৃত নাটকেরই উপসংহার শুভান্ত হয়—অশুভান্ত বর্ণন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইঙ্গরেজিকাব্যে অশুভান্ত ঘটনা অনেক দেখিতেপাওয়াযায়, এবং সেইগুলিই আবার তজ্জাতীয় কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওরূপ বর্ণনাপাঠ পূর্ব্বে আমাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু বোধহয় কালভেদে বা অবস্থাভেদে রুচিভেদ হইয়াথাকে—সুতরাং আমাদেরও রুচি কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এজন্য এখন আমরা বুঝিতেপারি যে, করুণরসের উদ্দীপনকরাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অশুভান্তঘটনার বর্ণনদ্বারা সে রস যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়—অন্য কোনরূপে সেরূপ হইতে পারে না। আরও

আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের আদিকাব্য রামায়ণ, সীতার পাতালপ্রবেশরূপ অশুভান্ত ঘটনাতেই পর্য্যবসিত। অথচ তাহা কোন আলঙ্কারিকেই অযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণকুমারীনাটক অশুভান্ত বলিয়া আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি বোধ হইল না।

'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এ দুইখানি প্রহসন—অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক ক্ষুদ্র অভিনেয় পুস্তক। ইহার প্রথমখানি কলিকাতাস্থ এক নববাবুর, সভা করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার ছলে, সুরাপানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপপ্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তম্মধ্যে এইখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্রগুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্য-রসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠকরিয়া দেখিবেন। সারজন্ ও বাবাজীর বৃত্তান্ত, জ্ঞানতরঙ্গিণীসভায় বক্তৃতা, সুরাপান ও খেমটার নাচ, কুলবালাদিগের তাসখেলা, প্রমত্ত নববাবুর প্রলাপ-শ্রবণে জননীর শঙ্কা প্রভৃতি বর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন আমাদের চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে। এক্ষণকার বাবুরা যে, কিরূপ ইঙ্গ-রেজিমিশ্রিত বাঙ্গালাভাষা ব্যবহারকরিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও ইহাতে প্রচুররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, একজন পল্লীগ্রামস্থ বৃদ্ধ জমী-দারের লম্পটতাবর্ণনসম্পৃক্ত। মাইকেলমধুসূদনদত্ত এমন সুসামাজিক লোক হইয়াও কি জন্য যে, এরূপ অসঙ্গত ও জঘন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলামনা। আমাদের বোধ আছে, গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্ম্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনীসংসর্গে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হয়েননা। ঐ কাণ্ড যৌবনের উ-দ্রেক সময়ে হইলেও কথঞ্চিৎ সম্ভব হইত—এ তাহা নহে—প্রাচীন

অবস্থায়! যে দোষ সমাজমধ্যে বহুলপ্রচার হইয়াউঠে, পরিহাসচ্ছলে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের দুরবস্থাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দোষের হেয়তাবোধসম্পাদনই প্রহসনরচনার উদ্দেশ্য; কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ জমীদারদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের বর্ণিতরূপ ভক্তপ্রসাদ কয়জন আছেন?—কৈ পাঠকগণ! ওরূপ জমীদার সচরাচর দেখিতে পান কি?—ফলতঃ এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামস্থ জমীদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে।

মাইকেলের নাটকসমালোচনার এই প্রসঙ্গেই আমাদিগকে আর একটী কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়াযায় যে, অনেকেই নাটকীয় অঙ্ক সকলের প্রথমে ‘প্রথম গর্ভাঙ্ক’ ‘দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক’ ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াদেখিলাম যে, সেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবান্তর ভাগ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল ভাগ ‘গর্ভাঙ্ক’ শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। কারণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা গর্ভাঙ্ক শব্দের অন্যরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন—সাহিত্যদর্পণকার লেখেন যে, অঙ্কের মধ্যেই রঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলোৎপত্তি-সমেত যে, অপর এক অঙ্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই গর্ভাঙ্ক বলাযায় *। এতদুক্তলক্ষণ গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকার নাটকরচয়িতাদিগের গর্ভাঙ্কের একতা হয়না।

তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ এই দুই খানি কাব্য আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাব্যরচনার প্রারম্ভ দুইরূপে হইয়া

---

* অঙ্কপ্রস্তাবাদ্যার্গর্ভাঙ্কমাহ। অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্। অঙ্কোঽপরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজঃ ফলবানপি॥—যথা বালরামায়ণে রাবণংপ্রতি কঞ্চুকী “শ্রবণৈঃ পেয় মনেকৈ দৃ শ্যংদীর্ঘৈশ্চ লোচনৈর্ব্বহুভিঃ। ভবদর্থমিব নিবদ্ধং নাট্যংসীতাস্বয়ম্বরণং”। ইত্যাদিনা বিরচিতঃ সীতাস্বয়ম্বরো নাম গর্ভাঙ্কঃ॥ ১২৭ পৃ।

থাকে—একরূপ এই যে, উপাখ্যানের মূল হইতে আরম্ভ করা;—দ্বিতীয় রূপ, কোন এক মধ্যস্থল হইতে আরম্ভকরিয়া ক্রমে সমুদয় বিবরণ প্রকাশকরা। এই দ্বিতীয় পদ্ধতি ইউরোপীয় কাব্যে সর্ব্বদা অনুসৃত হইয়াথাকে; গ্রীক্ কবি হোমরের ইলিয়াড্ রচনাই বোধহয় উহার মূল। সংস্কৃতেও যে, এই সমধিককৌতূহলজনিকা পদ্ধতির প্রচলন নাই, একথা বলাযায়না—সংস্কৃত নাটকমাত্রেই, দশকুমারচরিতনামক আখ্যায়িকায় এবং বিশেষ বিবেচনাকরিয়া দেখিলে রামায়ণ ও মহাভারতেও কিয়ৎপরিমাণে এই পদ্ধতিরই অনুসরণ দেখিতে পাওয়াযাইবে। যাহা হউক, এক্ষণে অনেকে ইহাকে ইঙ্গরেজিপদ্ধতি বোধকরেন, এই জন্য আমরাও উহার নাম ইঙ্গরেজিপদ্ধতি রাখিলাম। তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ উভয় কাব্যই এই ইঙ্গরেজিপদ্ধতিক্রমে আরব্ধ হইয়াছে। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের উপদ্রবে উৎপীড়িত সুরগণ তিলোত্তমানাম্নী অপরূপরূপা এক সুরসুন্দরীর সৃষ্টি করেন—দৈত্যদ্বয় তাহার রূপলাবণ্যে মোহিতহইয়া প্রত্যেকেই তাহাকে আপন প্রণয়িনী করিবার জন্য বিবাদ করে এবং সেই বিবাদে পরস্পর পরস্পরের কর্ত্তৃক হত হয়,—এই ভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়াই তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য বিরচিত হইয়াছে। ইহা ৪টী সর্গে বিভক্ত। এই পুস্তক প্রথমে বহির্গত হইলে আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠকরিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ করি। কিছু দিন পরে কাহার কাহারও মুখে ইহার প্রশংসা-বাদ শুনিয়া আবার ইহা পড়িতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু আবার ত্যাগ করি; এইরূপ ২।৩ বার করিয়াও গ্রন্থখানি একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারিনাই। আমরা প্রথমে ইহা পাঠকরিতে পারিনাই, বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে, তিলোত্তমা রসবতী নহেন;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস, কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দূরান্বয়, 'ভুষেন' 'অস্থিরি' 'কাস্তিল' 'কেলিমু' প্রভৃতি

মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদকরিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত এবং ইহা ৯ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূর্ণতা-সম্পাদনার্থ প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের বহুল অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে, সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে, কবিতাজননী অসাধারণী কল্পনাশক্তির বলে কবি, কত কত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদ-বিষয়ে বাক্‌প্রয়োগ করা বড় সহজ কথা নহে। বাঙ্গালাবিনোদী-দিগের মধ্যে এক্ষণে দুইটী বিশেষ দল হইয়াছে—এক দলের লোকে মেঘনাদের অতি প্রশংসাকারী,—কৃতবিদ্যগণই এই দলে অধিক। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে, তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম'—বলিলেই ঘুসী উচাঁইয়া আইসেন ; 'ন্দ' পর্য্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না ! আর এক দল না বুঝিয়াও অনর্থক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম ' গোঁড়া ' ও ' নিন্দক ' রাখিলাম—আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোলখাঁড়ের ন্যায় উভয়দলেই থাকিব। সুতরাং দুই-দলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে।

মেঘনাদবধ মাইকেলসাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠকরিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিতই মেঘনাদ যে, কত আনন্দের সহিত পাঠকরিয়াছি তাহা বলিতে পারিনা। সেতুদ্বারা বদ্ধ মহাসমুদ্র-দর্শনে রাবণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণসমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পতিদর্শনার্থ মেঘনাদপ্রিয়া প্রমীলার বহির্গমন,

অশোকবনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব্বপরিচয়দান, শ্রীরামের যমপুরী-দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠকরিলে মনোমধ্যে দুঃখ শোক উৎসাহ বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। বাঙ্গালায় বীররসাশ্রিত কাব্যের উচিতরূপ সম্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন, ইনি তাহা হয়েন নাই, ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্তপক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ—মর্ত্য—পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটীকে যেরূপ বীরপুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ রচনাটীকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটী উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। একজন কৃতবিদ্য কবি মেঘনাদের টীকা করিয়াছেন এবং আর একজন ইহার একখানি সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার গুণদোষব্যাখ্যা লইয়া যে, কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দ্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণদোষ যত দেখিতেপাওয়াগিয়াছে, ইহাতে তত দেখাযায়না সত্য বটে; কিন্তু দানিবু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ মাইকেলী ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তাছাড়া, 'দ্বিরদরদনির্ম্মিত' 'মরি, কিবা' 'হায়রে যেমতি' ইত্যাদি কতকগুলি কথায় এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সে গুলি দেখিলে হাস্যসংবরণ করিতে পারাযায়না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অর্থক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেকস্থলও আছে, যেখানে সেই অলঙ্কারগুলি অতি কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২। তটী

কথাদ্বারা উৎকৃষ্ট কবিরা যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পঙ্‌ক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটী দোষ এই, তিনি বোধহয়, অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করেন, এই জন্য তাঁহার রচনাও দুর্ব্বোধ হয়। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগদ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে ইহাতে তাহার কিছুই হয়নাই।

এস্থলে আর একটী বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ কহেন যে, 'মেঘনাদবধ যে, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পঙ্‌ক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায়না—এদিকে অমিত্রাক্ষরে ভাবপ্রকাশার্থ যতদূর ইচ্ছা, ততদূর যাওয়া যাইতে পারে সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয়না'—ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপ অস্বীকার করিনা কিন্তু ইহাও বলি যে, যখন কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষরতা রক্ষাকরিয়াও বীর-রসবর্ণনে অসমর্থ হয়েন নাই, তখন ইনিও চেষ্টা করিলে যে, অসমর্থ হইতেন, তাহা বোধহয়না। আমাদের বোধহয়, ইনি একটা নূতন-রূপ কাণ্ড করিয়া নাম বাহির করিবার ইচ্ছায়, এবং "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা কোলোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলাচ পৃথ্বী" এই ভবভূতির গর্ব্ববাক্য স্বয়ং প্রয়োগ করিবার বাসনারই, বশবর্ত্তী হইয়া এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইঙ্গরেজির অনুকরণপ্রিয় আমাদের কৃতবিদ্যদলও মিলটনের ছন্দের অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইল, দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবি যতই গর্ব্ব করুন এবং কৃতবিদ্য

দল তাঁহার যতই সমর্থন করুন—অসঙ্কুচিতমনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্য বলিব যে, অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ আমাদের অথবা একটী বিশেষ দল-ভিন্ন দেশের কাহারই প্রিয় হয়নাই। আমরা মেঘনাদবধের যে, ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে—কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?

মাইকেলের রচনা ও ছন্দের বিষয়ে দেশের লোকের যে কিরূপ অভিপ্রায়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ্যটীতে অনেক প্রকাশিত হইবে।

"ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।

দ্রুহিণ-বাহন সাধু, অনুগ্রহ নিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী-বজ্রনখ-আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্কক্ষ্মারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু আশুগ- ইরম্মদ গমে সন্ সনে।)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নাড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ-বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(ক্ষ্মাধ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।

কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাম্বজালয়ে--
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্ম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
সুবিরল তনূরুহে তনূ আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলি।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মুষিক-বপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ-চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায়রে যেমতি
চতুর্দ্দণ্ড সহযোগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম
অতি-ক্ষুদ্র, সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্য্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতস দ্রুমের কিম্বা সূচ্যগ্র তনিষ্ঠ
তথা ন্যুব্জ আকর্ষ্যগ্র ভাগ সমতুল।)
সুদীর্ঘ মস্তক, বসুমিত্রাস্য যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজী
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র-অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি, সুষমা কিসুন্দর!

ত্রপিষ্ঠা-তরুণ্যম্বক-তুল্য নেত্রযুগ ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক-মরীচি নিকর
অসহ্য সে দৃশে ;—হায় ত্বিষাম্পতি তেজঃ
দিবাভীত-নেত্র যথা নাপারে সহিতে।

পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুসতী গুরু বলি মানে ;
দাস-রাজ-তনয়া-সুরভিগন্ধি তব
শরীর-সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পরিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম
লইতেন পূতিগন্ধা-আখ্যান বিষাদে
(বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুহ্যবভ পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব।
জগতের হিতহেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিলা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?
পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—
মহেষ্বাস—উর্ম্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও, ধনী, যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিষ ক্রূর

মণ্ডূকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্র্যক্ষি-সম্ভবে;
কিম্বা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা।

ইতি ছুছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা নাম প্রথমসর্গ সমাপ্ত *।"

বীরাঙ্গণা কাব্য—এখানিও অমিত্রাক্ষরছন্দোনিবদ্ধ। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী প্রভৃতি ১১ জন অঙ্গনার দুষ্মন্ত, সোম, দ্বারকানাথ, দশরথ প্রভৃতি নিজ২ প্রিয়তমগণের নিকট লিখিত ১১খানি পত্রিকা লইয়া এই কাব্য বিরচিত। এই খানির রচনা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল;—কবিত্ব ইহাতেও যে, প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা বলা বাহুল্য। তিলোত্তমা ও মেঘনাদের ছন্দে যতিভঙ্গের যে সকল দোষ আছে, ইহাতে তাহাও অপেক্ষাকৃত কম। সে যাহাহউক, এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহস্পতিপত্নী তারা, বৃহস্পতিশিষ্য সোমের প্রতি অনুরক্তা হইয়া এক পত্র লিখিয়াছে; গুরুপত্নীগমন আমাদের শাস্ত্রানুসারে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য;—শিষ্যের সহিত গুরুপত্নীর মাতৃত্বসম্বন্ধ—যে সেই সম্বন্ধ লঙ্ঘনপূর্ব্বক পুত্রসম শিষ্যের প্রতি পাপানুরাগে মত্ত হইয়া তাদৃশ নির্লজ্জভাবে পত্র লিখিতে পারিয়াছে, কবি সেই কামোন্মত্তা পাপীয়সীকে কোন্ মুখে 'বীরাঙ্গনা' বলিয়া ডাকিলেন? এবং কোন্ লজ্জায় পতিব্রতাপতাকা শকুন্তলা ও রুক্মিণীর সহিত একাসনে উপবেশন করাইলেন?—ছিছি! লজ্জার কথা!!

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এক সর্গমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণবিরহাতুরা রাধিকার বিলাপস্বরূপ কয়েকটী গীত। রচনা বেশ কোমল ও মধুর বোধ হইল। মাইকেলীক্রিয়ার ভাগ ইহাতে অতি অল্পই আছে। কবি ইহাতে কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণাদির ন্যায় নিজের কবিত্বপ্রখ্যাপিকা ভণিতিও দিয়াছেন যথা——

মধু—যার মধুধ্বনি—কহে কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে পারে কি তোমা শ্রীমধুসূদন?॥

*১২৭৫শালের ১২ইআশ্বিনের অমৃতবাজারপত্রিকাহইতে উদ্ধৃত।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—কবি যৎকালে ইউরোপে গমন করিয়া ফরাসীস্ দেশস্থ ভর্সেল্স্ নগরে অবস্থান করেন, তৎকালে এই কাব্য রচিত হয়। কবির স্বহস্তলিখিত ইহার উপক্রমভাগ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হইয়াছে—তদ্দ্বারা তাঁহার হস্তলিপিদর্শনেচ্ছুগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের চতুর্দ্দশ পঙ্‌ক্তিতে একশতটী পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মাইকেলের যে সকল প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ আছে, সমুদয়ই ইহাতে সমভাবে লক্ষিত হইল। আমরা নিম্নভাগে উহার প্রথম প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিলাম—

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
কাটাইনু বহুদিন সুখপরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই! যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

হেক্টরবধ,— এখানি মাইকেলের গদ্য কাব্য। তিনি বিখ্যাতনামা হোমরের রচিত ইলিয়াড্ নামক কাব্য গ্রীক্ ভাষায় পাঠ করিয়া তাহারই উপাখ্যান বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। ইহাতে কবিত্ব প্রভৃতি

যাহা কিছু দায় পদার্থ আছে, তাহার অধিকাংশই, বোধহয়, মূল-কবির—অতএব তদ্বিষয়ে কোন কথাই বক্তব্য নাই—তবে সেই সকল কবিত্বাদি মাইকেল কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। আমরা সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অতীব দুঃখসহকারে কহিতেছি যে, তিনি এই পুস্তকখানির রচনাবিষয়ে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেননাই। মাইকেল নাটক ও পদ্য রচনাকরিয়া যে কিছু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার ভাল ছিল। তিনি আবার গদ্যকাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন কেন? এই কাব্য রচনায় না আছে চাতুর্য্য, না আছে লালিত্য, না আছে পাণ্ডিত্য। এই রচনায় ব্যাকরণকে পদদলিত করাই যেন রচয়িতার অভীষ্ট ছিল বোধহয়—নচেৎ রিপুস্তুদ, সিঞ্চন, বিপদার্ণব, মহামহা অক্ষৌহিণী, ব্যঙ্গতা ব্যক্তার্থে, মনান্তর, তুষ্ণীভাবে, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে! পতিবিরহকাতরা কলত্রবৃন্দ, ইত্যাদি ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর ব্যাকরণদোষ কি জন্য পদে পদে থাকিবে? একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক দ্বারা শোধন করিয়া লইলেও চলিতে পারিত। রণযূথ, মরামর, শুনকদ্বয় প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের অর্থ কোষকারদিগেরও অগম্য। কোন কোন বাক্যের অন্বয় ও অর্থবোধই হয়না। 'পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে' ইত্যাদি বাক্য পাঠকরিতে 'শব-পোড়ান' 'মড়াদাহ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাস্যাস্পদ বাক্যের কথা মনে আইসে। ৩য় পত্রস্থ 'আমাদের দুষ্মন্তপুত্র পূরুর ন্যায় ইনিও' ইত্যাদি বাক্য পাঠকরিয়া রচয়িতার মহাভারতাভিজ্ঞতাদর্শনে পাঠকেরা অবাক্ হইয়াথাকেন! নির্ম্মিতেছ, প্রদানিবে, উত্তরিলেন——ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় ক্রিয়াপদ সকল পদ্যমধ্যে যদিও কথঞ্চিৎ সহ্যহইয়াছিল, গদ্যেও তাহা কে সহ্য করিবে?

যাহাহউক এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তকের সমালোচনায় আর অনর্থক সময়ক্ষেপকরা কর্ত্তব্য নহে, আর একটী কথা বলিয়াই

নিবৃত্ত হইব। মাইকেলসাহেব এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই উৎসর্গ-পত্রিকামধ্যে লিখিয়াছেন "মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্ রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবন-চরিতমাত্র। তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ং, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়" —কিন্তু আমরা গ্রিফিথ্, ট্যালবয়হুইলার, ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিবিউ-লেখক প্রভৃতি অনেক বিলাতী সাহেবের নিকট ঈলিয়াড ও রামায়ণ-মহাভারতাদির যশ তুল্যরূপেই শুনিয়াছি—কোন সাহেবের মুখে ঈলিয়ডের নিকট রামায়ণমহাভারতাদি কোথায় লাগে? এরূপ কথা শুনি নাই। যিনি তাদৃশ নূতন কথা শুনাইতে পারিয়াছেন, তিনি রামায়ণ ও মহাভারতকে রাম ও যুধিষ্ঠিরাদির জীবনচরিতমাত্রও না বলিয়া "একঠো রেণ্ডীকা ওয়াস্তে কেজিয়া, আউর, গোড়া জমীন্‌কা ওয়াস্তে কেজিয়া" এই কথা যে, বলেন নাই, সেই আমাদের পরম ভাগ্য!।

শ্রীযুক্তভূদেবমুখোপাধ্যায়কৃত সফলস্বপ্নাদি।

শ্রীযুক্তভূদেবমুখোপাধ্যায় ১৭৪৭ শকের ২রা ফাল্গুনে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ৺বিশ্বনাথতর্কভূষণমহাশয় একজন গণনীয় অধ্যাপক ছিলেন। তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগরপ্রদেশ হইতে পৈতৃক-ধাম উঠাইয়া কলিকাতার মাণিকতলাতে বাটী করিয়াছিলেন। সুতরাং কলিকাতাই ভূদেবের জন্মভূমি। ভূদেব ৮ম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হন এবং ৩বৎসর তথায় অবস্থান-

পূর্ব্বক মুগ্ধবোধব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী পড়িতে অভিলাষী হয়েন, এবং ২ বৎসর অন্যান্য স্কুলে থাকিয়া শেষ ৬ বৎসর হিন্দুকালেজে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে পরিগণিতছিলেন—প্রতিবর্ষে পারিতোষিক ও যথাকালে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে হিন্দুকালেজের ছাত্রদেয় বেতন ৫ টাকা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য মাসিক এই ব্যয়ও তৎকালে লোকে গুরুতর বোধ করিত —এই জন্য ধনিসন্তান ব্যতিরেকে সাধারণ গৃহস্থসন্তানেরা হিন্দুকালেজে প্রায় অধ্যয়নকরিতে পারিত না। তৎকালে তর্কভূষণ মহাশয়ের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনি যে, পুত্রকে হিন্দুকালেজে পড়াইতে পারেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি বড় বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী ছিলেন। অতএব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, ভালরূপে ইঙ্গরেজি না শিখিলে উন্নতির কোন উপায় নাই। এইজন্য তিনি সহস্র ক্লেশ পাইয়াও পুত্রের অধ্যয়নব্যয় যোগাইতে কাতর হয়েন নাই।

কালেজে অধ্যয়নকরিবার সময়ে ভূদেববাবু যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কালেজের প্রিন্সিপাল, এডুকেশনকৌন্সিলের অধ্যক্ষ কেমরেন্ সাহেব প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তিনি বিষয়কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হইলে অবশ্যই কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তখন্ তাঁহার সেদিকে প্রবৃত্তি ছিল না—তিনি মিশনরিদিগের ন্যায় নানা স্থানে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যাপ্রচার করিবেন, এই এক নূতন আমোদে মত্ত হইলেন এবং তদনুসারে কয়েকজন বান্ধবের সহিত শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েকস্থানে স্কুলস্থাপন করিয়া স্বয়ং সেই সকল স্কুলের অধ্যাপকতাকার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক

কয়েক বৎসর অতিবাহিতকরিলেন। কিন্তু যেরূপ অর্থ ও লোকবলে মিশনরীরা স্কুলস্থাপনাদিকার্য্যে কৃতকার্য্য হয়েন, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সে সকল কিছুই ছিল না, কেবল মন ছিল, কিন্তু সংসারে শুদ্ধ এক মনের বলেই সকলকার্য্য সাধিত হয় না। সুতরাং কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাকে সে আমোদ ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তরের চেষ্টা দেখিতে হইল এবং মাসিক ৫০ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের ইঙ্গরেজি ২য় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। এস্থানে ভূদেববাবুকে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। দশ মাস পরেই সাহেবেরা তাঁহাকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার করিয়াদিলেন।

ভূদেববাবুর দ্বারা হাবড়া স্কুলের অনেক উন্নতি হয়। তাঁহার সময়ে অনেকগুলি ছাত্র জুনিয়র স্কলার্সিপ পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে গমন করে। সুতরাং সত্বরেই একজন অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষক বলিয়া তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হয়। ঐ সময়ে হজসন প্রাট্ সাহেব হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত স্কুলের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি হাবড়া স্কুলের রীতি নীতি শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া ভূদেববাবুর প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভূদেববাবুকে একজন বড় উপযুক্ত লোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন্ দক্ষিণবাঙ্গালার স্কুলইন্স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হয়েন, তৎকালে ভূদেববাবুর নিকট কর্ত্তব্যবিষয়ে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালাভাষার প্রতি ভূদেববাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সেই অনুরাগ প্রাট্সাহেবের প্রোৎসাহনায় উদ্দীপিত হইল, এবং তিনি বাঙ্গালাভাষায় 'শিক্ষাবিধায়ক' নামে এক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিতকরিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে লিখিত হয়। অতঃপর হূগলীতে একটী বাঙ্গালা নর্ম্মালবিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন

উপস্থিত হওয়ায় ভূদেববাবু মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে নিযুক্ত হইয়া আইসেন।

ভূদেববাবু একরূপ কাজ অধিকদিন ভাল বাসেন না—সর্ব্বদাই নূতন কার্য্যে ক্ষমতাপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন। হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের কার্য্যওতাঁহার পক্ষে নূতন হইল। এই কার্য্য পাইয়া কিয়ৎ-কাল পর্য্যন্ত তিনি যে, কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। তাঁহার সময়ে হুগলী নর্ম্মালস্কুলের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, নানা কারণে তাহা আমাদের লিখিবার ইচ্ছা না হউক, কিন্তু বোধহয় অনেকে অবগত আছেন। এই সময়ে ছাত্রদিগের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গালাভাষায় অধিক পুস্তক ছিল না, ভূদেববাবু ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যসম্পাদনপ্রসঙ্গেই অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকরচনা করেন, তন্মধ্যে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ১ম ও ২য়খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের ৩ অধ্যায় জ্যামিতি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ঐ সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

হুগলী নর্ম্মালের কার্য্যসম্পাদনাবসরে ভূদেববাবু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন যে, ১৮৬২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে যখন্ মেড্লিকট্ সাহেব প্রতিনিধি স্কুল ইন্স্পেক্টর হয়েন, তখন্ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেববাবুকে ৪০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মেড্লিকটের ন্যায় উদারপ্রকৃতি সাহেব অতি কম দেখিতে পাওয়াযায়। তিনি কয়েকমাস মাত্র ভূদেববাবুর সহিত কর্ম্ম করিয়া এরূপ প্রীত হইলেন যে, কিসে তাঁহাকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে লেপ্টনণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব প্রজাসাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য

বার্ষিক ৩০) হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সে টাকা ব্যয়িত হয়নাই। এক্ষণে মেড্‌লিকট্ সাহেব ভূদেববাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথোচিতরূপে সেই টাকার বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এক্ষণে যে সকল গুরুট্রেনিংস্কুল ও তদধীন গ্রাম্যপাঠশালা সমুদয় স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, ঐ টাকা হইতেই প্রথমে তাহার সূত্রপাত হইল। ভূদেববাবুই উহার একপ্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা; এজন্য ঐ নূতনপ্রণালী বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোহর এই তিন জেলায় প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেববাবুকেই, এডিসনল্ ইন্‌স্পেক্টর নামক নূতনপদের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। একাজও ভূদেববাবুর নূতন কাজ হইল, অতএব ইহাতেও তিনি যারপর নাই পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সন্তান, এই জন্যই বোধহয় অনেক বিষয়েই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ন। সেই ভক্তিবশতই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা সকলে অধিকাংশ প্রাচীন-প্রণালী অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। যাহাহউক, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রণালীর সফলতাসন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অপরাপর জেলাতেও ইহার বিস্তার আরম্ভ করিলেন। এই এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টরের অবস্থাতেই ভূদেববাবু ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের মে মাস হইতে ৵০ আনা মূল্যে শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহাতে ক্রমশঃ বাঙ্গালারইতিহাসের শেষভাগ লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকা কয়েক বৎসর উত্তমরূপে চলিতেছিল। উহা তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রের নামে ছিল, শোক ও পরিতাপের বিষয় যে, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে তাঁহাকে ঐ পুত্রটীর সহিত পত্রিকাখানিকেও বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।

ভূদেববাবু বিলক্ষণ সুবুদ্ধি, সুচতুর, সংসারবিদ, দূরদর্শী, উচ্চাশয়সম্পন্ন লোক। কৌশলসহকারে যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষীয়ের নিকট

আত্মপক্ষসমর্থন করিতে পারেন, ইনি সেই দলের অগ্রগণ্য। তাঁহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পঞ্জাবপ্রদেশীয় শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধীয় ইংরাজী রিপোর্ট এই কথার স্পষ্ট উদাহরণ হইয়া আছে। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রদেশীয় বিদ্যালয়পরিদর্শনে প্রেরিত হইয়া স্বল্পকালমধ্যে তত্রত্য শিক্ষাপ্রণালীর দোষ গুণ সমস্ত বুঝিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার যেরূপ বিচার করিয়াছেন এবং কাহারও প্রতি কোন দোষারোপ না করিয়াও যেরূপে আপন মত বজায় করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, তাহা কতক বুঝিতে পারা যায়। যাহাহউক, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ কার্য্যকুশলতাসন্দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বড়ই প্রীত হইলেন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত উচ্চ-শ্রেণীর সাহেব কর্ম্মচারীদিগের বার্ষিক বৃদ্ধিসহ উচ্চবেতনসম্বলিত যে শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাঁকেও তাহার একশ্রেণীতে নিবিষ্ট করিলেন। সুতরাং ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে বার্ষিক ৫০৲ টাকা বৃদ্ধি নিয়মে তাঁহার বেতন ৫০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ঐ পুরস্কার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে নর্থ সেণ্ট্রাল্ নামক নূতন ডিবিজনের ইঙ্গরেজি বাঙ্গালা সমস্ত বিদ্যালয়ের ভারপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ডিবিজনাল্ ইন্স্পেক্টর করিয়াদিলেন। এই কার্য্যটী এতদিন সাহেব-দিগেরই একচেটিয়াছিল। ভূদেববাবুকে আমাদের ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য যে, তিনি ঐ একচেটিয়া ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালীমহলে ঐ পদটী আনিতে পারিয়াছেন।

হুগলীনর্ম্মালে অবস্থান সময়ে ভূদেববাবু চুঁচুড়ায় বাটী করিয়া-ছিলেন, অনেকদিন সেই বাটীতেই অবস্থানপূর্ব্বক ইন্স্পেক্টরী কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে যে এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্র তাঁহার হস্তে আসিয়াছে, তাহাও ঐ স্থান হইতেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব—ভূদেববাবুর হস্ত হইতে যে যে পুস্তক প্রকাশিতহইয়াছে, যথাস্থলে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল। তন্মধ্যে শিক্ষাবিধায়ক তাঁহার প্রথম উদ্যম। অপর কেহই ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেননাই, সুতরাং ঐ পুস্তকই বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাপ্রণালীসংক্রান্ত প্রথম পুস্তক। উহাতে ঐ সংক্রান্ত অনেক গুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। তদনুসারে চলিলে, শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার শিক্ষকদিগকে একবারে ধনস্পৃহাশূন্য হইয়া কেবল প্রীতিবশতঃ শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিবার যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সংসারীব্যক্তির পক্ষে সেরূপ উপদেশানুসারে কার্য্যকরা বড় কঠিন! তিনি যৌবনাবস্থায় স্বয়ং ঐ প্রকার উদ্যম করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয়সংস্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, সত্য—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মুনি ঋষি হইবার কাল অতিবাহিত হইয়াগিয়াছে!

ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুস্তকের নাম ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহা "সফলস্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটী ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যানে ঐ দুই ভাগ বিরচিতহইয়াছে। গল্পচ্ছলে প্রকৃত ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপদেশদিবার অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থ লিখিত হয়। "রোমান্স অব্ হিষ্টরি" নামক ইঙ্গরেজিগ্রন্থই ইহার আদর্শ। সফলস্বপ্নের উপাখ্যানটী ঐ পুস্তক হইতেই সঙ্গৃহীত। ঐ উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র, তাহাতেও চাতুর্য্য বা কৌশল তাদৃশ কিছুই নাই। গজনন্ নগরাধিপতি সবক্তাজীন্ প্রথমে দাস ছিলেন, এই প্রকৃত ইতিবৃত্তাংশটী একটী ক্ষুদ্র উপাখ্যানের সহিত পাওয়াযায়। ফলতঃ এই ভাগের উপর আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

অঙ্গুরীয় বিনিময়েরও কিয়দংশ উক্ত রোমান্স অব্ হিষ্টরি নামক পুস্তক হইতে সঙ্গৃহীতহইয়াছে, কিন্তু উহার অবশিষ্ট ভাগ গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত। গ্রন্থের স্থূলবিবরণ এই, মহারষ্ট্রপতি

শিবজী দিল্লির বাদসাহ আরঙ্গেবের কন্যা রোসিনারাকে পর্ব্বতপথ হইতে অপহরণকরিয়া কিয়দ্দিবস নিজ দুর্গে স্থাপন করেন। তথায় শিবজীর গুণগ্রামেরোশিনারা বশীভূত হইলে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইতিমধ্যে মোগল সেনাপতি ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া রোসিনারাকে পিতৃসদনে প্রেরণকরিলে রোসিনারা পিতার নিকট শিবজীর ভূয়সীপ্রশংসা করেন। বাদসাহ, কন্যার মুখে শত্রুর প্রশংসা শ্রবণে কুপিতহইয়া কারাবদ্ধ নিজপিতা সাজেহানের নিকট তাঁহাকে প্রেরণকরেন। এদিকে শিবজী পুনর্ব্বার নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া মোগলদিগের সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বাদসাহের হিন্দু সেনাপতি রাজা জয়সিংহের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন। জয়সিংহ বাদসাহের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে বাদসাহের আর এক জন শত্রুর সহিত যুদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই যুদ্ধের পর শিবজী দিল্লীগমন করিলে ধূর্ত্ত আরঙ্গেব তাঁহার সম্মান না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ অপমান, এবং প্রকারান্তরে তাঁহাকে কারাবদ্ধ, করেন। শিবজী কৌশলক্রমে তথাহইতে পলায়ন করিয়া যান। রোসিনারা বরাবর শিবজীর প্রতি সমান আসক্ত ছিলেন। শিবজী প্রস্থানের পূর্ব্বে রোসিনারাকেও সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইবার সমুদয় উপায় করিয়া নিজ এক অঙ্গুরীয়ের সহিত এক বারবনিতাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোসিনারা যদিও মনে মনে শিবজীকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তথাপি উক্ত বারবনিতার সহিত অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া আসিবার সুযোগসত্ত্বেও; তিনি শিবজীর ভার্য্যা হইলে, সজাতীয়দিগের নিকট শিবজীর যেরূপ অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা, তৎসমস্ত অনুধাবন করিয়া; আসিলেন না, কিন্তু শিবজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজ অঙ্গুরীয়বিনিময় করিয়া এক পত্রদ্বারা প্রাণপ্রিয়তমের নিকট মনের সমুদয় কথা লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই উপন্যাসমধ্যে প্রকৃত ইতিবৃত্ত কতটুকু আছে, তাহা ইতিহাসবিদেরা বুঝিয়া লইবেন। যাহাহউক ভূদেববাবু এই উপন্যাসবর্ণনপ্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অস্ত্র শস্ত্র, সেনা, দিল্লীনগর, তত্রত্য রাজভবন, সাজেহানের দুরবস্থাও তাঁহার নির্ম্মিত ময়ূরতক্ত নামক সিংহাসন প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক পদার্থের যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শিবজীর স্বদেশহিতৈষিতা, সাহসিকতা ও ধূর্ত্ততা, তাঁহার প্রতি রোশিনারার অকৃত্রিম অনুরাগ ও তাদৃশ অনুরাগসত্ত্বেও শিবজীর সহিত মিলিত না হইয়া নিজের সাংসারিক সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক অবস্থিতি, আরঞ্জেবের ধূর্ত্ততা, কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, রামদাসস্বামীর স্বদেশহিতৈষিতা এবং শিষ্যবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়ের যে সকল চিত্র করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে; বিশেষতঃ জয়সিংহের সহিত শিবজীর সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা এবং আরঞ্জেবের সহিত তাঁহার সন্দর্শন ও কথোপকথন আরও চমৎকার ও বহুল বিষয়ের উপদেশ জনক হইয়াছে। বাদসাহের জন্মতিথির বিবরণ প্রভৃতি যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ইতিহাসমূলক। শিবজী বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, ইহাতে কৌশলক্রমে তাহারও রক্ষাকরা হইয়াছে। ফলকথা অঙ্গুরীয়বিনিময় খানি এইরূপ প্রকৃতির পুস্তকমধ্যে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। পুস্তকের ভাষাটী আরও কিঞ্চিৎ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সরল ও মাধুর্য্যসম্পন্ন হইলে ইহা আরও এক অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইত।

ভূদেববাবু ইঙ্গরেজি নবেলের পদ্ধতিতেই যে, ইহার উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন, একথা বলা বাহুল্য। এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে—যৎকালে এই অঙ্গুরীয়বিনিময় রচিত হয়, তখন্ পদ্মিনীউপাখ্যান বল, কর্ম্মদেবী বল, দুর্গেশনন্দিনীই বা বল, ঐতিহাসিক উপন্যাসনামক কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হয় নাই, অতএব ঐ বিষয়ে যে, বাঙ্গালাগ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি পড়ি-

য়াছে ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ভূদেববাবুই তাহার মূল। এক্ষণে ঐরূপ প্রকৃতির গ্রন্থরচয়িতারা যে, সকলেই সকল বিষয়ে ভূদেববাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, একথা আমরা বলি না, কিন্তু সকলেই যে, ভূদেববাবু হইতেই উহার প্রথম স্বাদগ্রহ করিয়াছেন, একথা অবশ্য বলিব।

ভূদেববাবু পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ড ও রোমেরইতিহাস, ১ম ও ২য় ভাগ প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ও ইউক্লিডের কিয়দংশ যে, রচনাকরিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিদ্যার্থীদিগেরযথেষ্ট উপকার হইতেছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সে সকল পুস্তকের সমালোচনাকরা এ প্রস্তাবের তত উদ্দেশ্য নহে। তবে এই একটী কথা বলা আবশ্যক যে, ইউক্লিড ভিন্ন তাঁহার বিরচিত কোন পুস্তক অপর গ্রন্থের ঠিক্ অনুবাদ নহে। তিনি গ্রন্থান্তর হইতে বস্তু সমাহরণপূর্ব্বক স্বয়ং রচনাকরিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল পুস্তকের বিষয়েকোন কথা না বলা হইলেও তিনি এক্ষণে যে এডুকেশন গেজেটনামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা অবশ্যকর্ত্তব্য। ভূদেববাবুই প্রথমে হজ্‌সন্‌প্রাট্ সাহেবকে এডুকেশন গেজেট পত্র প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন। যখন্ সেই পরামর্শ দেন, তখন্ সোমপ্রকাশ অথবা অন্য কোন তাদৃশ সংবাদপত্র বাঙ্গালায় জন্মে নাই। পরে প্রাট্ সাহেবের চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই জুলাই হইতে এডুকেশন গেজেটপত্র প্রকাশিত হয়। তখন উহার সম্পাদক ওব্রাইন্ স্মিথ নামক একজন পাদরী সাহেব ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ঐ পত্রের জন্য প্রথমে মাসিক ৭৫৲ টাকা, পরে ১৫০৲ টাকা, অনন্তর ৩০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। কয়েক বৎসরপরে স্মিথ্ সাহেব স্বদেশ গমনোন্মুখ হইয়া বৃত্তিসহ ঐ পত্রের সত্ত্ব গর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। গবর্ণমেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকারকে ঐ ৩০০৲ টাকা দিয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক এবং মেনেজর নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খ্রীঅব্দে ৭ই মে ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলগাড়ীতে শ্যামনগরে যে

দুর্ঘটনা ঘটে, তৎসংক্রান্ত কয়েকটী প্রবন্ধ ঐ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদকের সহিত গবর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য জন্মে, এবং তজ্জন্য প্যারীবাবু ঐ সম্পাদকতা ত্যাগকরেন। অনন্তর ডিরেক্টর এটকিন্সন্ সাহেবের এবং ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের একান্ত অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভূদেববাবু ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বরমাস হইতে এডুকেশন গেজেট স্বহস্তে লইয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভৃতিভুক্ সম্পাদক হন নাই—নিজে ঐ পত্রের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। এখন্ গবর্ণমেণ্ট উহার সাহায্যার্থ যাহা কিছু করিতেছেন, ইচ্ছাকরিলে তাহার অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু কাগজের স্বত্ব আর প্রত্যাহরণ করিতে পারেননা। এক্ষণে উক্ত এডুকেশনগেজেট কিরূপ চলিতেছে? একথার উত্তরে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সংবাদ পত্রের ভদ্রাভদ্রতাবিচার গ্রাহক-সঙ্খ্যার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই কতকদূর মীমাংসিত হইতে পারে। ভূদেববাবু যৎকালে ঐ পত্রপ্রাপ্ত হয়েন, তখন্ উহার মূল্য-পুদাতা গ্রাহক ২৮৯ ছিল, এক্ষণে প্রায় ৬০০ হইয়াছে।

পদ্মিনীউপাখ্যান-কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী প্রভৃতি।

এই ৩ খানি পদ্যময় কাব্য এক্ষণে খিদিরপুরে কৃতনিবাস শ্রীযুক্ত রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়কর্তৃক প্রণীত। ইনি ১৭৪৮ শকে কাল্নার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় মিশনরিস্কুলে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষাকরিয়া কিয়ৎকাল হুগলী কালেজে ইঙ্গরেজি অধ্যয়নকরিয়াছিলেন। শারীরিক পীড়ানিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিকদূর

শিক্ষাকরিতেপারেননাই, কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগকরিয়া স্বয়ং অনুশীলনদ্বারা ইঙ্গরেজি কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছেন। কৈশোরাবস্থা হইতেই বাঙ্গালাকবিতারচনায় ইহাঁর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, তজ্জন্য সর্ব্বদাই কবিতারচনা করিয়া প্রভাকরাদি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিতেন। বোধহয় প্রভাকরসম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তি অনেক মার্জ্জিত হইয়াছিল। যাহাহউক বাঙ্গালারচনাবিষয়ে নৈপুণ্য থাকায় তিনি অতি অল্প বয়সেই কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদকতা ও সহকারিসম্পাদকতা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। পরে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত এডুকেশনগেজেট প্রচারিত হইলে তৎসম্পাদক ওব্রাইন স্মিথ্ সাহেবের সহকারী হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত পত্রের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে তাঁহার গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রকাশিত হইত। তাঁহার গদ্য সকলের প্রীতিপ্রদ না হউক—পদ্য অনেকেই আদরপূর্ব্বক পাঠকরিতেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহাকর্ত্তৃক 'পদ্মিনীউপাখ্যান' রচিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরেই রাজপুরুষেরা তাঁহাকে প্রথমে ইনকমট্যাক্সের আসেসরী ও পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত করেন। অদ্যাপি তিনি ঐ কার্য্যে ব্রতী আছেন। এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যভারসত্ত্বেও আবাল্যপরিচিত কবিতারচনাকে তিনি বিস্মৃতহন নাই—এই অবস্থাতেই ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কর্ম্মদেবী ও ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে শূরসুন্দরী নামক কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ৩ খানি কাব্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই ৩ খানি কাব্য ভিন্ন "বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" ও "শরীরসাধনীবিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন" নামে আরও ২ খানি পদ্যগ্রন্থ তাঁহার রচিত আছে। সম্প্রতি তিনি সংস্কৃত কুমারসম্ভব কাব্যেরও পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান—দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন রাজপুতানান্তর্গত

চিতোরের অধিপতি ভীমসিংহের মহিষী অপরূপরূপা পদ্মিনীর রূপ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার মানসে সসৈন্যে চিতোর আক্রমণকরেন, এই উপলক্ষে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রাজপুত ও পাঠানদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর অবশেষে পাঠানদিগের জয় ও চিতোরনগরের ধ্বংস হয়, পদ্মিনী ধর্মলোপভয়ে অগ্নিপ্রবেশ করেন এবং ভীমসিংহও রণশায়ী হয়েন—এই উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন কতক বাস্তব ও কতক অবাস্তব ঘটনার বর্ণন থাকে, ইহাতেও তাহাই আছে। কবি, স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভাবসঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞাপনমধ্যে স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদুল্লেখে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। যাহাহউক তিনি যে, বর্ত্তমানকালিক কৃতবিদ্যদিগের রুচির অনুরূপ বিশুদ্ধপ্রণালীতে কাব্যরচনার মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার সে মানস সফল হইয়াছে। পদ্মিনী উপাখ্যান বীর ও করুণরসপ্রধানকগ্রন্থ; ইহাতে নায়ক নায়িকার অন্যোন্যানুরাগসূচক অনেক কথোপকথন বর্ণিত আছে, কিন্তু কোথাও নিরবগুণ্ঠন আদিরস অবতারিত হয়নাই। পদ্মিনীর রূপ, তাঁহার দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব বাদসাহকে প্রদর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন, ছলপ্রয়োগপূর্ব্বক পদ্মিনীকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারসাধন, সেনাগণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি সমরকরণার্থ ভীমসিংহের উৎসাহবাক্য, পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশ, রাজপুত নর নারীগণের তেজস্বিভাব, কালমাহাত্ম্য প্রভৃতি সমুদয়গুলিই উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিতবিষয়ের অনেক স্থানেই সুকবির হস্তচিহ্ন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারাযায়। ফলতঃ পদ্মিনী উপাখ্যান বিশুদ্ধপ্রণালীতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ইহার পূর্ব্বে এরূপ পদ্যকাব্য বোধহয় আর কেহই রচনাকরেননাই।

এই গ্রন্থে চলিতছন্দঃ পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ভঙ্গত্রিপদী, একাবলী,

মালঝাঁপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত ও আরও কয়েকটী নূতনবিধ ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। ২।৪টী স্থল ভিন্ন ছন্দের যতিভঙ্গ কুত্রাপি হয়নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রেই রক্ষিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থসংক্রান্ত কয়েকটী বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে—স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে অত বড় প্রকাণ্ড উপাখ্যান তখনই শ্রবণ করিতে বসা পথিকের পক্ষে উচিত হয়নাই; ব্রাহ্মণের স্নানাহারের পর গল্প আরম্ভ করিলে ভাল হইত। কবি ঐ ব্রাহ্মণের মুখেই সমুদয় উপাখ্যান বর্ণনকরিয়াছেন সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধকরিয়া নিজেও দু কথা বলিয়া লইয়াছেন—যথা—

"সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,—অধিপতি হয় সেই জন।
সুপ্ত হয়ে দেখে যেই, কি লাভকরিবে সেই, ভেবে দেখ হে ভাবুকগণ!"॥
"একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে॥" ইত্যাদি

এগুলি আমাদিগের ভাল লাগেনা। গ্রন্থোল্লিখিত পাত্রের উক্তির মধ্যে কবির নিজের উক্তি থাকিলে বর্ণনার বৈচিত্র্যভঙ্গ হয়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান কবিরাও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি এক এক সন্দর্ভের শেষে থাকায় তত দোষাবহ হয়নাই; উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সন্দর্ভের মধ্যভাগেই প্রদত্ত হইয়াছে।—আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোরের দুর্গে প্রবেশকরিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন্ পদ্মিনীকে দেখিতে না পাইলেন, তখন্ পদ্মিনী কোথায় গেল? তাহার অনুসন্ধান করিলেননা! পদ্মিনীর জন্য খেদ করিলেন না! পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক হইল, তাহা ভাবিয়া নির্ব্বিঘ্নমনে একবারও আক্ষেপ করিলেন না! করিলে ভাল হইত। ঐ সমুদয় ভিন্ন কোন কোন স্থলের দুর্ব্বোধতা, কতকগুলি শব্দের অবাচকতা ও স্থলবিশেষে ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি আরও কতকগুলি

দোষ এ গ্রন্থে আছে, তাহা সামান্যবোধে উপেক্ষিত হইল। ফল-কথা, আমরা একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, ঐ সকল দোষসত্ত্বেও পদ্মিনীউপাখ্যান একখানি মনোরম গ্রন্থ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠেই গ্রন্থকারের কবিত্ব অনেক অংশে বোঝা যাইবে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,—কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,—কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,—নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,—স্বর্গ সুখ তায়।
এ কথা যখন্ হয় মানসে উদয় হে,—মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে,—ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়নিলয় হে,—হৃদয়নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,—বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ্ হে,—ভেরীর আওয়াজ।
সাজ্ সাজ্ সাজ বলে সাজ্ সাজ্ সাজ্ হে,—সাজ সাজ সাজ" ॥ ইত্যাদি

অগ্নিপ্রবেশকালে সহচরীদিগের প্রতি পদ্মিনীর উৎসাহ বাক্য।

"এসো এসো সহচরীগণ!—এসো সহচরীগণ!
হুতাশনগ্রাসে করি জীবন অর্পণ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,—বাঁধ বিনাইয়ে কেশ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥
ওরে সখি! আজরে সুদিন,—ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবনদানে পতিপ্রেম ঋণ॥
আজ অতি সুখের দিবস,—পাব সুখ মোক্ষ যশ।
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস॥
পরিণয় প্রমোদ উৎসবে,—ভেবে দেখ দেখি সবে।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে?

সবে তবে ছিলেলো বালিকা,—যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা ?
সকলেতে জেনেছ এখন,—পতি অতি প্রাণধন।
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন ॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,—এই ছার কলেবরে।
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে ?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই—কোনরূপে রক্ষা নাই।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই ॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার,—যার পর নাহি আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার ॥
অতএব এস লো সকলে,—গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে" ॥ ইত্যাদি

উপসংহারে।

"করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া ভাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র, তার কাছে সব একাকার ॥
সিংহাসন অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেমছাতা, ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি, মরণেতে তারো সে প্রকার ॥"
"কালের নাহিক বোধ, নাহিমানে উপরোধ, বড়সুখে বড়রূপে বাদী।
সুখপুষ্প যথা ফুটে, অতিবেগে তথা ছুটে, কট মট বিকটনিনাদী ॥
কিবা চারুরূপধর, কিবা বহুধনেশ্বর, কিবা যুবা নানাগুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব, পেলে হেন খাদ্যপরিকর ॥"
"হাঁরেরে নিষাদ কাল! একি তোর কর্ম্মজাল, শোভা নারাখিবিভববনে।
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল, জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে ॥
ওরে ও কৃষককাল! কি করিছে তব হাল ? জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যেই গাছ, অনায়াসে উপাড়িয়ে যায় ॥
সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ক শস্যচয়, সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ, কাটিছ তরুণ শস্যচয় ॥
ধিক্ কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ, না রাখিলি ভুবনভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর, সব খেয়ে ভরিলি উদর! ॥"

কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী— ঔরিণ্টপতির দুহিতা কর্ম্মদেবী যশলমীরাধিপতির পুত্র সাধুর শৌর্য্য, বীর্য্য ও রূপে বিমোহিত

হইয়া রাঠোর রাজপুত্র অরণ্যকমলের সহিত পিতৃকৃত সম্বন্ধ ভঙ্গকরিয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন, এই সূত্রে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে অরণ্যকমলের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধু হত হয়েন; কর্ম্মদেবী পতির মৃত্যুর পর স্বহস্তে আপনার একবাহু ছেদনকরিয়া পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া দেন এবং অপরবাহু নিজ শ্বশুরকে দেখাইবার মানসে ছিন্ন করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন। যেখানে এইকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, তথায় 'কর্ম্মসরোবর' নামে এক সরোবর নিখাত হইয়াছে—এই উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া কর্ম্মদেবী রচিত হইয়াছে। শূরসুন্দরীর স্থূল মর্ম্ম এই—দিল্লীশ্বর আক্‌বরসাহ, নিজশ্যালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরের রাণার উপর কুপিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার কুলে কলঙ্কদিবার মানসে দিল্লীর অন্তঃপুরে রমণীদিগের নৌরোজানামক সকের বাজার স্থাপনপূর্ব্বক তথায় উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্যা পৃথ্বীরায়পত্নীকে কৌশলে আনয়নকরিয়া তাঁহার সতীধর্ম্মনাশের চেষ্টা করেন। শূরসুন্দরী আক্রমণসময়ে তরবারিদ্বারা বাদশাহকে বিনাশকরিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া 'আর কখনও কোন রাজপুতমহিলাকে অন্তঃপুরে আনিবেন না' এতদ্বিষয়ে এক স্বীকৃতিপত্র লিখিয়া দেন।

এই দুই পুস্তকেই রাজপুতরমণীদিগের সাহস, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীধর্ম্মের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী উভয়ের চরিত্রই ওজস্বী, উদার ও অতি নির্ম্মলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সাধুর মৃত্যুর পর ভ্রাতার নিকট কর্ম্মদেবীর বক্তৃতা ও আক্রমণোদ্যত বাদসাহের বক্ষে পদাঘাত করিয়া শূরসুন্দরীর তিরস্কারবাক্য যে, কিরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ পাঠকরিয়া দেখিবেন। পদ্মিনীউপাখ্যানের ন্যায় এই দুইখানিও বিশুদ্ধ কাব্য হইয়াছে; ইহাদের কোনস্থলেই অশ্লীলতার গন্ধ নাই। কবি প্রসঙ্গক্রমে রাজপূতজাতি ও দিল্লীর বাদসাহদিগের নানাবিষয়সংক্রান্ত

যে সমস্ত বর্ণনাকরিয়াছেন, তৎপাঠে ঐতিহাসিক বিষয়ের বহুল জ্ঞানলাভ হয়। তদ্ভিন্ন তিনি কাবুলীমেওয়া, আম্র, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি দেশীয় ফল, ঢাকাই মসলিন, কাশ্মীরীশাল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ কর্ম্মদেবী ও শূর-সুন্দরী পদ্মিনীর ন্যায় পাঠকের তত মনোহরণ করিতে না পারুক, কিন্তু এ দুইখানিও যে, উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক কাব্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে পদ্মিনীর বৃহৎ উপাখ্যানশ্রবণের যে অযুক্ততা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, কর্ম্মদেবীতে ব্রাহ্মণকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়ায় সে দোষ পরিহৃত হইয়াছে; শূরসুন্দরীতে তাদৃশ দোষের সঙ্ঘটনই হয় নাই। কিন্তু এই শেষ পুস্তকে বাদসাহ ও যোধবাইকে অনর্থক কতকগুলা ছাই ভস্ম মাখান হইয়াছে। তাঁহাদিগকে যোগী ও যোগিনী সাজাইবার কোন প্রয়োজনই ছিলনা। তদ্ভিন্ন পদ্মিনীউপাখ্যানে আর আর যে সকল দোষগুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এ উভয়েও সে সকল বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে ব্যাকরণদোষ পদ্মিনীউপাখ্যান অপেক্ষা এই দুই পুস্তকে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইল। পুনঃসংস্করণে সে দোষগুলি সংশোধিত হইলে এ দুইখানি পুস্তক আরও মনোরম হইবে।

পদ্মিনীউপাখ্যানের ন্যায় ইহাতেও পয়ার ত্রিপদী ভিন্ন, তাহাদেরই রূপান্তরস্বরূপ নানাবিধ নূতন ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবতীর স্তোত্রে সংস্কৃতানুকারক—

"নিশুম্ভ শুম্ভঘাতিনি! প্রচণ্ড চণ্ডপাতিনি!
প্রশান্ত দান্তপালিনি! প্রসীদ মুণ্ডমালিনি!"

এই প্রমাণিকাচ্ছন্দটী উপযুক্ত স্থলে অর্পিত হওয়ায় বড় মধুর হইয়াছে।

পতিব্রতোপাখ্যান—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব—নবনাটক-রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি।

কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামনিবাসী ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত রামনারায়ণতর্করত্ন উপরি উল্লিখিত গ্রন্থগুলির প্রণয়নকর্ত্তা। ১৭৪৪ শকে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে কিয়ৎকাল সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় পাঠ সমাপন করিবার দুই বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয়েরই অন্যতম শিক্ষকতাপদ লাভকরেন। এ পর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যেই ব্রতী আছেন। তর্করত্ন পঠদ্দশাতেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পতিব্রতোপাখ্যান এবং কালেজত্যাগ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে কুলীনকুলসর্ব্বস্বের রচনা করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে রত্নাবলী, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নবনাটক, মালতীমাধব ও রুক্মিণীহরণ নামক ৬ খানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দুইখানি পারিতোষিক-গ্রন্থ—অর্থাৎ রঙ্গপুরের ভূম্যধিকারী ৺কালীচন্দ্ররায় চৌধুরী মহাশয় পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচয়িতাকে ৫০ টাকা করিয়া পারিতোষিক দিবেন, সংবাদপত্রে এইরূপ দুইটী বিজ্ঞাপন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিয়াছিলেন। তদনুসারে তর্করত্ন ঐ দুই প্রবন্ধ লেখেন এবং উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় নির্দ্ধারিত পারিতোষিক লাভ করেন। ঐ দুই পুস্তক এবং নবনাটক, এই ৩ খানি তর্করত্নের স্বকপোলকল্পিত বস্তুদ্বারা গ্রথিত ;—রুক্মিণীহরণের উপাখ্যানটী মাত্র পুরাণ হইতে সঙ্কলিত কিন্তু নাটক নিজের রচিত ; তদ্ভিন্ন অপরনাটকগুলি সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও ২।১খানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা এপর্য্যন্ত মুদ্রিত হয়নাই।

পতিব্রতোপাখ্যানে পতিব্রতা রমণীদিগের স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য-বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ, উদ্ধৃতপুরাণাদির বচনদ্বারা সে সকলের সমর্থন এবং সতী ও অসতীদিগের অনেকরূপ উপাখ্যানাদি আছে। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

তর্করত্নের অপর পারিতোষিক গ্রন্থ—কুলীনকুলসর্ব্বস্বনাটক। গ্রন্থকার নিজেই বিজ্ঞাপনমধ্যে ইহার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। যথা "এই নাটক ছয়ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান; ২য়ে ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানাপ্রস্তাব; ৩য়ে কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার; ৪র্থে শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ; ৫মে নানারহস্য ও বিরহিপঞ্চাননের বিয়োগপরিদেবন; ৬ষ্ঠে বিবাহনির্ব্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্যগ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে"।—এ কথা সত্যই বটে; কুলীনকুলসর্ব্বস্ব অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠকরিলে বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের বিষময় ফল সকল নয়নাগ্রে যেন নৃত্য করিতেথাকে। তর্করত্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নহেন—বৈদিক; তাঁহার দ্বারা রাঢ়ীয় কুলপ্রথার এতদূর উদ্ঘাটন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনাবসরেও তিনি সামান্য কবিত্ব ও সামান্য রসিকত্ব প্রদর্শন করেন নাই। অনৃতাচার্য্যের চরিত, রসিকা নাপ্তিনীর সহিত দেবলের রহস্য, ফুলকুমারীর খেদ, মহাকুলীন অধর্ম্মরুচির সহিত তৎপুত্র উত্তমের কথোপকথন, গর্ভবতী হরির মার কন্যা হইবার জন্য পুরোহিতসমীপে স্বস্ত্যয়নকরণপ্রার্থনা, বৈদিকব্রাহ্মণের ফলার, অভব্য চন্দ্রের বিবরণ প্রভৃতি সকল স্থলগুলিই অতি উত্তম ও চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি, বালক, বালিকা ও ভৃত্যের ভাষাগুলিও অনেক স্থলেই সুন্দররূপে

অনুকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বড় পরিহাসরসিক ;—সেই পরিহাস-রসিকতা সর্ব্বস্থলেই প্রচুরপরিমাণে বিস্তারিত করাহইয়াছে। বোধ হইতেছে, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালা কোন নাটক রচিত হয় নাই ; ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালানাটক। তর্করত্ন সর্ব্বপ্রথমেই ওরূপ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে অনেকে সংশয় করেন—তাঁহারা কহেন, 'ঐ নাটক তর্করত্নের রচিত নহে, তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রসিদ্ধ কবি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত—তর্করত্নের নামদিয়া প্রকাশিত' ইত্যাদি—ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ অসামান্য কবি ছিলেন, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে ওরূপ পুস্তক নির্গত হওয়া বিচিত্র কথা নহে, কিন্তু উক্ত নাটকপ্রকাশের পর যদি তর্করত্ন একেবারে তুষ্ণীম্ভূত হইতেন—আর কোন রচনা না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সন্দেহ সঙ্গত হইত। কিন্তু যখন্ দেখাযাইতেছে যে, 'বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মৃত্যুর পরও তর্করত্ন ক্রমে ক্রমে ছয়খানি নাটক রচনা করিলেন এবং 'নাট্টকে রামনারায়ণ' বলিয়া—তাঁহার খ্যাতি হইল, তখন্ আর ওরূপ সন্দেহ করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে।

তর্করত্ন সংস্কৃতজ্ঞ লোক, সুতরাং সংস্কৃতনাটকের রীত্যনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনার পর নাটক আরম্ভকরিয়াছেন কিন্তু সংস্কৃতে "কার্য্যনির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্" এই এক যে প্রধান নিয়ম আছে, তাহা রক্ষাকরিতে পারেননাই। ফলতঃ কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের উপাখ্যানাংশে কিছু বৈচিত্র্য নাই। তর্করত্ন বড় শ্লেষোক্তিপ্রিয় ; তাঁহার শ্লেষবচন-সকল অনেকস্থলেই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে নিতান্ত অতিরিক্ত হওয়ায় বিরক্তিকরও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি বাঙ্গালার মধ্যে মধ্যে যে সকল স্ব-রচিত সংস্কৃতশ্লোক বিন্যস্তকরিয়া তাহার বাঙ্গালা অর্থ করিয়াদিয়াছেন, সেস্থলে কেবল সেই বাঙ্গালাগুলি থাকিলেই সুসঙ্গত হইত। যাহাহউক, যখন্ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গা-

সার সর্ব্বপ্রথম নাটক, তখন্ উহার সহস্র গুরুতর দোষ থাকিলেও মার্জ্জনীয় হইত—আমাদের উল্লিখিত দোষ সকল ত সামান্য। আমরা নিজেও বামণ জাতি, এই জন্য পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ কুলীন কুল-সর্ব্বস্ব হইতে অপর কোন অংশ উদ্ধৃত না করিয়া উত্তম মধ্যম ও অধম তিন প্রকার ফলারের লক্ষণগুলিই নিম্নভাগে উদ্ধৃতকরিলাম——

"ঘিয়ে ভাজা তপ্তলুচি, দু-চারি আদার কুচি, কচুরি তাহাতে খানদুই।
ছক্কা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা, ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা, শুনে সক্ সক্করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা, যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়, কাতারি কাটিয়ে শুকোদই।
অনন্তর বামহাতে, দক্ষিণা পানের সাতে, উত্তম ফলার তাকে কই॥"
"সরুচিঁড়ে শুকোদই, মর্ত্তমান ফাকা খই, খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিকব্রাহ্মণে কবে, দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়॥"
"গুমোচিড়ে জলোদই, তিত গুড় ধেনো খই, পেটভরা যদি নাহি হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাতদিয়েপাত চাটে, অধম ফলার তাকে কয়॥"

নবনাটক—জোড়াসাঁকো নাট্যশালাকমিটীকর্ত্তৃক আদিষ্টহইয়া তর্করত্ন বহুবিবাহবিষয়ক এই নবনাটক প্রণয়নকরেন। গবেশবাবু নামক একজন জমীদার স্ত্রীপুত্রসত্ত্বেও অধিক বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন; তাঁহার নবপ্রণয়িনীর উৎপীড়নে প্রথমাপত্নীর গর্ভজপুত্র দেশত্যাগী হন, বিষয়বিভব নষ্ট হয়, পূর্ব্বপত্নী যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগকরেন এবং তিনি নিজেও নবপত্নীদত্ত বশীকরণ ঔষধসেবনের গুণে অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হয়েন—এই সামান্য উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহের দোষপ্রতিপাদক অপরাপরবিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার পরিহাস ও শ্লেষোক্তিপ্রিয়—সেই পরিহাস ও শ্লেষ চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোওয়ালিনী ও দন্তাচার্য্যের চরিতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নাগরের

ইঙ্গরেজি শব্দসম্বলিত কথোপকথনটী এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিবামাত্র ঐরূপ কতকগুলি নাগর আমাদের চক্ষুর উপর আসিয়া উপস্থিত হন। তর্করত্ন, নাগরের কোন বেশভূষা দেন নাই—পরামর্শ জিজ্ঞাসাকরিলে আমরা দাড়ী, ছড়ি, চস্‌মা, মাথার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের মত সিঁতে প্রভৃতি দিয়া তাঁহাকে সাজাইয়াদিতে বলিতাম!

নবনাটকে পরিহাসোদ্দীপক অনেক প্রসঙ্গ থাকিলেও ইহা করুণ-রসোত্তর গ্রন্থ। সুবোধের অলীক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সাবিত্রীর মূর্চ্ছা; তাঁহার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ; গবেশের রোগ, অনুতাপ ও মৃত্যু; বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্র মাতৃপিতৃবিয়োগের, বিশেষতঃ উদ্বন্ধনে মাতার প্রাণত্যাগের, সংবাদশ্রবণে সুবোধের বিলাপ ও মূর্চ্ছাদি পাঠকরিবার সময়ে বোধহয় কেহই অনর্গল অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতেপারেননা। তর্করত্ন ঐ সকলস্থলে করুণরসের প্রচুর-রূপে উদ্দীপ্তি করিয়াছেন, এবং ঐ রসেই গ্রন্থের সমাপন হইয়াছে। কুলীনকুলসর্ব্বস্বে গান ছিলনা, ইহাতে কয়েকটী গানও আছে—সে গুলিও অতি মধুর হইয়াছে। অভিনীত হইবার উদ্দেশেই এই নাটক রচিত হয়, সুতরাং ইহা কয়েকবার অভিনীতহইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

রুক্মিণীহরণ নাটক—এই নাটকের উপাখ্যান পৌরাণিক। গ্রন্থকার সে অংশে আর কোন বৈচিত্র্যসম্পাদন করিতেপারেননাই; তবে তোতলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনদাস ও দেবর্ষি নারদের কথোপকথনে অনেক পরিহাসরসিকতা প্রকাশকরিয়াছেন, কিন্তু 'ধনদাস' নামটী ব্রাহ্মণোচিত হয়নাই। তর্করত্ন ইঙ্গরেজি নাটকরচয়িতাদিগের অনুকরণে ইহাতে নান্দীপ্রস্তাবনাদি কিছুই দেন নাই, তাহাতে কথা নাই; কিন্তু তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই নাটকে ও পূর্ব্বোক্ত নবনাটকে 'গর্ভাঙ্ক' এই নামে প্রকরণবন্ধ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতেপারিলামনা। সংস্কৃত পারিভাষিক 'গর্ভাঙ্ক' শব্দে যাহা

বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে (২৬৮ পৃষ্ঠে) উল্লেখ করিয়াছি। গর্ভাঙ্ক শব্দের সেই অর্থ ত্যাগকরিয়া অপর অর্থে প্রয়োগকরা তর্করত্নের পক্ষে উচিত হয়নাই।

তর্করত্নের আর আর নাটকগুলি সংস্কৃতহইতে অনুবাদিত। তবে সে সকল অনুবাদ অবিকল নহে। আধুনিক নিয়মানুসারে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত তাহাদের রসভাবাদির অনেক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সন্নিবেশন করা হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তাদি অনেক স্থলে মন্দহয়নাই। ইহাঁর রচিত সকল নাটকই স্থানে স্থানে অভিনীত হইয়াছে। তর্করত্নের অনেক পুস্তকেই রাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন-ঠাকুরমহাশয়ের নামসংযোগ দর্শন করিতেছি; অতএব বোধ হইতেছে যে, তিনিই ঐ সকল গ্রন্থপ্রণয়নের উৎসাহদাতা। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

নীলদর্পণ—নবীনতপস্বিনী প্রভৃতি।

জিলা কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত চৌবেড়া নামকগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধুমিত্র নীলদর্পণ, নবীনতপস্বিনীনাটক প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৭৫১ শকে ইহাঁর জন্ম হয়; পিতার নাম ৺কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধু প্রথমে হূগলীকলেজে ও পরে কলিকাতা হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য এবং শেষোক্ত কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে গণনীয় হইয়া ছাত্রবৃত্ত্যাদিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কালেজ ত্যাগকরিয়া প্রথমে ডাক মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। কিয়ৎকাল সেই কার্য্য সম্পাদন করিলে পর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গুরুতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ইনস্পেকটিং পোষ্টমাষ্টারী অর্থাৎ ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়কতাপদে নিযুক্ত করেন। তদবধি অদ্যপর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন

কিন্তু ক্রমশই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার কার্য্যকুশলতাদর্শনে অতীব প্রীত হইয়া মহাসম্মানসূচক 'রায়বাহাদুর' উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন।

দীনবন্ধুবাবু সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে নীলদর্পণ নাটক প্রকাশ করেন। উক্ত নাটকে রচয়িতার নাম না থাকায় অনেক দিন সকলে তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া জানিতে পারে নাই—ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে। তৎপরে তিমি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে নবীনতপস্বিনী, ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো, ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে সধবারএকাদশী, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লীলাবতী, ১৮৭১খৃঃ অব্দে সুরধুনী এবং ১৮৭২খৃঃ অব্দে জামাইবারিক ও দ্বাদশকবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ৭ খানি গ্রন্থের মধ্যে সুরধুনী ও দ্বাদশকবিতা ভিন্ন সকলগুলিই নাটক বা প্রহসন।

নীলদর্পণ—যৎকালে কৃষ্ণনগর যশোহর প্রভৃতি প্রদেশে নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করেন, সেই সময়ে এই নাটক প্রচারিত হয়। ইহাতে গোলোকবসু নামক এক সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবারের নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে ধ্বংস হইবার বর্ণনপ্রসঙ্গে বলপূর্ব্বক প্রজার ভূমিতে নীলবপন, দাদন না লইলে তাহাদিগকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহারে দাদন গতান, গ্রাম দগ্ধকরা, নীলবপনে অনিচ্ছু প্রজাদিগের উপর মিথ্যা নালীশ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সহিত ভাবপ্রণয় করিয়া প্রজাদিগের কৃত মোকদ্দমা সকল বিফল করিয়া দেওয়া, বলপূর্ব্বক লোকের স্ত্রী পরিবারের জাতিনাশ করা, হত্যাকরা প্রভৃতি নীলকর সাহেবদিগের কৃত ভূরি ভূরি অত্যাচার সকল বিলক্ষণ কবিত্বসহকারে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থবর্ণিতরূপ অত্যাচার সকল নীলকরদিগের কর্ত্তৃক সত্য সত্যই সম্পাদিত হইত কি না? সে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু বর্ণনাপাঠ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়াযায়, এবং নীলকরদিগকে পিশাচ

রাক্ষস হইতেও সহস্রগুণে অপকৃষ্টজাতি বলিয়া বোধ জন্মে। মিথ্যা মোকদ্দমায় জেলে প্রেরিত গোলোকবসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যু, নীলকর-কর্ত্তৃক আহত গ্রন্থনায়ক নবীনমাধবের প্রাণবিয়োগ, পতিপুত্রশোকাকুলা সাবিত্রীর উন্মাদ, উন্মত্ততাবস্থায় তাঁহাকর্ত্তৃক নিজপুত্রবধূহনন, সহসা উন্মাদাপগমে জ্ঞানসঞ্চার হওয়ায় অনুতাপে তাঁহার প্রাণত্যাগ— ইত্যাদিস্থলে গ্রন্থকার করুণরসের সাতিশয় উদ্দীপ্তি করিয়াছেন। সে সকল স্থল পাঠ করিবার সময়ে কোন মতেই অশ্রুসম্বরণ করাযায়না।

নীলদর্পণ এইরূপ করুণরসপূর্ণ হইলেও ইহা যে, নাটকাংশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যাইতেপারেনা। কারণ নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমনির উদরে মুষ্ট্যাঘাত, উড়ানিপাকান দড়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরলতাকে হত্যাকরা প্রভৃতি কাণ্ডসকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারেনা। ইঙ্গরেজি নাটকে এসকল সম্পূর্ণরূপে দোষাবহ হয়না বটে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ডসকল, রঙ্গস্থলে দর্শকদিগের উদ্বেজক হয় বলিয়া, নেপথ্যে সম্পাদন করিয়া সংস্কৃত নাটকরীতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নীলদর্পণে কোন কোন অযোগ্যস্থলে সাধুভাষাসমন্বিত বক্তৃতা আছে, সেগুলি স্বভাবসঙ্গত নহে। তা ছাড়া গ্রন্থকার অকারণেও ২।১টী পাত্রকে রঙ্গস্থলে আনিয়াছেন ;—দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে দুইজন অধ্যাপককে রঙ্গভূমিতে আনিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না।

নীলদর্পণ লইয়া দিনকত হুলস্থূল পড়িয়াছিল। উহাতে বর্ণিত নীলকরকৃতঅত্যাচার সকল সাহেবদিগের গোচর করাইবার জন্য ঐ নাটক ইঙ্গরেজিতে অবিকল অনুবাদিত করাহয়। তদ্দর্শনে ইংলিষমানপত্রের সম্পাদক, আপনাদিগের খ্যাতিলোপকর পুস্তকের মুদ্রণ করিয়াছে বলিয়া, মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কলিকাতাসুপ্রীমকোর্টে অভি-

যোগ উপস্থিত করিলে লোকহিতৈষী পরমশ্রদ্ধাস্পদ পাঁদরী জে, লঙ্ সাহেব উক্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও অনুবাদকরণ জন্য সমস্ত দোষের ভার নিজস্কন্ধে লইয়া আদালতে উপস্থিত হয়েন। উক্ত আদালতের তৎকালীন জজ্ সর্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার করিয়া ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২৪এ জুলাই উক্ত মহাত্মার একমাস কারাবাস ও সহস্র মুদ্রা * অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালীরা যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহাহউক, ঐ হঙ্গামে নীলদর্পণের নাম দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও কর্ণগোচর হইতে বাকি ছিল না, ইহা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে।

নবীনতপস্বিনী দীনবন্ধু বাবুর দ্বিতীয় নাটক। ইহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, রমণীমোহন নামক রাজা দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া গর্ভবতী প্রথমাপত্নীর প্রতি বড়ই অনাদর করেন, তাহাতে বড়রাণী এক দাসীর সহিত বহির্গত হইয়া অরণ্যবাস করেন, তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। রাজপুত্র ও রাণী তপস্বিবেশে সপ্তদশবর্ষ পর্য্যন্ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হয়েন। ঐ সময়ে ছোটরাণীর মৃত্যু হওয়ায় রাজাকে সকলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং একজন রাজসভাসদের দুহিতা অপরূপলাবণ্যা 'কামিনী'কে কন্যা স্থির করেন। কিন্তু ছোট রাণীর মৃত্যুর পর রাজার মনে বড় রাণীর পূর্ব্বশোক উচ্ছলিত হওয়ায় তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত হয়েন। ইত্যবসরে তপস্বিবেশধারী রাজপুত্র বিজয় ও কামিনীর পরস্পর অনুরাগসঞ্চার হয়, এবং কামিনীর মাতা, তপস্বী হইলেও বিজয়কে কন্যাদান করিতে অভিলাষিণী হয়েন, তা-

* এই মুদ্রা কলিকাতার ৺ কালীপ্রসন্নসিংহ মহোদয় তৎক্ষণাৎ দিয়াছিলেন—সাহেবকে দিতে হয়নাই।

হ্যাতে কামিনীর পিতা কুপিত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক বিজয়কে চোররূপে রুদ্ধ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করান; তথায় অভিজ্ঞানাদিদর্শনে রাজা বিজয়কে পুত্ররূপে চিনিতে পারেন, রাণীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন এবং বিজয় কামিনীর বিবাহ হয়। এই উপাখ্যানের, নাটকরীতিতে বিস্তার ও সুকৌশল সহকারে, বর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুইটী অতি রমণীয় পদার্থ তন্মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। সে দুইটীর ছাঁচ বিলাত হইতে আনা হইয়াছে বলিয়া আমরা কোন দোষ দিইনা,—যে হেতু বিলাতীয়ের অনুরূপ দ্রব্য এদেশে উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়া দেশীয়দিগের মন মোহিত করিতে পারিলে তাহাতে বাহাদুরীও আছে—দেশের উপকারও আছে। সেই দুইটী জিনিষ্ কি?—মল্লিকা আর মালতী। ইহারা যুবতী, রূপবতী, সতী, বুদ্ধিমতী ও রসবতীর অগ্রগণ্য। স্বামী, সখী ও সখীপতির সহিত কিরূপ বিমল আমোদ করিতে হয়, তাহা যাঁহারা না জানেন তাঁহারা কিছু দিন মল্লিকা মালতীর সহচারিণী থাকিবেন। "মরণ আর কি! ভাতারের সঙ্গে ও কিলা?" মালতীর এই কথার উত্তরে মল্লিকার "তা রঙ্গ কর্‌বের জন্যে বুঝি পথের লোক্ ডেকে আন্‌বো?" এই উক্তি কত লোককে কত উপদেশ দিতে পারে। মিছা মিছি রাজী হইয়া জলধরকে তাহার স্ত্রীরদ্বারা ঝাঁটা খাওয়ান, তৎপশ্চাৎ তাহাকে স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আল্কাৎরা তুলা মাখাইয়া হোঁদল কুঁৎকুঁতে রূপে লৌহপিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যগুলি যদিও কুলবালার পক্ষে কিছু অসঙ্গত হয়, তথাপি যখন্ ঐ সকল কার্য্য তাহাদের পতির জ্ঞাতসারে হইয়াছিল এবং যখন্ জলধরের আকারপ্রকার ঐরূপ, তখন্ তাহা দোষাবহ হইতে পারেনা। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় নবীনতপস্বিনীর মল্লিকা মালতীর বিবরণটী সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও প্রীতিপ্রদ।

রতিকান্ত, জলধর, জগদম্বা, রাজা, মাধব, গুরুপুত্র, সুরমা, বিদ্যাভূষণ, বড়রাণী, বিজয়, কামিনী প্রভৃতি নাটকোক্ত অপরাপর পাত্র-

গুলির চরিতও প্রায় সর্ব্বস্থলেই স্বভাবসঙ্গতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি মধ্যে মধ্যে——

" মাছ্ মরিল বেরাল কাঁদে শান্ত করলে বকে।
বেঙের শোকে সাঁতারপানি হেরি সাপের চকে॥"
" মালতী মালতী মালতী ফুল। মজালে মজালে মজালে কুল॥"
——" আমরি আমরি যমেরই ভুল॥"——
" মধুপান কত্যেপারি। মাচির কামড় সৈতে নারি॥"
" কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি।
পতিপায় থাকে মন তারে বলি সতী॥"
" স্বামিমুখে মন্দ কথা সাপিনীদশন।
ফুটিলে মানিনীমনে, অমনি মরণ॥"

এইরূপ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি দিয়াছেন, তাহা সেই সেই স্থানে কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহাবর্ণনীয় নহে। ফলতঃ নবীন-তপস্বিনীখানি একটী উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার কয়েক স্থলে যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ও অনুচিত ঘটনার বর্ণন আছে—তাহা আমরা আর উল্লেখ করিলাম না। দীনবন্ধুবাবু নীলদর্পণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন রচনা করেন নাই, এই জন্য অনেকে বলিত, " দীনবন্ধুবাবু তাদৃশ কবি নহেন—নীলদর্পণও ভাল হয়নাই—কেবল সময়গুণে লোকের আদৃত হইয়াছিল "—নবীনতপস্বিনী প্রকাশিতহইবার পর অবধি তাঁহাদের সে মুখ বন্ধহইয়াছে। এই নাটক কয়েকস্থানে অভিনীতও হইয়াছে।

লীলাবতী—দীনবন্ধুবাবুর তৃতীয় নাটক। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায়নামক এক সমৃদ্ধ ব্যক্তি আপনার গুণবতী কন্যা লীলাবতীর নদেরচাঁদ নামক নিতান্ত দুশ্চরিত্র একশ্রেষ্ঠ কুলীন পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার কল্পনা করেন। কিন্তু লীলাবতী পূর্ব্বহইতে আপনাদিগের বাটীতে প্রতিপালিত রূপগুণশালী ললিতমোহন নামক যুবকের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় ইহা জানিতেপারিয়াও ললিতকে লীলাবতী দানকরিতে ইচ্ছুক হয়েননাই। কারণ তাঁহার

পুত্র অরবিন্দ বার বৎসরকাল নিরুদ্দেশ থাকায় তিনি ললিতকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণকরিয়া লীলাবতীকে বড় কুলীনে দিবার মানস করিয়াছিলেন। লীলাবতী নদের চাঁদের হস্তে না পড়িয়া ললিতের পত্নী হয়, এজন্য ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, চট্টোপাধ্যায়ের শ্যালক শ্রীনাথ, অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী, লীলাবতীর সই সারদাসুন্দরী প্রভৃতি সকলেই নিতান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার কোন ফল হইবে না বুঝিয়া ললিত, চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে পলায়ন করেন, সুতরাং চট্টোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য অপর একটী বালক স্থির করিতেহয়। অরবিন্দ আপন জনকের রক্ষিতা স্ত্রীর কন্যা চাঁপাকে নিজপত্নীভ্রমে আলিঙ্গনকরিয়া তৎপ্রায়শ্চিত্তার্থই বহির্গত হইয়াছিলেন। ঐ চাঁপা সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমণ করিয়া অরবিন্দকে নানা সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন এবং চট্টোপাধ্যায়ের পোষ্যপুত্র লইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই অরবিন্দ সাজিয়া তথায় উপস্থিত হয়েন। ইহার ২।৩ দিন পরেই ললিতের সহিত প্রকৃত অরবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে মহাগোলযোগ ঘটে, পরে প্রথম অরবিন্দ পুরুষবেশ ত্যাগকরিয়া চাঁপারূপে প্রকাশিত হইলে গোলযোগের নিবৃত্তি এবং ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয়—এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পরমকৌশলসহকারে এই নাটকের রচনা করা হইয়াছে। বর্ণিত পাত্রগুলির প্রকৃতিসকল প্রায় সর্ব্বস্থলেই যথাযথ সংরক্ষিত হইয়াছে। হেমচাঁদের সহিত সারদাসুন্দরীর কথোপকথন ও হেমচাঁদের কটুবাক্যে সারদার বাক্স উল্টাইয়া ফেলা অতি মনোরম হইয়াছে; চট্টোপাধ্যায়ের কুলান্ধতা, শ্রীনাথের গোয়ার্ত্তুমী, কন্যাপ্রদর্শনসময়ে হেমচাঁদ ও নদের চাঁদের বক্তৃতা, ক্ষীরোদবাসিনীর বিলাপ, লীলাবতীর প্রলাপ, সন্ন্যাসিবেশধারিণী চাঁপার ব্যবহার এসকলগুলিই অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধুবাবু এক জন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক, সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকে উপাখ্যা-

নের মনোরম বৈচিত্র্য থাকা যেরূপ সম্ভাবিত, এগ্রন্থে তাহাই আছে।

দীনবন্ধুবাবু খুব রসিক লোক। তিনি নানাদেশ ভ্রমণকরিয়া অনেক খোস্‌গল্প সংগ্রহকরিয়াছেন এবং সেই গুলি পুস্তকমধ্যে প্রবেশ করাইতেছেন। সেরূপ করায় অনেকস্থলই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে বোধহয় সেই গল্পগুলি প্রকাশ-করিবার জন্যই সেই সেই প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। কন্যা-প্রদর্শনাবসরে রঘুয়াভৃত্যকে আনয়নকরিয়া তন্মুখ হইতে ‘অপ্পিকে সপ্পিকে লোকে’ ইত্যাদি উড়িয়া শ্লোক প্রকাশকরা এবং মাতালসভায় রস ও ভূতের বিচার করাই তাহার প্রমাণ। আমাদের বিবেচনায় ঐ গুলি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। সে যাহাহউক, নদেরচাঁদ গাঁজা, গুলি ও মদ খায় বলিয়াই তাহার প্রতি শ্রীনাথের তাদৃশ ঘোরতর বিদ্বেষ, কিন্তু দীনবন্ধুবাবু সেই শ্রীনাথকেই মদ, গাঁজা ও গুলিতে বুঁদ করিয়া তুলিয়াছেন! ইহা সঙ্গত হয়নাই।’ শ্রীনাথ স্বয়ং বিশুদ্ধচরিত থাকিয়া নদেরচাঁদের প্রতি ঐরূপ উদ্ধতভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিলে তাহা সঙ্গত হইত। গ্রন্থকার হেমচাঁদের বক্তৃতামুখে পয়ারকে গয়ার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই বলুন দেখি, লীলাবতী, সারদাসুন্দরী ও ললিত প্রভৃতির মুখে যে সকল দীর্ঘ দীর্ঘ মাইকেলী ছন্দ নিক্ষেপকরিয়াছেন, তাহাকি গয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে? যাঁহারা লীলাবতীর অভিনয়দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ঐ সকল কবিতা শ্রোতার কিরূপ কর্ণশূল হয়।’

বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো সধবার একাদশী ও জামাইবারিক এতিন খানি প্রহসন। দীনবন্ধু বাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, রসিকতা ও উপাখ্যান-রচনাচাতুর্য্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, এই তিনখানিই তাহার উপযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই তিন পুস্তকেরই আদ্যোপান্ত হাস্যরসে পরিপূর্ণ; মধ্যেমধ্যে করুণরসেরও আবির্ভাব আছে। সে গুলিও অতি মনোহর হইয়াছে। বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো নামক পুস্তকে, ঐরূপ

এক বৃদ্ধব্রাহ্মণকে নাচাইয়া গ্রামের কোন ভদ্রলোককর্ত্তৃক শিক্ষিত কয়েকজন বিদ্যালয়ের ছাত্র মিছামিছি বিবাহদিয়া কৌতুক করিয়াছে। কৌতুক বেশ আমোদজনক হইয়াছে এবং স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অধিকবয়সেও পুনর্ব্বার বিবাহ করণেচ্ছু লোকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রদও হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কনক বাবু বিজ্ঞ লোক হইয়াও স্কুলের অল্পবয়স্ক ছেলেগুলিকে অমনতর বেলেল্লাগিরি কাজ করিতে শিক্ষাদিয়া ভাল করেননাই। আর তা ছাড়া, ঐ ছেলেগুলো বাসরঘরে শালীশালাজপ্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।

সধবার একাদশী খানিমদের কথাতেই আরব্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্য্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বথামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ। সমাজপ্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্টসঙ্ঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্রশোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনকরিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই, বোধহয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতকগুলা বথামীর গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজারও সোণাগাছী প্রভৃতিস্থানে দৈনন্দিন যেসকল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত। উল্লিখ্যমান প্রহসনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামী, ও বেশ্যা প্রভৃতি লইয়া সমান চলাচলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসনরচনার কি প্রয়োজন ছিল? তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ফলতঃ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসাঁমাজিকলো-কের হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে।

জামাইবারিক প্রহসনখানির উপাখ্যান সমধিকচাতুর্য্যসম্পন্ন। বিজয়বল্লভ নামক এককায়স্থ জমীদার বড় বড় কুলীনসন্তানদিগকে কন্যাদান করিয়া ঘরজামাইএ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকলের একত্র অবস্থানের জন্য একটী পৃথক্ প্রশস্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়া-ছিলেন—লোকে ঐ গৃহকে জামাইবারিক বলিত। জামাইএরা তথায় থাকিয়া গাঁজা গুলি মদ খাইতেন এবং সময়মত পাস্ পাইলে তবে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের স্ত্রীরা অনেকেই স্ব স্ব স্বামীর প্রতি নিতান্ত সাহঙ্কার ব্যবহার করিত। অভয়কুমার নামে ঐরূপ এক জামাইছিলেন। একদা তাঁহার স্ত্রী পদাঘাত করিব, বলায় তিনি অভিমানে শ্বশুরবাটী হইতে চলিয়া আইসেন এবং দুই পত্নীর বিবাদানলে দহ্যমানশরীর পদ্মলোচন নামক নিজ প্রতিবাসীর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবনগমনপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এ দিকে অভয়ের স্ত্রী কামিনী পতির অবমাননাকরণজন্য অনুতাপে তাপিত হইয়া পতির অন্বেষণার্থ সভর্ত্তৃকা এক বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনীর সহিত বৃন্দাবনগমন করিয়া বৈষ্ণবীবেশে থাকেন। তথায় বৈষ্ণবরূপী অভয়ের সহিত কণ্ঠীবদল হইলে পর সমুদয় প্রকাশিত হয়—ইহাই এই প্রহসনের স্থূল মর্ম্ম।

জামাইদিগের অতদূর দুরবস্থা, দুই পত্নীকর্ত্তৃক পদ্মলোচনের শরীর ভাগ করিয়া লওয়া ও একের ভাগে পতিত স্বামীর অঙ্গে অন্যের আ-ঘাতাদি করা, রাত্রিকালে স্বামিভ্রমে চোরকে ধরিয়া দুই সতীনের ওরূপ কাড়াকাড়ি ও প্রহার করা প্রভৃতি কার্য্যগুলি নিতান্ত অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইয়াছে—সুতরাং সেই সেই অংশগুলি তত প্রীতিকর না হউক, অপর সমুদয় অংশ বিলক্ষণ মনোহর হইয়াছে। ভবীময়রাণী, হাবার মা ও কামিনীর পরস্পর কথোপকথন, বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য

জামাইদিগকে পাস্ দেওয়ার অবসরে গ্রন্থকারের সকল বন্ধুরই নামোল্লেখ ও কৌশলক্রমে যবনজাতীয় আব্দুল লতিফ্‌কেও তন্মধ্যে আনয়ন, স্বামীর অবমাননা করিয়াই হঠাৎ কামিনীর অনুতাপ উপস্থিত হওয়া, এবং বৃন্দাবনে মিলনের সময়ে কামিনীর মনের সমুদয় কথা খুলিয়া খেদ করা, এই সমুদয়স্থলেরই বর্ণনাবসরে কবি বিলক্ষণ কবিত্ব ও পরিহাসরসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। রামায়ণ ও পীরের গানগুলি নূতন না হইলেও বিলক্ষণ কৌতুককর হইয়াছে। কৌলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘরজামাইএ রাখেন বা ঘরজামাইএ থাকেন, এই পুস্তকের পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।

সুরধুনীকাব্য ও দ্বাদশকবিতা এ দুইখানি পদ্যময়। হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী নদ নদী পর্ব্বত দেশ নগর গ্রাম ও তত্তৎস্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এবং প্রধান প্রধান বস্তু ও ব্যক্তিদিগের বর্ণনাকরাই এই গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কবি যুবতীগঙ্গাকে পদ্মাসখীর সহিত পিতৃভবন হিমালয় হইতে পতি সাগরের সমীপে প্রেরণ করিবার উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই কল্পিত উপাখ্যান বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক স্থানের অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। যে সকল প্রসিদ্ধ নগরাদি গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী নহে, গঙ্গায় পতিত যমুনা সরযূ ঘর্ঘরা কৌশিকী প্রভৃতি সখীরূপা অপরাপর নদীদিগের মুখে সে সকলেরও বর্ণনাকরা হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থ (১মভাগ) পাঠে হিমালয় হইতে ত্রিবেণীপর্য্যন্ত নদীসন্নিহিত অনেক প্রধানপ্রধান স্থানের বিবরণ কাব্যরসাস্বাদসহকারে জ্ঞাত হইতে পারাযায়।

দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থসমালোচনা করিলে হয় ত তিনি অপর কোন গ্রন্থমধ্যে সমালোচককে "রিফিউ লেখক ভোঁতারাম ভাটের" মত কোন নাম দিয়া উপহাস করিবেন। তা-করুন—কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, দীনবন্ধুবাবু পূর্ব্বোল্লিখিত

নাটকগুলি রচনাকরিয়া যেরূপ যশোলাভ করিয়াছেন, সুরধুনীকাব্যে সেরূপ করিতে পারেন নাই। ইহার কবিতাসকল সর্ব্বস্থলে প্রীতিকর হয়নাই—এমন কি, ইহারও অনেক পদ্য "কেবল চৌদ্দোয় চেনা যায়"। ইঙ্গরেজিতে যাহাকে 'এনাক্রনিজম্' অর্থাৎ কালিকদোষ কহে, ইহাতে তাহাও সজ্ঘটিত হইয়াছে। কবির রচনায় গঙ্গার হিমালয় হইতে সাগরগমনের প্রথম সময়ই প্রকাশিত হয়, কিন্তু তখন কাশীর মানমন্দির, বহরমপুরের কালেজ, কৃষ্ণনগরের কার্ত্তিকবাবুর গান—এসকল কোথায় ছিল? এই গ্রন্থের বিষয়ও কবির নূতন উদ্ভাবিত নহে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণচণ্ডী, মনসারভাসান, ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এই ৪খানি প্রাচীন পুস্তকে প্রায় এইরূপ বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বোধহয়, এ গ্রন্থখানি লোকের যে, তত প্রীতিপ্রদ হয় নাই, তাহা দীনবন্ধুবাবু নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং সেই জন্যই ইহার দ্বিতীয়ভাগপ্রকাশে ক্ষান্তথাকিয়া অপরাপর পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন।

দ্বাদশকবিতা—'শকুন্তলার তনয়দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব' 'চন্দ্র' 'সূর্য্য' 'কোকিল' ইত্যাদি দ্বাদশটী পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের বর্ণনা একত্র করিয়া এই পুস্তক নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত কোন কোন কবিতা পূর্ব্বে সংবাদপত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার, শ্রীযুক্তঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক—বঙ্গভাষা আপনার তনয়া" এই বলিয়া পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকের কবিতাসকল আদ্যোপান্ত উৎকৃষ্ট না হউক, কিন্তু অধিকাংশই যে, অতি সুন্দর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা ঐবিষয়ের বাহুল্য না করিয়া পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ একটী কবিতা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতৎপাঠে তাঁহারা ঐ পুস্তকের দোষগুণ কতক বুঝিবেন।

পরিণয়।

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়, সুখমন্দাকিনীর নিদান।
মানব মানবীদ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়, করিবার বিশুদ্ধ বিধান ॥
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মীনারায়ণ, বসে সুখে আনন্দ অন্তরে।
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ, যেন স্বর্গ ভুবনভিতরে ॥
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবারাতি, বিনোদ কুমুদ বিকসিত।
আনন্দ বসন্তবাস, বিরাজিত বারমাস, নন্দনবিপিন বিনিন্দিত ॥
যেদিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়, গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে, পিরীতি পূরিত বাণী বলে—
"তব সন্নিধানে সতি! অমলা অমরাবতী, ভুলে যাই নরনশ্বরতা;
অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়, ব্যাধি বলে বিনয়বারতা ॥"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহেরসাগরে ভেসে, বলে "কান্ত! কামিনী কেমনে;
বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে, পতিত পতির অযতনে?"
নবশিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি, পেলে কোলে কালসহকারে।
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ, কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে ॥

আলালেরঘরের দুলাল প্রভৃতি।

কলিকাতানিবাসী শ্রীযুত প্যারীচাঁদমিত্র 'টেক্‌চাঁদঠাকুর' এই কল্পিতনামে অন্তরিত থাকিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' 'মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়' 'রামারঞ্জিকা' 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'অভেদী' প্রভৃতি নামে কয়েকখানি গদ্যগ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে আলালের ঘরের দুলালই প্রথম ও প্রধান।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার বাবুরামবাবু নামক এক পল্লীগ্রামস্থ জমীদারের আচারব্যবহার, তাঁহার প্রশ্রয়প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠপুত্র মতিলালের বিদ্যাশিক্ষা ও দুশ্চরিত্রতা ও কনিষ্ঠপুত্র রামলালের বরদাপ্রসাদবিশ্বাস-নামক এক সদাশয় ধর্ম্মশীলব্যক্তির সহবাসে সদ্‌গুণলাভ প্রভৃতি অবল-

স্থন করিয়া একটী অনতিদীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণনকরিয়াছেন। ঐ উপাখ্যানের মধ্যে পল্লীগ্রামস্থ অনেক জমীদারে দোল দুর্গোৎসব নাচ তামাসা প্রভৃতিকার্য্যে মুক্তহস্ত হইয়াও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাদি আবশ্যক কার্য্যে যেরূপ কৃপণতা করেন, কোন লোককে জব্দ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার উপর যেরূপ মিথ্যা নালীশ উপস্থিত করেন—কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাদী সাক্ষী, মোক্তার, উকীল, আদালতের আমলা প্রভৃতি যেরূপে তাঁহাদের ধনশোষণ করে, অধর্ম্মী বঞ্চক জালকারক মুখসর্ব্বস্ব ব্যক্তিবিশেষকে সর্ব্বকর্ম্মসুদক্ষ মনে করিয়া তাহার পরামর্শে তাঁহারা যেপ্রকারে নানা কুক্রিয়ায় রত ও পরিশেষে বিপজ্জালে জড়িত হয়েন, তাহা বাবুরামের চরিতে বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ছেলে বাল্যকালে পিতামাতার অনুচিত প্রশ্রয় পাইলে এবং সৎশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইলে যেরূপ বিগড়িয়া যায়, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহার নানা কুক্রিয়া যেপ্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ধনবান বালকের সহিত দেশের অসৎ বালক জুটিয়া যেপ্রকারে তাহাকে অধঃপাতে দেয়, তাহা মতিলালের চরিতবর্ণনে বিশেষরূপে চিত্রিত হইয়াছে—কুপরামর্শদায়ী স্বার্থপর দুষ্টলোকে স্বার্থসাধনোদ্দেশে লোকের কি সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা ঠকচাচা ও বাঞ্ছারামে বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে—এবং সৎপরামর্শে ও সাধুসঙ্গে লোকের চরিত্র কিরূপ বিশুদ্ধ হইতেপারে, তাহা বরদাবাবু বেণীবাবু বেচারামবাবু ও রামলালের চরিত্রে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বড়মানুষের সভা, কলিকাতার আদিবৃত্তান্ত, পোলিস, বাজার, বিবাহেরঘোঁট, বরযাত্রীদিগের দুর্দ্দশা, মাজিষ্ট্রেটের কাছারি, সমারোহশ্রাদ্ধ, নীলকরের উপদ্রব প্রভৃতি নানাবিষয়ের সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে। উপাখ্যানটী আগ্রহের সহিত শুশ্রূষণীয় না হউক, শিক্ষাপ্রদ বটে। পরমশত্রু ঠকচাচা ও বাবুরামের প্রতি বরদাবাবুর অনুগ্রহ, কুক্রিয়াশীল মতিলালের দুরবস্থার একশেষ, নষ্টমতি ঠকচাচার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস, ধর্ম্ম-

পরায়ণ রামলালের সর্ব্ববিধ সুখলাভ ইত্যাদি অনুধ্যানকরিলে 'ধর্ম্মের জয়—পাপেরনাশ' এই কথার তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাযায়।

গ্রন্থবর্ণিত অনেক বিষয়ই স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি আবার নিতান্ত অস্বাভাবিকও বোধহয়: মতিলালের বদ্‌মাহেশী বড় অত্যুক্তিদূষিত হইয়াছে। তাহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বলিল 'মতি! তোমার ভগিনী ও বিমাতার সকলদিন আদ্‌পেটা খাওয়াও হয় না; মতি অমনি রাগিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া মাএর গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল'! একথা কি মনে ধারণা করাযায়? ঐরূপ প্রহার করাইবার অগ্রে মাএর সহিত কোনরূপ কলহ করাইলে ভাল হইত না কি?—গ্রন্থকার একস্থলে বাবুরামের স্ত্রৈণতাবর্ণনে লিখিয়াছেন—"স্ত্রী 'এ জলনয় দুধ্' বলিলে বাবুরাম চোখে দেখিয়াও অমনি বলিতেন, 'তাইত—এজল নয়—এ দুধ্'—স্ত্রী উঠ্ বলিলে উঠিতেন—বস্ বলিলে বসিতেন।" ইত্যাদি—কিন্তু সেই বাবুরামের, তিনি কি বিবেচনায় ঘটকালী করিয়া, স্ত্রীপুত্রাদিসত্ত্বে বুড়বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইলেন? যে পুরুষ স্ত্রীর অমন ঘণ্টারগরুড়, তাহার কি আবার বিবাহ করিতে সাহস হয়?—বাবুরামের স্ত্রী মতিলালকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুবতীকন্যাকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনগমন করিলেন। বৃন্দাবন বৈদ্যবাটীর নিকটে নয়—তথা হইতে প্রায় ৩ মাসের পথ। দুইটী চিরগৃহকদ্ধা যুবতী স্ত্রী নিঃসম্বলে ও নিরবলম্বনে ধর্ম্মবজায় রাখিয়া কিরূপে অত পথ যাইতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু লেখা উচিত ছিল।

এস্থলে আর একটী বিষয় উল্লেখ্য হইতেছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কষ্টস্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনাকরাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহস্র ক্লেশভোগ করিয়াও তাহা করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন।

অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশে স্বতন্ত্ররূপ—ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোধহয় কোন দেশে নাই। অধ্যাপকেরা বৈষয়িকসুখে বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানবিতরণকার্য্যেই সর্ব্বদা নিরত থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যক-ব্যয়নির্ব্বাহার্থ দেশীয় ধার্ম্মিক বিজ্ঞলোকেরা শ্রাদ্ধবিবাহাদি সকল কার্য্যের উপলক্ষেই তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দানকরিয়াথাকেন। তাহাই অধ্যাপকদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্দ্বারা তাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিবারদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহকরিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া অভিলষিতকার্য্যে চিরজীবন যাপন করেন। অতএব আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্যকর্ম্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন্‌জাতির মধ্যে কত আছেন? যদিও উৎসাহ-বিরহাদি নানাকারণে এক্ষণে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিতে নির্দ্দিষ্টব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেননা, তথাপি সাধারণ্যে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপরে প্রাচীন ও নব্য উভয়তন্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গৌরববুদ্ধি আছে; যেহেতু তাঁহারা, আপনাদিগের মধ্যে একদল ঐরূপ মহেচ্ছ লোক আছেন, এজন্য ভিন্নজাতীয়দিগের নিকট গর্ব্বকরিয়া থাকেন, কিন্তু পাঠকগণ! দেখুন, হিন্দুজাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়দিগের প্রতি টেক্‌চাঁদবাবু কিরূপ বিজ্ঞোচিত বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন! তিনি বাবুরামের শ্রাদ্ধবর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"দিন রাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন যেন গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ।" !!—কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপরেই কেন? ব্রাহ্মণজাতির প্রতিই টেক্‌চাঁদবাবুর যেন কিছু বিদ্বেষ আছে বোধহয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন "বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে সব কথা তলিয়া বুঝিতে পারে না—ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়" ইত্যাদি—এক্ষণে টেক্‌চাঁদবাবুর প্রতি আমাদের

জিজ্ঞাস্য এই যে, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটাবুদ্ধির কর্ম্ম? এপর্য্যন্ত ঐ 'মোটাবুদ্ধি' ব্রাহ্মণভিন্ন কয়জন সূক্ষ্মবুদ্ধি ইতরজাতীয়লোকে ন্যায়-শাস্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? এদেশে ব্রাহ্মণেরাই চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চা ও বুদ্ধির পরিচালনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের সন্তানেরা, সাধারণ্যে, অপরিশীলিতবুদ্ধি অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা অধিক মোটাবুদ্ধি হইবেন, তাহা সম্ভব নহে।

এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইতি-পূর্ব্বে যেসকল বাঙ্গলা পুস্তক রচিতহইয়াছে, তাহাদের ভাষা অপেক্ষা ইহার ভাষা কিছু স্বতন্ত্ররূপ;—সাধারণ লোকে সচরাচর যেরূপ ভাষায় কথোপকথন করে, এই পুস্তকের অধিক ভাগই সেইরূপ গ্রাম্য ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অগ্রে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—যথা—

"শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গোরু চল্‌তে পারেনা বলে লেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছক্‌ড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছক্‌ড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুম্দার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স্ টংয়স্ ডংয়স্ ডংয়স্ করিয়া চলিতেছে—পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনক্রমেই চাল্ বেগড়ায় না।" ইত্যাদি।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা অবলম্বনকরা ভাল? কি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারাদিপ্রবর্ত্তিত ভাষা গ্রহণকরা ভাল?—এ প্রশ্নের মীমাংসা করা কিছু কঠিন। কারণ-লোকের রুচিই এ বিষয়ের প্রমাণ—সকল লোকের যাহা ভাল লাগিবে, তাহাকে অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে। দেখাযাইতেছে যে, এইরূপ ভাষার রচনাই এক্ষণে অনেক লোকের অধিক প্রীতিপ্রদ হইতেছে, এবং

সেই জন্যই এইরূপ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং দিন দিন তাদৃশ পুস্তকের সঙ্খ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। ৺.কালীপ্রসন্ন সিংহ এবম্বিধ ভাষাতেই 'হুতোম্‌পেচার নক্‌সা' প্রণয়নকরিয়া সমাজে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। আজি কালি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে সকল উপাখ্যান-পুস্তক লোকে আদরপূর্ব্বক পাঠকরিয়াথাকেন, তাহাদেরও ভাষা কিয়ৎপরিমাণে প্রায় এইরূপ। অতএব এই ভাষা সাধারণ লোকের কতক মনোরঞ্জন করিয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ-গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতেপারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালেরঘরেরদুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠকরিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারিনা। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণকরিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালীভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধহয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠকরিতে লজ্জাবোধহয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়-বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনাকরা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়াযায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও

কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয়না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তনকরণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণকরা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানাপ্রকার; একবিধ রচনাপাঠে সর্ব্ববিধ পাঠক-দিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নহে, অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহাহউক আমাদের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘুবিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণকার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী গুরুতর বিষয়ের কথা আমাদের মনে উদিত হইল। অল্পদিন অতীত হইল সিবিল সর্বিস্ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জন্ বীম্‌স সাহেব বাঙ্গালা ভাষাবিষয়ে একখানি ইঙ্গরেজিপুস্তিকা প্রচারকরিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তিকায় বঙ্গভাষায় পুস্তকরচনাবিষয়ে একটী প্রস্তাব করিয়াছেন। সে প্রস্তাবের স্থূল তাৎপর্য্য এই—

'এক্ষণে দুই দল লোকে বাঙ্গালায় পুস্তক রচনাকরিতেছেন, তন্মধ্যে একদল প্রচুর সংস্কৃতশব্দ ব্যবহারকরেন এবং অপর দল ইতর ও চলিতভাষা পুস্তকমধ্যে নিবেশিত করেন। অতএব ঐরূপ দলাদলী ভাব না থাকিয়া যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইয়া একরূপ দাঁড়ায়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাকরা কর্ত্তব্য। তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরোপের নানাদেশীয় সাহিত্য-সমাজের ইতিবৃত্তের উল্লেখকরিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালাসাহিত্যের ভাষানির্ণয়ের জন্য একটী সভা-করা আবশ্যক। ঐ সভাহইতে যে অভিধান প্রকাশিত হইবে, তাহার অনন্তর্গত কোন শব্দ বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে পারি-বেনা, এরূপ নিয়মকরা কর্ত্তব্য'—ইত্যাদি।

বীমস সাহেব ভিন্নদেশীয় হইয়া আমাদের ভাষাব্যবস্থাপনের

জন্য যে, এত যত্নশীল হইয়াছেন, তদর্থ তাঁহাকে আমরা শতবার ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতেপারিনা; বাঙ্গালাকে সংস্কৃতভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ়, স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দসকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিরূপে রচনার ব্যবস্থাকরা কর্ত্তব্য, তিনি উক্ত পুস্তিকামধ্যেই নিজের, এই যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কিন্তু সেই ব্যবস্থাকরণার্থ সভা ও অভিধান প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থকারদিগের হস্তপদবন্ধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধকরিনা; যেহেতু সময়ের গতি ও সমাজের রুচি অনুসারে আপনাহইতেই সেরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে—অথবা উঠিবেই কেন, কতকদূর উঠিয়াওছে। এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ উৎকৃষ্ট লেখকেরাও দীর্ঘসমাস-সমন্বিত বাক্যরচনা প্রায় করেননা, এবং অভিমত অর্থের প্রতিপাদক সাধুশব্দ না পাইলে তত্তৎস্থলে অপর ভাষাও গ্রহণ করিয়া থাকেন—এদিকে আলালীভাষার পক্ষপাতীদিগেরও অনেক ভাললোকে এখন বুঝিতেছেন যে, চলিত গ্রাম্যভাষা কখনও পুস্তকের ভাষা হইতে পারেনা এবং সে ভাষায় পুস্তকরচনা করিলে তাহা বিজ্ঞসমাজে সম্যক্ প্রশংসা পায় না। ফলকথা যখন্ এইরূপে আপনা হইতেই ভাষার স্থায়িরূপ আকার দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন্ আর তদর্থ নিয়মস্থাপনের প্রয়োজন কি?—আর করিলেইবা স্বাধীনরুচি বিজ্ঞলেখকেরা আপনাদের অনভিমত বোধ করিলে কেন তাহা প্রতিপালন করিবেন?—তবে রাজশাসন হয়, সে ভিন্ন কথা—কিন্তু এজন্য রাজশাসন হওয়াও বড় বিড়ম্বনার বিষয়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা 'সাহিত্যে'র নিমিত্ত কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ না হউক ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ইঙ্গরেজিগ্রন্থে যেসকল বাচক, লাক্ষণিক বা

পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত আছে, বাঙ্গালাভাষায় সেগুলিকে আনিয়া ব্যবহার করিবার জন্য একটী নিয়মস্থাপন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃতগ্রন্থে যতদূর পাওয়াযায়, তাহা অবিকল লইয়া এবং যাহা না পাওয়াযায়, সরল ও সুসঙ্গত ভাষায় সুবিজ্ঞলোকদিগের দ্বারা তাহা অনুবাদিত করিয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থরচনা করিবেন, তাঁহাদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারেরা আপনাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে সঙ্কলিত নূতন নূতন শব্দের প্রয়োগ করায়, সে সকল বুঝিবার জন্য পাঠকদিগের যে ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অপগত হইবে।

টেকচাঁদঠাকুরপ্রণীত অপর পুস্তকগুলির মধ্যে আর কোনখানিই আলালেরঘরের দুলালের সমান প্রীতিপ্রদ হয় নাই। কিন্তু সকলগুলিই আলালীভাষায় লিখিত। তাঁহার ২য় পুস্তক 'মদখাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়'। ইহাতে পরস্পর অসম্বদ্ধ কয়েকটী মাতলামী ও বখামীর গল্পমাত্র আছে। তৎপাঠে বিশেষ কোন লাভ নাই। তাঁহার তৃতীয় পুস্তক রামারঞ্জিকা। ইহাতে পতি ও পত্নীর কথোপকথনচ্ছলে এমত সকল বিষয়ের বিবরণ আছে, যাহা পাঠ করিলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক অনেক বিষয়ে অনেক উপদেশলাভ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সকল কথার মধ্যে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির সংস্কৃতবচন সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া মনঃসংযম মোক্ষ প্রভৃতির যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বোধহইল না। কারণ উপদেশ্যা পদ্মাবতীকে উক্তরূপ উপদেশের বোধসমর্থা বিদুষী বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনকরা হয়নাই। গ্রন্থকার হরিহর ও পদ্মাবতীর উক্তি প্রত্যুক্তিতেই গ্রন্থ চালাইতেছিলেন কিন্তু অকস্মাৎ ১৮শ অধ্যায় হইতে "আমার পিতা সৌদাগরী কর্ম্ম করিতেন" ইত্যাদি বলিয়া যে তিন ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন, কি সঙ্গতিক্রমে

সে স্থলে সেগুলির অবতারণা করা হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিলাম না!।

টেকচাঁদের ৪র্থ পুস্তক গীতাঙ্কুর। ইহাতে ব্রহ্মবিষয়ক অনেকগুলি গীত আছে—নিম্নভাগে তাহার একটী উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া।

"বিপদ কে বলে বিপদ।
বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥
তুমি হে প্রেমআধার, প্রেম করহ বিস্তার,
চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ॥
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ,
পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ॥
বিপদে ঔষধ ধন, মন করি সংশোধন,
করিয়া পাপনিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ,
বিপদে সম্পদে যেন, ভাবি ঐ পদ॥"

'যৎকিঞ্চিৎ' নামক পুস্তক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনা প্রভৃতিবিষয়ক। ইহা এবং 'অভেদী' এ দুই খানিই একপ্রকার ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক—সাহিত্যগ্রন্থ নহে, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই।

দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি।

শ্রীযুতবঙ্কিমচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী নামে তিনখানি আখ্যায়িকা রচনাকরিয়াছেন। ইনি চুঁচুড়ার পরপারস্থ কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৭৬০ শকে [১৮৩৮ খৃঃ অঃ] জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শ্রীযুতযাদবচন্দ্রচট্টোপাধ্যায় বহুকাল ডেপুটী কালেক্টরী কার্য্য করিয়া এক্ষণে পেন্সনভোগ করিতেছেন।

তাঁহার ৪ পুত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বহুদিন হুগলীর মহম্মদ মসীন্ কালেজে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সিকালেজে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় বি,এ, পাস করেন—এক্ষণে বি,এল, উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালেজে অবস্থানকালেই ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত—অবশ্য উন্নতির সহিত—সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

কালেজে পঠদ্দশার সময় হইতেই বঙ্কিমবাবুর বাঙ্গালারচনায় অনুরাগ ছিল, এজন্য মধ্যে মধ্যে পদ্য লিখিয়া প্রভাকরাদি সংবাদ-পত্রে প্রকাশকরিতেন। ঐ অবস্থায় 'ললিতা-মানস' নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সেখানি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এই পুস্তকপ্রকাশের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি কোন বাঙ্গালারচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৎপরে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভকরিয়া এপর্য্যন্ত পূর্ব্বোল্লিখিত ৩খানি পুস্তক রচনাকরিয়াছেন। তন্মধ্যে সময় ও গুণ উভয়েই দুর্গেশনন্দিনীই প্রথম।

দুর্গেশনন্দিনী, একটী ঐতিহাসিক উপন্যাস। গড়মান্দারণ নামক গ্রামের কোন দুর্গে পূর্ব্বকালে বীরেন্দ্রসিংহ নামা এক জায়গীর-দার আধিপত্য করিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্তহইয়া হীনবংশীয়া এক কামিনীর পাণিগ্রহণ ও তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপাদন করায় নিজ পিতা কর্ত্তৃক অবমানিতহইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌দিগের রাজপুতসেনামধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভকরেন। তিনি স্বগ্রামে যে কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উক্ত স্থানস্থ শশিশেখর নামক এক ব্রাহ্মণের উপপত্নী-গর্ভজা। শশিশেখর ঐ উপপত্নীগ্রহণ জন্য লজ্জায় দেশত্যাগীহইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য এক দণ্ডীর নিকট বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তথায়ও এক শূদ্রার গর্ভে কন্যা উৎপাদনকরায় গুরুকর্ত্তৃক অবমানিতহইয়া কিয়ৎকাল নিরুদ্দেশ ছিলেন। পরে

পরমহংস হইয়া 'অভিরামস্বামী' এই পরিবর্ত্তিত নামে দিল্লীতে প্রকাশিত হইলে তাঁহার শূদ্রাগর্ভজা কন্যা বিমলা তথায় গিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানে অভিরামস্বামীর কৌশলে ও রাজা মানসিংহের সহায়তায় বীরেন্দ্রসিংহ বিপাকে পড়িয়া বিমলার পানিগ্রহন করেন, এবং পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। তথায় তাঁহার প্রথমপত্নীগর্ভজা মাতৃহীনা কন্যা তিলোত্তমা বিমলাকর্ত্তৃকই প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে যৌবনদশায় পদনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে মোগল ও পাঠানদিগের যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় রাজা মানসিংহ সসৈন্যে ঐ প্রদেশে গমনকরিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পাঠানপরাজয়কার্য্যে নিযুক্তহইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে এক রজনীতে গড়মান্দারণের সমীপস্থ প্রান্তরমধ্যগত দেবমন্দিরে ঐ বিমলা ও তিলোত্তমাকে দর্শনকরেন এবং দর্শনক্ষণ হইতেই তিলোত্তমা ও রাজকুমারের পূর্ব্বরাগসঞ্চার হয়। রাজকুমার ঐ সমরকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অতিরাগবশতঃ, বিমলার সহকারিতায় এক গুপ্তদ্বার দিয়া বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, তিলোত্তমার সমীপস্থ হয়েন। ঐ সময়েই পাঠানরাজ কতলুখাঁর সেনাপতি ওসমান সুযোগপাইয়া সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশপুর্ব্বক বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমাপ্রভৃতি সকল পরিবারকে বন্দীভূত করেন। বন্দীভাবের পর কতলুখাঁর আজ্ঞায় বীরেন্দ্রের শিরশ্ছেদ হয়, আহত জগৎসিংহ, ওসমান ও কতলুখাঁর দুহিতা আয়েষার যত্ন ও শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভ করেন, বিমলা পতিহন্তা কতলুখাঁর প্রাণবধ করিয়া পলায়নকরেন, মোগলপাঠানের সন্ধি হয়, এবং তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের বিবাহ হয়—দুর্গেশনন্দিনীস্থ উপাখ্যানের স্থূলতাৎপর্য্য এই। কিন্তু এই তাৎপর্য্যমাত্রশ্রবণে দুর্গেশনন্দিনী কিরূপ পদার্থ, তাহা পাঠকেরা কিছুই বুঝিতেপারিবেননা, অতএব আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠকরুন।

অভিরামস্বামী, বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, ওস্‌মান, তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা এই কয়েকজনই এই আখ্যায়িকার প্রধান পাত্র। অভিরামস্বামী বোধহয়, ভূদেবমুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়বিনিময়স্থ রামদাসস্বামীর অনুজ হইবেন। ইনি যৌবনদশায় যেরূপ থাকুন, প্রৌঢ়াবস্থায় বিলক্ষণ বিজ্ঞবিচক্ষণ হইয়াছিলেন। ইহাঁরই পরামর্শে মোগল পাঠানের যুদ্ধসময়ে মোগলের পক্ষ অবলম্বনকরিতে বীরেন্দ্রসিংহের প্রবৃত্তি হয়। এই পরামর্শদানের পর ইহাঁর আর বড় সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নাই—বীরেন্দ্রের বধকালে একবারমাত্র দেখাদিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি কতলুখাঁর বধের জন্য বিমলার নিকট ছুরিকা প্রেরণকরেন, এবং তিলোত্তমার পীড়ার সময়ে রাজপুত্রকে আনাইয়া তাঁহার মন আর্দ্র করেন এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহে অর্পিতকরিবার সময়ে ইহাঁর যেরূপ বুদ্ধিকৌশলপ্রদর্শিত হইয়াছিল, অপর কোন স্থলে সেরূপ হয়নাই—অতএব আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধিকৌশলে ইনি পূর্ব্বোল্লিখিত রামদাসস্বামীর তুল্য লোক নহেন।

বীরেন্দ্রসিংহ উদ্ধতস্বভাব মহাবীর। এগ্রন্থে তাঁহার অধিক কার্য্য বর্ণিত নাই। কতলুখাঁর সভায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সময়ে তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, মৃত্যুভয়শূন্যতা, দৃপ্ততা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়বীরের একান্ত অনুরূপ।—গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহ নবীনবয়স্ক, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, ধার্ম্মিক, সাহসিক ও প্রেমিক লোক। তিনি আখ্যায়িকামধ্যে আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকিয়া কত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সঙ্খ্যা নাই, সুতরাং সে সমুদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখকরা বাহুল্য। তবে একথা বলিতেপারি যে, জগৎসিংহের ক্ষত্রিয়োচিত আচার, বীরোচিত সাহস, প্রেমিকোচিত অনুরাগ, ধার্ম্মিকোচিত কার্য্যকলাপ, মহাকুলসম্ভূতোচিত তেজস্বিতা প্রভৃতির কোথাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়নাই। তিনি কারাগার মধ্যে উপস্থিতা তদ্দাত-

জীবিতা তিলোত্তমাকেও যে, অননুরাগসূচকবাক্যে ব্যথিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনুচিত হয়নাই। কারণ তিনি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তিলোত্তমা কতলুখাঁর উপপত্নী হইয়াছেন। এ কথাশ্রবণের পর তিলোত্তমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বভাব থাকা সম্ভব নহে। আয়েষা পরমসুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অসাধারণগুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা। তিনি বিপৎসময়ে রাজপুত্রের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে হয়ত তাঁহার আরোগ্যলাভই দুর্ঘট হইত, কিন্তু সেই আয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগপ্রকাশ করিলেও রাজপুত্রের মনে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যও অন্যভাব জন্মেনাই, ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গুণ নহে। ফলতঃ তিনি না বুঝিয়া তিলোত্তমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, তাঁহার প্রতি তিলোত্তমার সেই প্রগাঢ় অনুরাগ কোনমতে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নাই।

গ্রন্থকার কতলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি ওস্‌মানকে কেবল মুখে 'পাঠনকুলতিলক' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—সত্য সত্যই তাঁহাকে পাঠানকুলতিলক করিয়াতুলিয়াছেন। গড়মান্দারণের দুর্গেপ্রবেশ করিয়া একাকিনী বিমলার সহিত তাঁহার কথোপকথন, বন্দীভূত আহত রাজপুত্রের প্রতি তাদৃশ সদয় ব্যবহার, আপনার মনোরথপ্রিয়া আয়েষা করতলগত শত্রুর প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, বুঝিয়াও স্থিরভাবে তাহা সহ্যকরা, সামর্থ্যসত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অন্যরূপ অনিষ্টাচরণ না করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করা, পরাজয় হইলেও প্রাণরক্ষার্থ ক্ষমাপ্রার্থনা না করা প্রভৃতি ওস্‌মানের কৃতকার্য্যগুলির যে কোনটীর দিকে অনুধাবন করিয়া দেখাযায়, তাহাতেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। পাঠানদিগের চরিত সচরাচর যেরূপ চিত্রিত হয়, তাহাতে ওস্‌মানের ঐ 'সমগ্র' উদারকার্য্য না দেখিয়া 'কতক' দেখিলেও তাঁহাকে পাঠানকুলতিলক বলাযাইতে পারিত। কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এই স্থলেই গ্রন্থকারকে আমরা

একটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব——“ মোগলপাঠানের সন্ধি হওয়ার পর জগৎসিংহ পাঠানদুর্গহইতে স্বশিবিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে ওস্‌মান তাঁহাকে গুপ্তকথা আছে, বলিয়া ডাকিয়ালইয়া এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক সজ্জিতচিতা ও নিখাত সমাধি প্রদর্শনকরিয়া কহেন যে, আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুইজন পৃথিবীতে থাকিবেনা, অতএব আমার সহিত তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হউক, যদি আমি মরি, আমাকে এই স্থানে সমাহিত করিও এবং যদি তুমি মর, তবে এই চিতায় ‘ ব্রাহ্মণ ’ দ্বারা তোমার সৎকার করাইব” ইত্যাদি——হিন্দুর শব মোসলমান কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হওয়া হিন্দুর আচারবিরুদ্ধ, ইহা যখন্ ওস্‌মানের জানা ছিল, তখন্ হিন্দুরা মোসলমানের অন্নপান গ্রহণকরিলে জাতিভ্রষ্ট হয়, ইহাও তাঁহার জানা সম্ভব; কিন্তু জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, বিমলাপ্রভৃতি বন্দীভূত হইয়া যখন্ পাঠানদুর্গে থাকেন, তখন্ ওস্‌মান তাদৃশ ভদ্র হইয়াও কি জন্য হিন্দুদ্বারা তাঁহাদের অন্নপানাদি পাইবার ব্যবস্থাকরিয়া দেন নাই? এবং তাঁহারাই বা জাতি ও ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া কিরূপে যবনস্পৃষ্ট দ্রব্যে কয়েকদিন জীবিকানির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন? তাহা আমরা কোনমতে বুঝিতে পারিলাম না। আমরা ঐ পাঠানদুর্গের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়াছি, কোথাও বহুদিনপরে প্রবিষ্ট এক আসমানী ভিন্ন হিন্দুপরিচারিকা দেখিতে পাই নাই।

গ্রন্থনায়িকা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা সুন্দরী, ধীরা, নবীনা, অনুরাগিণী নায়িকা। তিনি শৈলেশ্বরশিবমন্দিরে জগৎসিংহকে দেখিয়াই মুগ্ধ হয়েন, বাটীতে আসিয়া নির্জ্জনে অন্যমনস্ক হইয়া খাটের গাএ কালী দিয়া ‘অ’ ‘ই’ হিজিবিজি ও ‘ কুমার জগৎসিংহ ’ ইত্যাদি লেখেন এবং আর আর কত কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কারাগারে জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হয়েন। ঐ স্থানে তিলোত্তমার অবস্থা অতি মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নবীনা রাজকন্যা

সুযোগ পাইয়া দুর্গহইতে বাহির হইয়াছিলেন, যেখানে যাইবার কথা ছিল তাহা ভুলিয়াগিয়াছেন, কিছুই মনে নাই, কেবল 'জগৎ-সিংহ' এই নাম মুখ হইতে নির্গত হওয়ায় সহচর তাঁহাকে পুনর্ব্বার দুর্গমধ্যে আনিয়া কারাগারে জগৎসিংহের গৃহদ্বারে উপস্থাপিত করিল। গৃহপ্রবেশে তিলোত্তমার পা সরে না, কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিলেন, প্রাচীর ধরিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন, জগৎসিংহ চিনিয়া 'বীরেন্দ্রসিংহকন্যা! এখানে কি অভিপ্রায়ে?' এই নিরনুরাগ শুষ্ক সম্ভাষণ করিলেন। শুনিয়া তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও মূর্চ্ছা হইল। আয়েষা আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন এবং তাঁহারই অনুমতিতে দাসীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিলোত্তমা ধীরে২ চলিয়া গেলেন।—এই প্রকরণের বিবরণটী যে, কিরূপ স্বভাবসঙ্গত ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—পাঠমাত্র সমুদয় ব্যাপার যেন চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে।

তিলোত্তমার বিষয়েও গ্রন্থকারের সহিত ৩টী স্থলে আমাদের কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। ১মতঃ তিলোত্তমা ও বিমলা সায়ঙ্কালে শৈলেশ্বর পূজা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসময়ে শিবপূজা করিতে যাওয়া আমাদের দেশে রীতি নাই; আর তাহা থাকিলেও বাহকেরা যে, ঝড়বৃষ্টি জন্য সেই প্রান্তরমধ্যে দুইটী স্ত্রীলোককে ফেলিয়া পলাইল, অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলনা! ইহা কিছু অসঙ্গত বোধহয়। ২য়তঃ—শিবমন্দিরে জগৎসিহ ও তিলোত্তমার দর্শনমাত্র পরস্পরের মনে অনুরাগসঞ্চার হয়। সংস্কৃত কবিরা সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ অনুরাগের বর্ণন করিয়া থাকেন। সংস্কৃতকাব্য বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকার আদর্শ নহে—তাঁহার আদর্শ ইঙ্গরেজি কাব্য। কিন্তু ইঙ্গরেজি-আখ্যায়িকারনুাগীরা আমাদিগের পুণ্ডরীকমহাশ্বেতাদির ন্যায় রূপ-দর্শনমাত্র সঞ্চরিত অনুরাগে 'পাশব অনুরাগ' (Animal love) বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন, সুতরাং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইঙ্গরেজিবিৎ

লোকের গ্রন্থে সে দোষ সঙ্ঘটন হওয়া উচিত হয়নাই। ৩য়তঃ—এই পুস্তকের নায়কনায়িকা সাহেব বিবি নহেন—হিন্দু।' হিন্দুদিগের সমানবর্ণ ব্যতিরেকে অসমানবর্ণে বিবাহহওয়া তখনও রীতি ছিলনা। সুতরাং জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পরস্পর সমানবর্ণত্ব জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অনুরাগসঞ্চার হওয়া এবং তিলোত্তমার প্রকৃত পরিচয় পাইবার অগ্রেও তাঁহার জন্য জগৎসিংহের সেই সেইরূপ মনোভাব প্রকাশ করা আমাদের বিবেচনায় সদ্‌যুক্তিসঙ্গত হয়নাই। কালিদাস এরূপস্থলে কিপ্রকার সাবধান হইয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।—

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্যাদিসন্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে বিতর্ক উঠিল, পাছে এ ব্রাহ্মণকন্যা হয়! ক্ষণৈক পরে মনে মনেই সে তর্কের মীমাংসা হইল এবং স্থির করিলেন———

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণ মন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

এইরূপ চিন্তার পর কিছুক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন বটে; কিন্তু মনের সম্যক্ প্রীতি হইলনা। পরে যখন্ শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন্ আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া কহিলেন——

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥

আয়েষা যথার্থই দেবকন্যারূপিণী। ইহাঁর রূপ, গুণ, বুদ্ধি, বিবেচনা, উদারতা, ধৈর্য্য সকলই অলৌকিক। ইনি জগৎসিংহের পীড়িতাবস্থায় অক্লান্তভাবে যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—ওস্মান ইহাঁর পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশকরিলে যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন——জগৎসিংহের প্রতি পত্নীভাবে গাঢ়ানুরক্তা হইয়াও যেরূপে মনোভাব গোপনে রাখিয়াছিলেন——কারাগারে ওস্মানের কথায় অসহিষ্ণু হইয়া যেরূপ দৃপ্তভাবে তাহা প্রকাশ

করিয়াছিলেন—রাজপুত্র বিদায় লইবার সময়ে সাক্ষাৎকরণপ্রার্থী হইলে যে কারণে দর্শন দিতে অসম্মতা হইয়াছিলেন—তাঁহাকে যেরূপে পত্র লিখিয়াছিলেন—এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহসময়ে অলঙ্কারাদিপ্রদানপূর্ব্বক যেরূপ ভাব প্রকাশকরিয়াছিলেন—সে সমুদয় নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে বিস্ময়, করুণা, ভক্তি ও আনন্দরসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়াউঠে। অঙ্গুরীয়বিনিময়ের রোসিনারাও ইহাঁর ভগিনী বটেন, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা ইহাঁর সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য অনেকগুণে অধিক।

এক্ষণে বিমলা— বিমলা যে, অভিরামস্বামীর কন্যা ও বীরেন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী তাহা, বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলে জানিত না—প্রধান পরিচারিকাই বোধকরিত। বিমলা আখ্যায়িকার আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই ভ্রমমাণা। তিনিই প্রথমে দেবমন্দিরে জগৎসিংহের সহিত কথা কহেন, তিনিই মনোহরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আসমানীরদ্বারা বিদ্যাদিগ্‌গজের দুরবস্থা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক রজনীতে সেই দেবমন্দিরে যাইয়া জগৎসিংহের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করেন, তিনিই জগৎসিংহকে গুপ্তদ্বার দিয়া তিলোত্তমার নিকট উপস্থিত করিয়া দেন, তাঁহারই অসাবধানতায় পাঠানদিগের কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হয়, তাঁহারই পত্রে আখ্যায়িকাস্থ পাত্রগণের পরিচয়বিষয়ক সমুদয় অন্ধকার দূরগত হয় এবং তিনিই সুরাও নৃত্যগীত দ্বারা কতলুখাঁর মন মোহিত করিয়া আলিঙ্গনসময়ে ছুরিকাদ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া পতিবধপ্রতিহিংসার সাধন করেন। বিমলাকে তাদৃশ রূপবতী বলিয়া বোধ না হউক, কিন্তু তাঁহার ন্যায় রসিকা, প্রমোদমানা, বিবেকবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি কামিনী অতি দুর্লভ। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তিনি প্রচুরপরিমাণে আপনগুণের পরিচয় দিয়াছেন, সে সমুদয়ের বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য, সুতরাং আমরা পাঠকগণকে অন্ততঃ দুইটী স্থান অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠকরিতে অনুরোধ করি—যখন পাঠান

সেনাপতি বিমলাকে ওড়না দ্বারা ছাদের আলিসার সহিত বাঁধিয়া রহিম্‌খাঁর জিম্মায় দিয়াযান, তখন্ রহিমখাঁকে "সেখজী! তুমি বড় ঘামিতেছ, একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দেও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি; পরে আবার বাঁধিয়া দিও" ইত্যাদি সরস কথায় ভুলাইয়া মুক্তিলাভ করা—সেই এক স্থান—এবং যখন্ কতলুখাঁর জন্মতিথির রজনীতে মনোহরবেশধারিণী বিমলা কৌশলে তাঁহার বক্ষে ছুরিকা নিখাত করিয়া—"পিশাচী নই সয়তানী নই—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী" এই বলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করেন—সেই এক স্থান। অধিক কি, বিমলার চরিত গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উহাঁকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। ফলতঃ জগৎসিংহের সহিত রজনীতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রকৃত অভিসারিকার ন্যায় তাদৃশ বেশভূষা করা এবং আস্‌মানীর দ্বারা বোকা বামন বিদ্যাদিগ্‌গজকে উচ্ছিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহার ততদূর দুরবস্থা করা এই দুইটী ভিন্ন বিমলার সমুদয় কার্য্যগুলিই আমাদের পরমপ্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনীর অন্তর্গত কয়েকটী পাত্রের চরিত যেরূপে সমালোচিত হইল, বোধহয়, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই আখ্যায়িকাখানি একটী মনোরম পদার্থ হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। ইহা পাঠকরিতে আরম্ভ করিলে উত্তরোত্তর সমধিকপরিমাণেই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। উপাখ্যানগ্রন্থের ইহা একটী প্রধান গুণ। ইঙ্গরেজির নানাবিধ নবেল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্কিমবাবু আপন পাত্রগণের অলঙ্কারসংগ্রহ করেন, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা রায় দীনবন্ধু মিত্রের নবীনতপস্বিনী সমালোচনায় (৩০৬পৃষ্ঠে) ব্যক্ত করিয়াছি যে, সেরূপ করা আমাদের বিবেচনায় গুণ বৈ দোষ নহে। কিন্তু এস্থলে

ইঙ্গরেজিভাষানভিজ্ঞ পাঠকদিগকে নিতান্ত অন্ধকারে না রাখিয়া একটু বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই দুর্গেশনন্দিনীস্থ কোন কোন পাত্রের অনেক অস্থিমাংস প্রসিদ্ধ সর ওয়াল্‌টর স্কটের 'আইবানহো' নামক ইঙ্গরেজি নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু বিজ্ঞাপনমধ্যে যদি একথাটী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত।

এই গ্রন্থের ভাষা চলিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আলালীও সম্পূর্ণ নহে—তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন্নত ও মধুর। ইহার রচনায় যে একটী নূতনবিধ ভঙ্গী আছে, ইহার পূর্ব্বকালীন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে সে ভঙ্গীটী দেখিতে পাওয়াযায়নাই। সেটী ইঙ্গরেজির অনুকরণ হইলেও বিলক্ষণ মধুর। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার স্বয়ং, বর্ণিত পাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে যে, অত অধিক বাক্‌প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মিষ্ট লাগে না—বরং তদ্দ্বারা স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হয়। আমাদিগের মতে, তুমি গ্রন্থকার!—

" রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।
রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদিবা রহঃ।
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি॥ "

ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দত্তবর বাল্মীকির ন্যায় কোন দৈবশক্তিবলে তোমার পাত্রগণের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমুদয় ভাব অবগত হইতে পারিয়াছ—সুতরাং তুমি সেইগুলি অবিকল মুখে ব্যক্ত করিবে মাত্র—তুমি তাহাদের সহিত কথা কহিতে যাইবে কেন?—তাহারা কোন্ কালের লোক—তুমি কোন্‌কালের লোক! যাত্রাস্থলে প্রহ্লাদের বধার্থ উদ্যতখড়্গা দ্বারীকে যদি পোলিষের সার্জ্জন গ্রেফ্‌তার করিতে যায়, তবে কেমন দেখায়?

এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাগত দোষের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে, কিন্তু বঙ্কিমবাবু তাঁহার ভাষার দোষপ্রদর্শি-

দিগকে প্রকারান্তরে গালি দেন ; তিনি আমাদিগকেও ঐরূপ গালি দেন,—দিবেন। আমরা যখন্ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, নির্ম্মল-মনে প্রকৃত কথা বলিতে কাহারও রাগদ্বেষের ভয় করিব না, তখন্ তাঁহার গালীতেও ক্ষুব্ধ হইব না, কিন্তু গালি দিয়াও তিনি যদি আমাদের কথাগুলি গ্রহণকরেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ পদবাক্য-প্রয়োগে সাবধান হয়েন, তাহা হইলে যথার্থই আহ্লাদিত হইব।

বঙ্কিমবাবুর এগ্রন্থের ভাষায় অনেকগুলি দোষ আছে—সে সমুদয়ের উল্লেখ করা বাহুল্য, নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থলমাত্র আমরা উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিলাম—(২য় বার মুদ্রিত পুস্তকের) ৪ পৃষ্ঠ—১ "আমাদিগের আত্মপরিচয় আপনারা দিবার রীতি নহে" বহু স্থলেই "জন্মাইল" ১৮ পৃঃ—২ "পাঠানেরা পুনর্ব্বার মস্তকোন্নত করিল" ২০ পৃঃ ৩ "তিনি বর্ষাপ্রভাতে" ২১ পৃঃ ৪ "জাহানাবাদে অবস্থিতিকালীন লোকমুখে সংবাদ পাইলেন" ২১ পৃঃ ৫ "ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া" ২৭ পৃঃ ৬ "মানবহস্তখাদিত এক গড়" ২৭ পৃঃ—৭ "অন্যগড়ের সহিত অত্র আখ্যায়িকার সংস্রব নাই" ৪০ পৃঃ ৮ "প্রগল্‌ভবয়সী রমণী-দিগের" ৫৭ পৃঃ ৯ "ততক্ষণ নিদ্রাগমন করিওনা" ইত্যাদি—এস্থলে ১ম বাক্যটী অনন্বিতত্বদোষে দূষিত ; উহার অন্তর্গত 'আপনারা' এই কর্ত্তৃপদের সহিত কাহার ও অন্বয় হয় না ; উহার পরিবর্ত্তে স্বয়ং দিবার রীতি নাই, এইরূপ লিখিলে ভাল হইত। বহুস্থলে 'জন্মিল' এই অর্থবোধার্থ 'জন্মাইল' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ২য়ে 'মস্তকো-নত' এরূপ একপদ হইতে পারে না—'মস্তক উন্নত' এইরূপ পৃথক্ রাখা কর্ত্তব্য। কারণ ঐ দুই পদে কোন সমাস হয়না—অসমাসে সন্ধি করা সংস্কৃতে নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালায় সে রীতি নাই—বাঙ্গালায় সেরূপ করিলে "যদ্যপ্যেবৎসর আম্যেকশত টাকা পাইলাম, তথাপ্যেকচালাখানি হইলনা" ইত্যাদিবৎ উপহাসাস্পদ হয়। ৩য় প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ—প্রভাতশব্দ প্রাতঃকালভিন্ন সামান্য শেষবোধক

নহে; সায়ঙ্কালবোধার্থ 'দিবাপ্রভাতে' এরূপ প্রয়োগ করা যায় কি? ৪র্থ বাক্যে 'অবস্থিতিকালীন'. এইটী বিশেষণ পদ, উহার বিশেষ্য নাই সুতরাং উহার স্থলে 'অবস্থিতিকালে' লেখা কর্ত্তব্য। ৫ মে 'সোৎসুক' পদ অশুদ্ধ;—উৎসুকই বিশেষণ পদ, তাহার পূর্ব্বে স দিবার প্রয়োজন নাই। ৬ষ্ঠে 'খাদিত' শব্দের অর্থ ভক্ষিত—নিখাত নহে, সুতরাং 'মানবহস্তখাদিত' ইহাদ্বারা 'মনুষ্যের হস্ত কর্ত্তৃক-ভক্ষিত' এই অর্থের প্রতীতি হয়! ৭ মে 'অত্র-আখ্যায়িকার' এরূপ প্রয়োগ অসাধু; 'অত্র' এই সর্ব্বনাম পদ 'আখ্যায়িকার' এই পদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত, কিন্তু বিশেষণ ও বিশেষ্যে সমান বিভক্তি থাকা উচিত; এস্থলে 'অত্র' অধিকরণবোধক সপ্তম্যন্ত পদ এবং 'আখ্যা-য়িকার' সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠ্যন্ত পদ, সুতরাং উভয়ের বিশেষণবিশে-ষ্যতা থাকিতে পারেনা। 'অত্র-আখ্যায়িকায়' এরূপ থাকিলে সঙ্গত হইতে পারিত। আদালতে 'অত্র জিলার' 'অত্র হুকুমদ্বারা' ইত্যাদি ভাষার বহুল প্রচলন আছে, এজন্য আমরা উহাকে আদালতীভাষা কহি। ৮ মে 'প্রগল্‌ভবয়সী' পদ অশুদ্ধ, 'প্রগল্‌ভ বয়স্' শব্দের উত্তর স্ত্রীত্ববোধক ঈ প্রত্যয় হইবার নিয়ম নাই। ৯ মে 'নিদ্রাগমন করিও না' এরূপ প্রয়োগ সাধু কি অসাধু? তাহা বিবেচনা করিবার ভার পাঠকদিগের উপর অর্পণ করিলাম; 'তিনি নিদ্রা গিয়াছেন' 'সে নিদ্রাগত' ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনে 'নিদ্রাগমন করিও না' এরূপ প্রয়োগও সাধু বলিতে তাঁহাদের রুচি হয়—হউক।

কপালকুণ্ডলা (২য় সংস্করণ)—২৫০ বৎসর গত হইল গঙ্গা-সাগর হইতে প্রত্যাগমনকারী নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক ঘটনাক্রমে একাকী হিজলীর সমুদ্রকূলে পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপা-লিকের আশ্রয় গ্রহণকরেন। কাপালিক আপন যোগসিদ্ধির বাস-নায় তাঁহাকে বলি দিবার উদ্যোগ করিলে—কাপালিকেরই প্রতি-পালিতা কপালকুণ্ডলানাম্নী এক পরমরূপবতী রমণী তাঁহার প্রাণরক্ষা

করেন। নবকুমার অনূঢ়া সেই প্রাণদাত্রীকে বিবাহ করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক নিজবাসস্থান সপ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মতিবিবি নামে এক যুবতী যবনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি বাস্তবিক ব্রাহ্মণকন্যা এবং নবকুমারেরই পূর্ব্বপরিণীতা স্ত্রী। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে উহার পিতা সপরিবারে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া আগ্‌রায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্না মতিবিবি বাদসাহপুত্র প্রভৃতি আগ্‌রার অনেক আমীর ওম্‌রার সহিত দূষিতচরিতা হইয়া বিস্তর ধন ও গৌরব লাভকরেন। এই সময়ে তিনি নিজের কোন দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উড়িষ্যা গিয়াছিলেন—তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে নবকুমারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি গাঢ়ানুরাগা হইয়া পড়েন, কিন্তু তৎকালে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। নবকুমারও সপ্তগ্রামে আসিয়া পত্নীসহবাসে কিছুকাল যাপনকরিলেন। মতিবিবির ইচ্ছা ছিল, জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইলে তিনি তাঁহার প্রধান মহিষী হইবেন, সে অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় আপন পূর্ব্বস্বামীর সহবাসে কালযাপন করিবার অভিলাষে সপ্তগ্রামে আসিলেন, এবং রূপ গুণ ধন রত্ন প্রভৃতি দ্বারা নবকুমারের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন্ কোনরূপে কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন্ কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ঐ সময়ে হিজলীর কাপালিকও সন্ধান করিয়া কপালকুণ্ডলার অমঙ্গলসাধনার্থ ঐ স্থানে আসিয়াছিল। মতিবিবি বা পদ্মাবতী তাহার সহিত মিলিল। পদ্মাবতীর মানস সফল হইল—তাহার কৌশলে কপালকুণ্ডলাকে দুশ্চরিতা বলিয়া নবকুমারের প্রতীতি জন্মিল, কাপালিক সুরাপায়নদ্বারা নবকুমারের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে লইয়া গেল, তথায় সহসা গঙ্গার তট ভগ্ন হওয়ায় কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়া অদৃশ্যা হইলেন—এই স্থূল

উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই আখ্যায়িকা বিরচিত। ইহা যদিও দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় ইতিহাসমূলক নহে, তথাপি স্থানে স্থানে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মৃণালিনীর স্থূল বিবরণ এই যে, মগধরাজের পুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনীনাম্নী মথুরার এক বৌদ্ধকন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া বণিগ্‌বেশে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন, এই সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজী মগধরাজ্য জয়করিয়া লয়েন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রের দ্বারাই অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের বাসনা করিয়া তাঁহাকে মৃণালিনীর সহিত বিযুক্ত রাখিবার অভিলাষে কৌশলপূর্ব্বক মৃণালিনীকে গৌড়নগরস্থ আপন শিষ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যবনজয় করিবার উদ্দেশে হেমচন্দ্রকে বঙ্গদেশে প্রেরণকরেন। হেমচন্দ্র প্রথমে গৌড়নগরে আসিয়া এক ভিখারিণীরদ্বারা মৃণালিনীর সন্ধান করেন কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে লইয়া আইসেন। মৃণালিনী ও মাধবাচার্য্য-শিষ্যভবনে অপ্রকৃত কারণে অপমানিতা হইয়া উক্ত ভিখারিণীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়াই অবস্থান করেন। ঐ সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজী, নবদ্বীপাধিপতি লাক্ষ্মণ্যসেনের ধর্ম্মাধিকরনিক পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতায় অক্লেশে নবদ্বীপ জয়করিলেন—হেমচন্দ্র প্রতিবন্ধকতা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু ঐ স্থানেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তির পর মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সমাগম হইল। অনন্তর তাঁহারা গৃহদাহদগ্ধ পতির অনুসরণসময়ে পশুপতি-পত্নী মনোরমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি গ্রহণকরিয়া সমুদ্রকূলে গমনপূর্ব্বক এক নূতনপুরী নির্ম্মাণকরিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনায় আমরা কিঞ্চিৎ অধিক স্থান প্রদানকরিয়াছি—উপস্থিত আখ্যায়িকাদ্বয়ে তত অধিক স্থান

দিতে পারিবনা। অতএব সঙ্ক্ষেপে বলিতেছি যে, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দুইখানিই এতজ্জাতীয় পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্কিমবাবু ইঙ্গরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক; তিনি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের রচিত অনেক আখ্যায়িকাপুস্তক অধ্যয়নকরিয়াছেন, সুতরাং কি প্রণালীতে বর্ণনীয় পাত্রগণের কার্য্যকলাপ নিবদ্ধ হইলে ইউরোপীয়রুচিসম্পন্ন পাঠকদিগের কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, তাহা উত্তম জানেন এবং গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই আপনার সেই জ্ঞানের প্রচুর উদাহরণ প্রদর্শনকরিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর রচনা এইরূপে ইউরোপীয় রীতির অনুকারিণী হইয়াছে বলিয়া উহা ইঙ্গরেজিজ্ঞ বা কোনরূপে ইঙ্গরেজির সংস্রবসম্বলিত লোকের যাদৃশ প্রীতিকরী হয়, খাটী বাঙ্গালীদিগের তাদৃশ হয়না। যাহাহউক, তজ্জন্য গ্রন্থকার আজি কালি আর নিন্দনীয় নহেন। তিনি নবকুমার, কাপালিক কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির এবং হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, গিরিজায়া, মাধবাচার্য্য, পশুপতি, মনোরমা প্রভৃতির চরিতগুলি অধিক স্থলেই স্বভাবসঙ্গত ও মনোহররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠের সময়ে প্রায় সকলগুলিই চিত্তক্ষেত্রে সজীবভাবে যেন বিচরণ করিতে থাকে; ইহা রচয়িতার সামান্য নৈপুণ্য নহে। এই দুই পুস্তকেই কতকগুলি গীত ও কবিতা নিবেশিত আছে, তাহার কএকটী অতি মনোরম হইয়াছে, বিস্তৃতিভয়ে আমরা তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কপালকুণ্ডলারও উপাখ্যানের কতক কতক ভাব পূর্ব্বোল্লিখিত প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকাকার স্কটের 'ব্রাইড্ অব লামার মুর' নামক আখ্যায়িকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল বিশেষরূপে প্রদর্শন করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। ইচ্ছা হইলে ইঙ্গরেজিজ্ঞ পাঠকগণ উক্ত পুস্তক অধ্যয়নকরিলেই দেখিতে পাইবেন। যাহাহউক, এই আখ্যায়িকার মতিবিবি—লুৎফ উন্নিসা-বা পদ্মাবতীকে গ্রন্থকার মুখে

যেরূপ রূপবতী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনাপাঠ করিয়া আমরা উহার সে প্রকার রূপ দেখিতে পাইলাম না—আমাদের চক্ষুতে মতিবিবি বাটামুখী এক ধূমোধামা মাগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাহউক, তাহার বুদ্ধিকৌশল, অধ্যবসায়, নবকুমারের প্রতি সেই প্রখর অনুরাগ, তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই সেই কুচেষ্টা, তন্মধ্যেও মনের কিঞ্চিৎ উদারতা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তদ্বিধা কামিনীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত হইতে পারে।—অদৃষ্টদোষে সংসারসুখে বঞ্চিতা এক হতভাগিনীর চরিত বর্ণনকরিবার অভিলাষেই, বোধহয়, কবি কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যদি সে অভিপ্রায় থাকে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার গুণ সকল এরূপ হওয়া উচিত, যাহা অন্যের স্পৃহণীয় হইতে পারে। কপালকুণ্ডলার রূপ ও অন্যান্য অনেক রমণীয় গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশ উদাসীনপ্রকৃতিকতা কি কোন সংসারীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? কপালকুণ্ডলার ন্যায় কামিনীকে কোন পাঠক আপন গৃহিণী করিতে চাহেন কি?—আমরা ত কখনই না! স্ত্রীর যদি অলৌকিক রূপ থাকে—অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ গুণ থাকে, আর তোমার প্রতি তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ না থাকে—সংসারের সকল কার্য্যেই তাহার ঔদাসীন্য হয়, তবে সে স্ত্রীকে লইয়া তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?—কপালকুণ্ডলার সাংসারিক কোন বিষয়ে আস্থা ছিলনা—স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় গুণ যে পতিগতপ্রাণতা, তাহা তাঁহার কিছুমাত্র ছিলনা—সুতরাং সে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধহয়না।—আর এক কথা এই, কপালকুণ্ডলা অশুভান্ত আখ্যায়িকা; ইহার উপসংহারে নায়িকার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তদর্থ পাঠকদিগের শোক উপস্থিত হইবে। যাহাকে শোচনীয় করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল, অগ্রে সেরূপ বর্ণনা করিয়া রাখা আবশ্যক। সুখোচিত ব্যক্তির

দুঃখদর্শনে মন যেরূপ আর্দ্র হয়, সামান্যাবস্থ লোকের দুরবস্থায় কখনও সেরূপ হয়না। রাম যুধিষ্ঠিরাদি রাজপুত্র ও সুখাভ্যস্ত ছিলেন, এই জন্য, তাঁহারা বনগমন করিয়া ফলমূলাদি দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন, শুনিয়া আমরা কান্দিয়া অস্থির হই, কিন্তু সাঁওতাল, ভিল্ প্রভৃতি কত অসভ্য জাতীয়েরা যে, যাবজ্জীবন বনে বনে ফিরিতেছে ও ফলমূলাদিদ্বারা উদরপূরণ করিতেছে, তাহাদের কথা শুনিয়া কিছু-মাত্র ক্লেশবোধ করিনা! এ আখ্যায়িকার নায়িকা কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল? গ্রন্থকার তাহা কোন স্থলে বর্ণনকরেননাই, এমন কি তিনি কাহার কন্যা? কোন্ দেশে বাস করিতেন? কিরূপে খৃষ্টানদিগের হস্তগত হইয়াছিলেন? ইত্যাদি পরিচয়ও কোথাও দেওয়া হয়নাই, সুতরাং তাঁহার অমঙ্গলে পাঠকদিগের উচিতমত সম-দুঃখতার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নহে। তাহা না হইলেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্যক্‌সিদ্ধ হইল না।

মৃণালিনীর চরিতে সেরূপ হয়নাই, তিনি ধনী লোকের কন্যা ও ও আদরের ধন ছিলেন, এজন্য তাঁহার সহিত পাঠকদিগের বরাবর সমদুঃখতা রহিয়া গিয়াছে। হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটী হইতে তাঁহার বিবাসন এবং নবদ্বীপস্থ সরোবরকূলে হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক তাঁহার অব-মাননা, এ দুই স্থল পাঠ করিবার সময়ে বোধহয় অনেককেই সাশ্রু-নেত্র হইতে হয়। এই উপাখ্যানস্থ ভিখারিণী গিরিজায়া যেন একটী 'আহ্লাদেপুতুল; উহার বাচালতা কিঞ্চিৎ কম হইলে আরও মনো-হারিণী হইত। মনোরমাকে গ্রন্থকার একটী অদ্ভুত পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন। উহার বিবরণ পাঠ করিতে মনে একপ্রকার আমোদ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এক স্ত্রীরই বহুরূপার ন্যায় একক্ষণে 'সরল বালিকা ভাব' ও পরক্ষণেই 'গম্ভীরপ্রকৃতি প্রৌঢ়যুবতীভাব' প্রাপ্তি হওয়া কতদূর স্বভাবসঙ্গত তাহা আমরা বলিতে পারিনা।

আমরা এবিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া গ্রন্থকারের একটী মাত্র ভ্রমের বিষয় উল্লেখ করিয়া নিরস্ত হইব। তিনি লিখিয়াছেন—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে" ইত্যাদি—সুতরাং তাঁহার মতে পদ্মের মৃণালে কণ্টক আছে; কিন্তু সেটী ভ্রম—এ ভ্রম কেবল যে, তাঁহারই হইয়াছে, তাহা নহে; সংস্কৃত শাস্ত্রে অব্যবসায়ী অনেক কবিরই রচনায় এই ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ৺ লক্ষ্মীকান্তবিশ্বাসের পাঁচালীতে আছে—"পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরে পিরালী খোঁটা" ইত্যাদি—মাইকেল মেঘনাদবধে (২য় সর্গে) লিখিয়াছেন "কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী" ইত্যাদি—সুতরাং এই ভ্রমকে এক প্রকার 'সাধারণ ভ্রম' বলিতে হইবে। কি জন্য বহুলোকের এরূপ ভ্রম হইল, তাহার কারণান্বেষণে আমাদের এই বোধহয় যে, পদ্মিনীর কোন্ পদার্থটীকে মৃণাল বলে, তাহা সকলের জানা নাই—অনেকের বোধ আছে যে, পুষ্পদণ্ডটীরই নাম মৃণাল। ঐদণ্ড ঈষৎ হরিতবর্ণ এবং তাহাতে কণ্টক আছে সত্য, কিন্তু সেটী মৃণাল নহে; অমরসিংহ তাহাকে নালা ও নাল শব্দে অভিহিত করিয়াছেন—স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে তাহাকে 'পদ্মনাল' বলাযায়। কোন কোন আভিধানিকের মতে মৃণালশব্দে পদ্মনালও বুঝায় সত্য বটে—কিন্তু সংস্কৃত কবিরা মৃণালশব্দের ঐ অর্থে কখনও প্রয়োগ করেননাই। তাঁহাদের মৃণাল চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ ও অপূর্ব্ব কোমল পদার্থ। তাঁহারা বিরহসন্তপ্তা নবীনা কামিনীদিগকে তাপোপশমের নিমিত্ত মৃণালবলয় ও মৃণালহার পরাইয়া থাকেন। রত্নাবলী শকুন্তলা নৈষধ কাদম্বরী প্রভৃতিগ্রন্থে ইহার ভূরিভূরি উদাহরণ আছে, অতএব সে সকল উল্লেখকরিবার প্রয়োজন * নাই। মৃণাল কণ্টকময় হইলে তাহার হার বলয়াদি

* তথাপি দুইটী মাত্র লিখি—

পরিচ্যুত স্তৎকুচকুম্ভমধ্যাৎ কিংশোষ মায়াসি মৃণালহার।
ন সূক্ষ্মতন্তোরপি তাবকস্য তত্রাবকাশো ভবতঃ কথং স্যাৎ॥ রত্নাবলী॥
অয়ংসতে শ্যামলতামনোহরং বিশেষশোভার্থ মিবোজ্ঝিতাম্বরঃ।
মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ করং সমেত্যোভয়কোটি মাশ্রিতঃ॥ শকুন্তলা॥

রচনাকরিয়া কবিরা অন্তরজ্বালায় জ্বলিত অবলাদিগকে আবার কণ্টকক্ষতজন্য শারীরিক জ্বালা দিতে যাইতেন না। ফল কথা পদ্মের নাল মৃণাল নহে—মূল হইতে তালআঁঠির কলের মত যে মোটা সিকড় মাটীর ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকেই মৃণাল কহে, উহাতে কণ্টক থাকে না—উহা যেমন শুভ্র তেমনি কোমল। সচরাচর উহাকে মোলাম (বোধহয় মৃণালশব্দেরই অপভ্রংশ) বলে। মোলাম খাওয়া যায়, এজন্য বাজারেও কখন কখন বিক্রীত হয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটী সাধারণ ভ্রমের কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলামনা।—অনেকের বোধ আছে যে, কুমুদিনীশব্দের অর্থ কুমুদপুষ্প এবং পদ্মিনী কমলিনী প্রভৃতি শব্দের অর্থ পদ্মপুষ্প। কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে—কুমুদিনী শব্দে পত্রপুষ্প-দণ্ড প্রভৃতি সমেত কুমুদলতা (কুমুদের ঝাড়) এবং পদ্মিনী কমলিনী নলিনী সরোজিনী প্রভৃতি শব্দে ঐরূপ সমুদয়সমেত পদ্মলতাকে * বুঝায়। আমরা উক্তরূপ দুইপ্রকার ভ্রমেরই নিরাসার্থ প্রমাণস্বরূপ অমরকোষ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কুমুদিনীর নাম।
"অথ কুমুদ্বতী। কুমুদিন্যাং"+

পদ্মিনীর নাম।
+"নলিন্যান্তু বিসিনী পদ্মিনীমুখাঃ"+

পদ্মের নাম।
+"বা পুংসি পদ্মং নলিনং "
রক্তোৎপলং কোকনদং"+

পদ্মনালের নাম।
+"নালা—নালম্"+

মৃণালের নাম।
+"অথাস্ত্রিয়াং। মৃণালংবিসম্" ইত্যাদি

---

* মূলনালদলোৎফুল্ল ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈ র্বিসিন্যাদিশ্চ সাম্মৃতা॥ (রাজনির্ঘণ্ট)

দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনায় ভাষাগত যেরূপ গুণদোষের কথা উল্লেখকরাগিয়াছে, এ দুই পুস্তকের ভাষাতেও সেই সেইরূপ গুণ দোষ অনেক আছে—বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত আর আমরা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

রঙ্গদর্শন—এই নামে একখানি মাসিকপত্রিকা সন ১২৭৯ সালের বৈশাখমাস হইতে প্রচারিত হইতেছে। বঙ্কিমবাবুই তাহার সম্পাদক। এই পত্রিকা বিষয়ে কোন অভিপ্রায় এক্ষণে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আরও কিছু দিন না যাইলে ইহা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা বোঝা যাইতেছে না। এ পর্য্যন্ত যে কয়েকখণ্ড বাহির হইয়াছে, তাহা মন্দ নহে।

নীতিসার প্রভৃতি।

শ্রীযুতদ্বারকানাথবিদ্যাভূষণমহাশয় নীতিসার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৭৪২ শকে [খৃঃ ১৮২০ অব্দে] কলিকাতার দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোঁতা নামক গ্রামে ৺হরচন্দ্রন্যায়রত্নমহাশয়ের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁরা দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণি ব্রাহ্মণ। দ্বারকানাথ ১৮৩২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক অতি প্রশংসিত ছাত্ররূপে তথাকার পাঠ্য সমুদয় অধ্যয়নকরেন—এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজিও তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল। উক্ত ১৮৪৫ খৃঃ অব্দেই তিনি ঐ কালেজের পুস্তকাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন পরেই ব্যাকরণাধ্যাপকতার পদ লাভকরেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় যৎকালে কালেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। অনন্তর তথাকার সাহিত্যাধ্যাপকের পদে অনেক দিন অবস্থিত থাকিয়া এক্ষণে পেন্সন গ্রহণ করত বাটীতে অবস্থান করিতেছেন।

সংস্কৃত কালেজে অবস্থানকালেই যখন্ গবর্ণমেণ্টের আদেশে চারি দিকে বাঙ্গালা পাঠশালাসকল স্থাপিতহইতে আরম্ভহয়, সেই সময়ে—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৮৫৫ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে—বিদ্যাভূষণ ২ দুইভাগ নীতিসার এবং রোম ও গ্রীসের ইতিহাস রচনাকরেন। এই সময়ে সংস্কৃতকালেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র 'সোমপ্রকাশ' নামক এক সংবাদপত্র প্রচারের বাসনায় সমুদয় উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, নানাকারণবশতঃ তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারায় ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ [খৃঃ ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর] হইতে বিদ্যাভূষণ এই পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণকরিয়া সাপ্তাহিক-রূপে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তাঁহাকর্ত্তৃকই ঐ পত্র প্রচারিত হইতেছে। এই পত্রিকাসম্পাদকতা-নিবন্ধন অবকাশাভাবেই, বোধহয়, তিনি আর কোন গ্রন্থরচনায় হস্তা-র্পণ করিতে পারেন নাই। এই কালমধ্যে কেবল 'ভূষণসার' নামে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গলাব্যাকরণ তাঁহার লেখনীহইতে নির্গত হইয়াছে।

নীতিসার দুই ভাগ—ইঙ্গরেজি ও সংস্কৃত নানাগ্রন্থ হইতে নীতিবাক্য সকল সঙ্কলনকরিয়া এই দুই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। যৎকালে ইহাদের রচনা হয়, তখন্ বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতিবিষয়ক পুস্তক অতি অল্প ছিল, অতএব এই পুস্তকদ্বয়ের প্রচার দ্বারা ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, বলিতে হইবে। ইহাদের ভাষা যেমন সরল, তেমনি বিশুদ্ধ; অনেক বিদ্যা-লয়েই এই পুস্তকের পাঠনা হইয়াথাকে, সুতরাং দেশীয় লোকেরা যে, ইহাদের গুণগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' এই দুই পুস্তক বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকাশকরা আমাদের তত উদ্দেশ্য নহে। অতএব আমরা এইমাত্র বলিব যে, ঐ দুই দেশের যে সকল ইতিহাস এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, এই দুই পুস্তক তাহাদের

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুতরাং সমধিকবিষয়সম্বন্ধ। ইহাদের—বিশেষতঃ রোমরাজ্যের ইতিহাসের ভাষাও এরূপ সুন্দর যে, ইহাদিগকে সাহিত্যমধ্যে নিবেশিত করিলেও হানি হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকও কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই।

সোমপ্রকাশ—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম ও সম্ভ্রম দেশমধ্যে যে, এত দূর বাড়িয়াছে, নীতিসার বা ইতিহাসরচনা তাহার হেতু নহে—সোমপ্রকাশপত্রের সম্পাদকতাই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি এই পত্রের উন্নতিকরণবাসনায় যে, কত পরিশ্রম করিয়াছেন—ইঙ্গরেজি ও সংস্কৃত কতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন—ও কত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। সংবাদপত্র মাত্রেই শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাতদোষে কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া থাকে; সোমপ্রকাশ সেই সাধারণ দোষে একেবারে নির্লিপ্ত, একথা বলিলে হয় ত পাঠকগণ আমাদিগকে চাটুকার মনে করিবেন, এজন্য এই বলাযাইতেছে যে, সোমপ্রকাশে ঐ দোষ বড়ই কম লক্ষিত হয়। যুক্তিবল অবলম্বনকরিয়াই সোমপ্রকাশ বিচারকরিয়াথাকে এবং সেই সকল যুক্তি সম্পাদকের সরল ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইতেই বহির্গত হয়। বিচারের সময়ে বিবাদমগ্ন হইয়া বাচ্যাবাচ্যবোধবিহীন হইতে সোমপ্রকাশকে আমরা কখন দেখি নাই। বিপক্ষে গালি দিলেও সোমপ্রকাশ বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার উত্তর দিয়া থাকে। গাম্ভীর্য্যরক্ষা সোমপ্রকাশের এক প্রধান ও রমণীয়গুণ। সে দিনও বহুবিবাহসম্পর্কে যে বিচার হইয়াগিয়াছে, তাহাতে সোমপ্রকাশের ন্যায় কেহই গাম্ভীর্য্যরক্ষা করিতে পারেননাই। এই সকল গুণ থাকায় সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছে। দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদর পাইয়াছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের ইঙ্গরেজি অনুবাদক 'উইক্লিরিপোর্টার' সোমপ্রকাশের মত যত উদ্ধৃত করেন, অন্য কোন পত্রের তত নহে।

দেশীয় সমাজকে বিশুদ্ধবাঙ্গালাশিক্ষাপ্রদানে সোমপ্রকাশ প্রচুররূপে সহায়তা করিয়াছে, অনেকে সোমপ্রকাশ পাঠকরিয়া বিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালারচনা শিক্ষাকরিয়াছেন। ফলকথা সোমপ্রকাশই বাঙ্গালা সংবাদপত্রের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। পরিশেষে অতীব দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় অবিরত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বোধহয়, এক্ষণে সোমপ্রকাশসম্পাদনকার্য্যে তত যত্ন করিতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য এখন সোমপ্রকাশ সকল সময়ে সমান প্রীতিকর হয় না। কিন্তু সোমপ্রকাশের কোন অসৌষ্ঠব দর্শনকরিলে আমাদের মনে ক্লেশ হয়, এজন্য আমরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সবিনয়ে অনুরোধ করি যে, তিনি সোমপ্রকাশের গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের জন্য অপর বিজ্ঞলোকের সহায়তাগ্রহণ করিতে হয় করুন, কিন্তু উহাতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকটিত হয়, সে গুলি তিনি স্বয়ং উত্তমরূপে একবার দেখিয়াশুনিয়া অনুমোদন করেন।

সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্র।

সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে জনসাধারণের যেরূপ ভাষাচর্চ্চা হয়, অন্যরূপ পুস্তকদ্বারা বোধহয় সেরূপ হয়না। ঐ সকল পুস্তিকা ও পত্র সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়, সুতরাং পূর্ব্ববারের পত্রে লিখিত বিষয়সকল পাঠকরিয়া পরবারের পত্রে আবার কি নূতন বিষয় প্রকটিত হয়, তাহা জানিবার জন্য সহজেই পাঠকের মনে কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হয়। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানপ্রদ বিষয়ের কিয়দংশ কোন পত্রে পাঠকরিয়া আনন্দ জন্মিলে তাহার অবশেষ পাঠ

না করিয়া থাকা যায়না, মধ্যে বিশ্রাম পাওয়াযায় এজন্য কৌতূহলের আরও একটু উদ্দীপ্তি হয়। সামাজিক ব্যবস্থার গুণ-দোষের উল্লেখ, রাজনীতিবিষয়ে বাদানুবাদ, ব্যক্তিবিশেষের উদারচরিত ও বিশাল কীর্ত্তির কীর্ত্তন, প্রধান পদস্থ পুরুষদিগের ন্যায্যান্যায্য ব্যবহারের উদ্ঘোষণ, একস্থানে বসিয়া নানাদেশীয় নানাপ্রদেশীয় নানাবিধ ঘটনার সংবাদলাভ ইত্যাদি বিষয় সকল কাহার প্রীতিকর না হয়? সভ্যজনপদমাত্রেই সংবাদপত্র সাধারণের মুখস্বরূপ হয়—কারণ কোন বিবেচ্য বিষয় উপস্থিত হইলে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতই লোকে প্রায় অবলম্বনকরিয়াথাকে, এবং সেই সেই মতকে আপন আপন মত বলিয়া প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হয় না;—ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে ভিন্নভিন্ন মত প্রকটিত হইলে, ভিন্নভিন্ন সম্প্রদায়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ রাজপুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতকেই প্রজাগণের সাধারণ মত বিবেচনা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। দেশবিশেষে বিখ্যাত সংবাদপত্রই রাজ্যতন্ত্রপরিচালনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। 'টাইম্‌স' নামক সংবাদপত্রকেই অনেকে ইঙ্গলণ্ডের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশকরেন। ফলতঃ যে কোন দেশের হউক না কেন, তদ্দেশের সংবাদপত্রের সংখ্যা দেখিলেই দেশীয়লোকের মনের ভাব ও জাতীয়ভাষার প্রতি অনুরাগ অনেক দূর বুঝিতে পারাযায়।

এই সংবাদপত্র ইঙ্গরেজবাহাদুরদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে, এ দেশে একেবারে ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে না। যে হেতু মুসলমানদিগের রাজ্যকালে—বিশেষতঃ আরঙ্গজেবের অধিকারসময়ে ইতিহাসমধ্যে সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতেপাওয়াযায়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত না—হস্তলিখিত থাকিত। যাহা হউক আমরা এস্থলে প্রথমে সাময়িকপুস্তিকা ও পরে সংবাদপত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিব।—১৮১৬ খৃঃ অব্দে

গঙ্গাধরভট্টাচার্য্যনামা এক ব্যক্তি বেঙ্গলগেজেট নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল-পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিকৃতিসহ মুদ্রিত হইত। ইহার পরেই ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পাদরী মার্সম্যান সাহেব শ্রীরামপুর হইতে দিগ্দর্শন নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন;—উহাতে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ পত্র প্রথমসঙ্খ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে 'গস্পেল ম্যাগাজিন' নামে এক মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হয়, ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মসম্পর্কীয় প্রবন্ধই অধিক থাকিত। ১৮২১ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মনিক ম্যাগাজিন্' নামে ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গলায় এক পত্রিকা প্রকাশকরেন—ইহাতে মিসনরিদিগের সহিত বিচার ও বেদান্তমত সংস্থাপিত হইত। এইরূপে আরম্ভকরিয়া অনেকানেক সাময়িকপুস্তিকা গ্রীষ্মকালোদিত পতঙ্গপুঞ্জের ন্যায় জন্মলাভের কিয়ৎকালপরেই অন্তর্ধান করিয়াছে, অতএব সে সমুদয়ের নামোল্লেখের কিছু প্রয়োজন নাই। তন্মধ্যে যেগুলি কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, কেবল তাহাদেরই নাম উল্লিখিত হইতেছে। ১৮৪২ খৃঃঅব্দে প্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমারদত্ত 'বিদ্যাদর্শন' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশকরেন। কিন্তু ইহার পর বৎসরেই তিনি যে, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণকরিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার জীবনচরিতমধ্যেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃঃঅব্দে আন্দুল নিবাসী রাজনারায়ণ মিত্র 'কায়স্থকিরণ' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশকরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—উহাতে পৌরাণিক বচন সকল উদ্ধৃতকরিয়া, কায়স্থেরাও যে, যজ্ঞোপবীতধারণের যোগ্য, তদ্বিষয় প্রতিপাদিত হইত। কিন্তু ১৮৪৮ খৃঃঅব্দে কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত মুক্তাবলীনাম্নী পত্রিকাদ্বারা কায়স্থ-কিরণের মত খণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ ১৮৪৬ অব্দেই নন্দকুমার কবিরত্ন নিত্যধর্ম্ম-

রঞ্জিকা নামে যে এক পত্রিকা প্রকাশকরেন, তাহাতে বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকধর্ম্মসংরক্ষণার্থ চেষ্টা হয়। ১৮৫০খৃঃঅব্দে সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা প্রকাশিত হয়; ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বড় বড় লেখকেরা সহায়তা করিতেন, কিন্তু উহাও অধিককাল জীবিত থাকে নাই। ইহার কয়েক বৎসর পরে এই পত্রিকাই বালীতে 'শুভকরী' নামে মাধবচন্দ্রতর্কসিদ্ধান্তকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও দীর্ঘজীবিনী হয় নাই। ১৮৫১ খৃঃঅব্দে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাহির হয়। গ্রন্থকারদিগকে অর্থপ্রদানাদি দ্বারা উৎসাহদিয়া সাধারণের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনাকরাইয়া লইবার জন্য ১৮৫৬ খৃঃঅব্দে কলিকাতায় 'বর্ণাকিউলার লিটরেচর সোসাইটী' নামক এক সমাজ সংস্থাপিত হয়—ঐ সমাজ এক্ষণে স্কুল-বুক সোসাইটীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সমাজের একটী প্রধান দোষ ছিল, তাঁহারা গ্রন্থকারদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থদিয়া গ্রন্থ ক্রয়করিয়া লইতেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থ অতিসামান্য; তাহা লইয়া গ্রন্থ বিক্রয়করা কোন ভাল গ্রন্থকারই লাভজনক মনে করিতেননা, সুতরাং ঐ সমাজের সাহায্যে অধিক ভাল গ্রন্থ প্রচারিতহয়নাই, এবং রাজেন্দ্রলালমিত্র, মধুসূদনমুখোপাধ্যায়, রামনারায়ণবিদ্যারত্ন প্রভৃতি সমাজের সম্পৃক্ত কয়েকজন ভিন্ন অল্প লোকেই ঐ সাহায্য লইয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। যাহাহউক বাবু রাজেন্দ্রলালমিত্রের সম্পাদকতায় বিবিধার্থসংগ্রহ কয়েক বৎসর প্রচারিত হইলে পর, উক্ত সোসাইটী উহার প্রচারের ভারগ্রহণ করেন। ঐ পত্রে সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বস্তুতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের বহুলজ্ঞানপ্রদ প্রবন্ধ সকল, মধ্যে মধ্যে প্রতিকৃতিসমেত, প্রকাশিত-হইত। ঐ পত্রের ভাষা সর্ব্বস্থলে সরল ও মধুর হইতনা কিন্তু ঐ পত্রদ্বারা রাজেন্দ্রবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, সদনুরাগ, অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্গুণের প্রচুর পরিচয় প্রদত্তহইয়াছে। বলিতে কি,

বিবিধার্থসংগ্রহগুলি একত্র সম্বন্ধকরিয়া নিকটে রাখিলে একটী রত্ন-ভাণ্ডার সঞ্চিতকরাহয়। আমরা ঐ রত্নদাতা রাজেন্দ্রবাবুর নিকট শতবার কৃতজ্ঞতাস্বীকার করি। বিবিধার্থসংগ্রহ কিছুকাল ৺ কালী-প্রসন্নসিংহকর্ত্তৃক চালিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া 'রহস্যসন্দর্ভ' হইয়াছে এবং রাজেন্দ্রবাবু উহার সম্পাদকতা প্রাণনাথদত্তকে প্রদানকরিয়াছেন। ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারকর্ত্তৃক 'মাসিকপত্রিকা' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্যারীচাঁদবাবুর আলালী ভাষার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—সুতরাং এ পত্রিকার ভাষাবিষয়ে আর কিছু বলিতে হইবেনা। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে শ্রীজগন্মোহনতর্কালঙ্কার 'বিজ্ঞানকৌমুদী' নামে এক পত্রিকা প্রকাশকরেন, তাহা কিয়ৎকাল মাত্র উত্তমরূপে চলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। যাহাহউক এইরূপে যে সকল সাময়িক পুস্তিকা অল্পকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া তিরো-হিত হইয়াছে, তাহাদের নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন;—যেগুলি এখনও প্রচলিত আছে, এবং যাহাদের কিঞ্চিৎপ্রতিষ্ঠা আছে, স্থানা-ন্তরে তাহাদেরই বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইবে।

এই সাময়িক পুস্তিকার প্রসঙ্গে বাঙ্গালা পঞ্জিকার বিষয়ে উল্লেখ করিলে বোধহয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। পঞ্জিকা আমাদের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের পরিচালিকা—সুতরাং ইহা যে, কতকাল হইতে চলিতেছে, তাহার নির্ণয়চেষ্টা বিফল। সুতরাং তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া, এক্ষণে যেরূপ মুদ্রিতপঞ্জিকাসকল বাহির হইতেছে, ঐরূপ পঞ্জিকা কতদিন হইতে প্রকাশিত হইতেছে, আমরা ইহাতে কেবল সেই কথারই উল্লেখ করিব।—এক্ষণে পাঁজির বামপার্শ্বে অঙ্ক দ্বারা সাঙ্কেতিকরূপে যে গণনা লেখাথাকে, পূর্ব্বে কেবল ঐরূপই পঞ্জিকা ছিল—ব্রাহ্মণপণ্ডিত বা দৈবজ্ঞগণ তাহা ব্যবহারকরিতেন, সাধারণের তাহা বোধগম্য হইতনা। ১৮১৮ খৃঃঅব্দে রামহরি নামক

এক ব্যক্তি পঞ্জিকাস্থ অঙ্কের প্রতিপাদ্য অর্থ সকল ভাষায় লিখিয়া শ্রীরামপুর হইতে এক পঞ্জিকা মুদ্রিতকরেন। উহাতে সূর্য্যমণ্ডলের একটী চিত্রময় প্রতিরূপ প্রকাশিত ছিল। ১৮২৪ খৃঃঅব্দে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ এক নূতন পঞ্জিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ খৃঃঅব্দে ৺ বিশ্বনাথতর্কভূষণকর্ত্তৃক এক পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ইহাই 'কালেজের পঞ্জিকা' নামে খ্যাত হইয়াছিল। অনন্তর বৎসর বৎসর নূতন নূতন উন্নতিযোগসহকারে নূতন নূতন পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে কলিকাতায় অনেকানেক নূতন পঞ্জিকা প্রকাশিত হইতেছে;—প্রতিবৎসর ১০০,০০০ এক লক্ষেরও অধিক পঞ্জিকা বিক্রীত হয়।

অতঃপর সংবাদপত্রের বিষয় উল্লেখ্য হইতেছে।—শ্রীরামপুরই উহার আদিম প্রকাশ স্থান। ১৮১৮ খৃঃঅব্দের ২১এ আগষ্ট মার্শমান সাহেব 'সমাচার দর্পণ' নামে এক সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে ইঙ্গরেজি বাঙ্গলা দুইই থাকিত। মিসনরি-দিগের এই নূতনকার্য্যে পরমপরিতুষ্ট হইয়া গবর্ণর জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেব উৎসাহবর্দ্ধনার্থ তাৎকালিক ইঙ্গরেজিসংবাদপত্রের ডাকমাশুলের চতুর্থাংশে উহার প্রচলনের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং তৎপরে লর্ড আমহরেষ্ট বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে উহার এক এক শত খণ্ড গ্রহণকরিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই পত্র ১৮৪১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। কলিকাতার ৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামমোহন রায় উভয়ে মিলিত হইয়া ১৮১৯ খৃঃ অব্দে 'কৌমুদী' নামে একখানি পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাতে সতী-দিগের সহমরণনিবারণপক্ষ সমর্থিত হওয়ায় বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সংস্রব পরিত্যাগপূর্ব্বক ১৮২২ অব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে অপর এক পত্র সপ্তাহে দুইবার করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রে ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয়ানদিগের মতের প্রতিবাদ করিয়া প্রচলিত

হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণচেষ্টার সপক্ষতা থাকায়, সর্ রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকেরা উহার বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সমাচারদর্পণ ও চন্দ্রিকায় ধর্ম্মসম্পর্কে কয়েক বৎসর বহুল বাদানুবাদ হইয়াছিল; ব্রাহ্মদিগের প্রতিকূলে কলিকাতায় যে ধর্ম্মসভা সংস্থাপিত হয়, চন্দ্রিকাই তাহার মুখস্বরূপ ছিল—ফলতঃ এক সময়ে এই চন্দ্রিকা দেশমধ্যে বিলক্ষণ আধিপত্য করিয়াছে। এই পত্রিকা অদ্যাপি জীবিত আছে, কিন্তু এখন্ আর তাদৃশ প্রভা নাই। চন্দ্রিকার পর 'তিমিরনাশক' ও তৎপরে ১৮২৫ অব্দে ৺নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক বঙ্গদূত প্রকাশিত হয়। ইহাতে শাস্ত্রসঙ্গত বিচারই অনেক থাকিত। ইহার পরে ১৮৩০ অব্দে সংবাদপ্রভাকর প্রাদুর্ভূত হইবার বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে সতীদাহনিবারণ উপলক্ষে দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়াযায় এবং সেই সময়ে ঐ কার্য্যের অনুকূলে ও প্রতিকূলে মাসিক সাপ্তাহিক প্রভৃতি অনেকগুলি পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল অধিক দিন থাকে নাই। ১৮৩৫ অব্দে ' সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় ' দৃষ্ট হয়। উহা অদ্যাপি শ্রীঅদ্বৈতচরণ আঢ্য কর্ত্তৃক প্রাত্যহিকরূপে প্রচারিত হইতেছে। অতঃপর ১৮৩৯ সালে ৺গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংবাদভাস্কর ও রসরাজ নামে দুই পত্র প্রকাশিত হয়। ভাস্কর সপ্তাহে তিনবার ও রসরাজ দুইবার বহির্গত হইত। ভট্টাচার্য্য খর্ব্বকায় পুরুষ ছিলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে ' গুড়্গুড়ে ' বলিত। ঈশ্বরগুপ্ত যেরূপ পদ্য, গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য্য সেইরূপ গদ্যরচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভাস্করের গদ্যরচনা সকলেই প্রশংসা করিত। এই পত্র অদ্যাপি শ্রীক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে ; কুৎসিত রসরাজের মৃত্যুর কথা পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে। ১৮৪০ অব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টগেজেট প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; ইহাতে আইন, গবর্ণমেণ্টকৃত নানাবিধ বিজ্ঞাপন

ও কর্মচারিগণের নিয়োগাদি অনুজ্ঞা সকলের অনুবাদ থাকে। জে, রবিন্সন সাহেব ইহার অনুবাদক। এই অনুবাদের ন্যায় জঘন্য বাঙ্গালাভাষা আর কোথাও দেখিয়ত' পাওয়াযায়না। কার বাপের সাধ্য যে, বাঙ্গালা পড়িয়া স্পষ্টরূপে উহার ভাবগ্রহ করিতে পারে! বাক্যসকল অনেক স্থলেই লম্বা লম্বা, কিন্তু তাহার মধ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়ার যোগ যে, কোথায়? তাহার কিছু বুঝিবার যো নাই। আদালতের লোকদিগকে সর্ব্বদা এই ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, এই জন্যই বোধ হয়, আদালতের ভাষা শোধিত হইতে পায়না।—এই বৎসরেই কাশীমবাজারের রাজা ৺কৃষ্ণনাথ রায়* মুর্শীদাবাদপত্রিকা নামে এক পত্র প্রকাশ করেন। উহাদ্বারা নিজ প্রজাগণের অভীষ্টসাধন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিয়ৎকাল পরেই জন্মদাতার সহিতই ঐ পত্র বিলীন হয়। ১৮৪২ সালে প্রসিদ্ধ ৺রামগোপাল ঘোষ ও শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র ইঙ্গরেজি ও বাঙ্গালায় "বেঙ্গলস্পেক্টেটর" নামক এক পত্র প্রকাশ করেন;—ইহা ২ বৎসর স্থায়ী হয়। ১৮৪৬ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং ১৮৪৭ সালে 'সুধীরঞ্জন' নির্গত হয়; ইহাদের বিষয় আর এক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে অনেক গুলি জঘন্য পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে একখানির নাম 'আক্কেলগুড়ুম'। ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রসম্পাদকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারিতেন না; গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারীদ্বারা পরীক্ষিত না হইলে কোন প্রবন্ধই প্রকাশিত হইতে পারিতনা। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনেরল্ মেটকাফ্ সাহেব সে নিয়ম রহিত করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতাপ্রদান করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবস পর্য্যন্ত কতকগুলি অনুদারাশয় লোকে সেই স্বাধীনতার বিলক্ষণ দুর্ব্যবহার করিয়া আক্কেলগুড়ুম্ প্রভৃতি জঘন্য পত্র প্রকাশ করিয়াছিল।—

* দানশৌণ্ডা শ্রীমহারাণী স্বর্ণময়ী ইহাঁরই বনিতা, অসাধারণধিষণাসম্পন্ন শ্রীযুত রায় রাজীবলোচন রায়বাহাদুর যাঁহার প্রধানামাত্য।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায় রসসাগর নামে এক দ্ব্যাহিকপত্র প্রকাশ করেন ; ইহা ৬ বৎসর অবস্থিত ছিল। ১৮৬০ সালে পরিদর্শক নামে এক পত্র প্রকাশিত হয়; ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে প্রাত্যহিক হইয়াছিল। শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন ; কালীপ্রসন্ন সিংহও কিছুকাল ইহার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—কিন্তু দীর্ঘকাল জীবিত রাখিতে পারেন নাই। এইরূপে কত কত সংবাদপত্রের অল্পকাল মধ্যেই জন্ম বৃদ্ধি ও লয় হইয়াছে, তাহার সঙ্খ্যা করা কঠিন। এতদ্দেশহিতৈষী পাদরী শ্রীযুত জে, লঙ্ সাহেবের অনুগ্রহে আমরা বহুসঙ্খ্যক সাময়িকপুস্তিকা ও সংবাদপত্রের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, অনাবশ্যকবোধে সেই সমুদয় প্রকাশকরিলাম না।

এক্ষণে যে সমস্ত সাময়িকপুস্তিকা ও সংবাদপত্র এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, এবং আমরা যাহাদের সন্ধান জানিতে পারিয়াছি, সঙ্ক্ষিপ্তভাবে তাহাদের উল্লেখমাত্র করিয়া এপ্রকরণ সমাপ্ত করিব। ঐ সকল পত্রের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি——

মাসিক— তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, রহস্যসন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, কলিকাতা-সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা-প্রকাশিত সনাতনধর্ম্মোপদেশিনী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়সম্পাদিত আর্য্যাবর্ত্তরীতিশোধিনী, মাহেশস্থ শ্রীসত্যব্রতসামশ্রমি নির্ব্বাহিত (সংস্কৃত বাঙ্গালা) প্রত্নকম্রনন্দিনী, এবং হিতব্রত, পাবনা-বামাবোধিনীসভাপ্রচারিত বামাবোধিনীপত্রিকা, ঢাকাস্থ শ্রীকালিদাস মিত্রের মিত্রপ্রকাশ, শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত চিকিৎসাসংগ্রহ, শ্রীতিনকড়ি ঘোষালের নবপ্রবন্ধসার, বারুইপুরপ্রকাশিত আর্য্যোদয়, বিশ্বদর্পণ, বোয়ালিয়াপ্রকাশিত জ্ঞানাঙ্কুর, শ্রীবেণীমাধব ঘোষের বঙ্গসুহৃদ, ও ভবানীপুরের বঙ্গমিহির।

পাক্ষিক— বর্দ্ধমানস্থ শ্রীপ্যারীলাল সিংহের প্রচারিকা, রাজসাহী সংবাদ, শ্রীঈশ্বরচন্দ্ররায় প্রকাশিত বরিশালবার্ত্তাবহ, সিরাজগঞ্জের দেশহিতৈষিণী, ঢাকার পরিমলবাহিনী ও বঙ্গবন্ধু, এবং অবলাবান্ধব।

সাপ্তাহিক— সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, ঢাকার শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায় প্রকাশিত ঢাকাপ্রকাশ, শ্রীমনোমোহন ঘোষের মধ্যস্থ, শ্রীশিশিরচন্দ্রঘোষপ্রচারিত ,অমৃতবাজারপত্রিকা, শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্যের প্রয়াগদূত, রঙ্গপুরের দিকপ্রকাশ, শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক পরিদর্শক, ভবানীপুরের সাপ্তাহিক সংবাদ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মুর্শীদাবাদপত্রিকা, বহরমপুরের ভারতরঞ্জন, গৌহাটীমুদ্রিত আসামমিহির, কুমারখালির শ্রীহরিনাথমজুমদারপ্রচারিত গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা, ভারতভৃত্য, বরিসালস্থ হিতসাধিনী, ঢাকার শুভসাধনী ও হিন্দুহিতৈষিণী, বৌলিয়া-ধর্ম্মসভা-প্রকাশিত হিন্দুরঞ্জিকা, গবর্ণমেণ্টপ্রচারিত বাঙ্গালাগেজেট, (১ পয়সা মূল্যের) সুলভসমাচার, ভারতসংস্কারক এবং শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সম্পাদিত হালিসহরপত্রিকা।

আর্দ্ধ সাপ্তাহিক— সমাচারচন্দ্রিকা এবং সংবাদভাস্কর।

প্রাত্যহিক— সংবাদপ্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয় এবং শ্রীনবীনচন্দ্র আঢ্য সম্পাদিত বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা।

এই সকল ভিন্ন পুরাণপ্রকাশ, কাব্যপ্রকাশিকা, বিবিধপুস্তকপ্রকাশিকা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবততত্ত্ববোধিকা প্রভৃতি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অনেকগুলি সাময়িকপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। পঞ্জিকা ভিন্ন বাঙ্গালা সাময়িকপুস্তিকা ও সংবাদপত্রে সর্ব্বসমেত প্রায় ৬০ খানি পত্রিকা কলিকাতা ও মফস্বলে প্রকাশিত হয়। অতএব প্রতি পত্রিকার ন্যূনসঙ্খ্যায় যদি ৩০০ করিয়া গ্রাহকের গড় ধরা যায়, তবে ঐ সমস্ত পত্রিকার অন্যূন ১৮০০০ গ্রাহক আছে, বলা যাইতে পারে। অতএব দেশের মধ্যে প্রায় ২০,০০০ লোক সংবাদপত্রপাঠের রসজ্ঞ হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

ব্যাকরণ।

আদ্য ও মধ্যকালে কেহ বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনাকরেন নাই— ইদানীন্তনকালে বাঙ্গালাব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খৃঃ অঃ] হালহেড্ নামক একজন ইঙ্গরেজ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালাব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ঐ ব্যাকরণ আমরা দেখিতে পাই নাই, সুতরাং উহা কিরূপ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল, বলিতেপারি না। অনুমান হয়, ইঙ্গরেজিব্যাকরণের রীতিই উহাতে অবলম্বিত হইয়াথাকিবে। যাহা হউক হালহেড্ সাহেবের পর কেরি সাহেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, হটন্ সাহেব, রামমোহনরায়, জয়গোপালতর্কালঙ্কার, ভগবচ্চন্দ্র-বিশারদ, ব্রজকিশোরগুপ্ত, কীথ্ সাহেব, ক্ষেত্রমোহন, নন্দকুমারবিদ্যারত্ন, মুক্তারামবিদ্যাবাগীশ, শ্যামাচরণসরকার, ওয়েঙ্গার সাহেব প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয় বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনাকরিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাকরণের মধ্যে কয়েকখানি ইঙ্গরেজির অনুকৃতি, কয়েকখানি সংস্কৃত মুগ্ধবোধের অবিকল অনুবাদ এবং কোন খানি নিতান্ত অপভাষা-শব্দসকলেরও সাধনপ্রক্রিয়াসমন্বিত। সুতরাং ইহাদের কোন খানিই সর্ব্ববিধ লোকের অনুমোদিত হয় নাই। ইহা দেখিয়া ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে কোন গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক স্বীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে তৎকালপ্রচলিত কোন ব্যাকরণ অবলম্বন না করিয়া স্বয়ং এক বাঙ্গালাব্যাকরণ রচনাকরেন। মুগ্ধবোধ ও উপক্রমণিকা এই উভয়ই উহার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। বাঙ্গালাতে ইঙ্গরেজির অনুকরণ না করিয়া এবং আপভাষিক শব্দসাধনের প্রক্রিয়া ত্যাগ করিয়া যে সকল সন্ধি শব্দ সমাস তদ্ধিত ও কৃদন্ত পদ প্রভৃতি বাঙ্গালাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদেরই নিয়ম ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতি উহাতে নিবেশিত হইয়াছিল। তখনও বাঙ্গালাভাষা পূর্ণা-

বয়ব হয় নাই, সুতরাং তৎকালে প্রকৃত বাঙ্গালাব্যাকরণ রচিতহওয়া সম্ভব নহে, এই বোধে উক্ত অধ্যাপক সে ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন নাই —পাঠনার সময়ে ছাত্রদিগকে বলিয়া দিতেন, তাহারা খাতায় লিখিয়া লইয়া অভ্যাস করিত। এইরূপে খাতায়২ই ঐ ব্যাকরণ ৮ বৎসর চলিয়া বহুদূর ব্যাপিয়াছিল, তৎপরে উহা 'বাঙ্গালাব্যাকরণ' নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

উক্ত অধ্যাপকের ব্যাকরণ হস্তলিখিতরূপেই কিয়ৎকাল প্রচলিত হইলে পর লোহারামশিরোরত্ন ও তৎপরে শ্রীমন্তবিদ্যাভূষণ প্রায় ঐরূপ প্রণালীতেই এক এক বাঙ্গালাব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। এক্ষণে আরও অনেকগুলি ঐরূপ বাঙ্গালাব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে—তন্মধ্যে আমরা এই গুলির সন্ধান পাইয়াছি—নীলমণিমুখোপাধ্যায়প্রণীত বোধসার ও নববোধব্যাকরণ, বাঙ্গালাবোধব্যাকরণ, মথুরানাথতর্করত্নের ব্যাকরণচন্দ্রিকা, জগচ্চন্দ্রচক্রবর্ত্তীর ব্যাকরণপ্রবেশ, কেদারনাথতর্করত্নের ব্যাকরণমঞ্জরী, বিশ্বম্ভরচট্টোপাধ্যায়ের ব্যাকরণসার, দ্বারকানাথবিদ্যাভূষণপ্রণীত ভূষণসারব্যাকরণ, জয়গোপালগোস্বামীর লঘুব্যাকরণ, লোহারামশিরোরত্নরচিত শিশুবোধব্যাকরণ, শশিভূষণতর্করত্নের সংস্কৃতশিক্ষোপযোগী বাঙ্গালাব্যাকরণ, বিষ্ণুচরণনন্দিকৃত বিষ্ণুসারব্যাকরণ, সরলব্যাকরণ, রাজকুমারসর্ব্বাধিকারিরচিত বঙ্গব্যাকরণ, যশোদানন্দনসরকারের সঞ্জীবনী, এবং কালীপ্রসন্নবিদ্যারত্নপ্রণীত বাঙ্গালাব্যাকরণ। এই সকল ব্যাকরণের কোন কোন খানির শেষভাগে বাঙ্গালা ছন্দ ও বাঙ্গালা অলঙ্কার সকলও বিনিবেশিত হইয়াছে।

ছন্দ।

আদ্য ও মধ্যকালে পয়ার, ত্রিপদী, এবং মধ্যে মধ্যে একাবলী দিগক্ষরা, ভঙ্গপয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ-লঘু ও ভঙ্গ ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী এই

কয়েকটীমাত্র ছন্দ সচরাচর ব্যবহৃত হইত। মধ্যকালের শেষে কবি-রঞ্জন কতকগুলি নূতনবিধ ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে রায়গুণাকর—অনন্তর তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার পর ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত অনেক নূতন ছন্দ বাঙ্গালায় অবতারিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন অপর সকলেরই প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দসকল সংস্কৃতমূলক। তৎপরে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় হেমচন্দ্রবন্দ্যোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণমুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইঙ্গরেজিভাষাবিৎ কয়েকজন কবি ইঙ্গরেজি ছন্দোবিশেষের অনুকরণে কয়েকপ্রকার নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাঁদের উদ্ভাবিত ছন্দ সকলে ১ম ও ৩য় পঙ্‌ক্তিতে এবং ২য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে মিল ইত্যাদিরূপ মিত্রাক্ষরতাসম্পৃক্ত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য এবং পয়ার ও ত্রিপদীর একত্রীকরণ ভিন্ন অপর কোন চমৎকারিতা অনুভূত হয়না। মাইকেল্ মধুসূদনদত্ত পয়ারের অন্ত্যবর্ণের মিল উঠাইয়া দিয়া অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দঃসৃষ্টির যশোলাভ করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুকৃতি ভিন্ন যে সকল নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রায় পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তরমাত্র—অর্থাৎ পয়ারের আদি বা অন্তে ২।১ অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়া, কোন স্থলে বা পয়ার ও ত্রিপদীকে মিলিতকরিয়া তাহাদের নিবন্ধন হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকারকরিতে হইবে যে, অক্ষরের ঐরূপ ন্যূনাধিক্য করায় বা পয়ারত্রিপদীপ্রভৃতিকে মিলিতকরায়, স্থলবিশেষে ছন্দের বিলক্ষণ মধুরতা জন্মিয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃতের অনুকরণ ও পয়ারাদির রূপান্তরকরণ দ্বারা এক্ষণে বাঙ্গালায় অনেকবিধ ছন্দ প্রচলিত হইয়াছে। লালমোহনভট্টাচার্য্যপ্রণীত কাব্যনির্ণয় নামক পুস্তকে একটী ছন্দঃপরিচ্ছেদ নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে তিনি, পর্য্যায়সম, পর্য্যায় ও শেষসম, অর্দ্ধসম, পর্য্যায়বিষম, পয়ার, ভঙ্গপয়ার, রঙ্গিল পয়ার, দীর্ঘ-লঘু-তরল-ভঙ্গ ও হীনপদ ত্রিপদী, দীর্ঘ-লঘু-অধিকপদ চতুষ্পদী, মালঝাঁপ, একাবলী, দীর্ঘ ও লঘু ললিত, কুসুমমালিকা,

মালতী, তূণক, দিগক্ষরা, তরলপয়ার, অমিত্রাক্ষর, পজ্ঝটিকা, গজ-গতি, দ্রুতগতি, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অনুষ্টুপ্, রুচিরা, ক্রৌঞ্চপদা, সোমরাজী, চম্পক ও বিশাখ এই ৩৭ প্রকার ছন্দের সোদাহরণ লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য।

কবিরঞ্জন, রায়গুণাকর ও তর্কালঙ্কার যে কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় গ্রহণকরিয়াছেন, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক, মালিনী ও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি অপর সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় অবতারণা করিতে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বোধে কেহই কৃতকার্য্য হয়েননাই। এতাবতা এই সিদ্ধান্ত করাযাইতেপারে যে, সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' ছন্দসকল বাঙ্গালার উপযোগী হয়—'দীর্ঘ' ছন্দ উপযোগী হয়না।

আদ্যকালের শেষভাগে আমরা পয়ার ও ত্রিপদীর লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু তৎকালপ্রচলিত পয়ারাদি অপেক্ষা এক্ষণকার পয়ারাদি অনেক বিশুদ্ধ হইয়াছে। পদের মধ্যে যতি না পড়িলে, এবং প্রতি অর্দ্ধের উপান্তিম স্বর ও অন্তিম হলবর্ণ এ উভয়ের মিল থাকিলে, তাহাকে বিশুদ্ধ পয়ার বলাযায়। প্রাচীনকালের পয়ারে অন্তিম হলের মিল প্রায় থাকিত, উপান্তিম স্বরের মিল সর্ব্বত্র থাকিত না। ত্রিপদীও এইরূপ। বাহুল্যভয়ে যতিভঙ্গের উদাহরণ না দিয়া পয়ারস্থ মিলেরই দুইটী উদাহরণ প্রদর্শনকরা যাইতেছে।

সত্যকথা সদা কবে হ'য়ে সাবধান।
মিথ্যাবাদী যথা তথা হয় হতমান॥

এস্থলে 'ধান'—'মান' ইহাদের মিল বিশুদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু

খোঁড়াকে বলিয়া খোঁড়া কাণা জনে কাণা।
কদাপি তাদের মনে দিওনা বেদনা॥

এস্থলে 'কাণা' 'দনা' এ মিল বিশুদ্ধ হয়নাই—দনার পরিবর্ত্তে 'দানা' হইলে বিশুদ্ধ হইত।

চলিত পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক প্রকার ছন্দ আমা-

দের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে—আমরা তাহার কয়েকটী-মাত্র উদ্ধৃত করিলাম—পাঠকগণ সন্ধানকরিয়া দেখিবেন, এইরূপ ছন্দোবদ্ধ কত শ্লোক দেশমধ্যে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত আছে।—

"আয় রৌদ্র হেনে। ছাগল দেব মেনে।।" ইত্যাদি
"শুশুনী কলমী ন ন করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে।
মারণ পক্ষী সুখের বিল। সোণার কৌটা রূপার খিল।
খিল খুল্‌তে হাতে ছড়। আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর" ।। ২ ।।
"শর শর শর। আমার ভাই-গাঁএর বর ।।
বর বর ডাকপড়ে। গুও গাছে গুও ফলে ।।
আমার ভাই চিব্‌য়ে ফেলে। অন্য লোকের ভাই কুড়্‌য়ে খায় ।।"৩।।
"শিল শিলেটন্ শিলে বাটন শিলা আছে ঘরে।
স্বর্গে থেকে মহাদেব বলে গৌরী কি বক্ত করে ।।
আশ নাড়ন পাশ নাড়ন তোলা গঙ্গাজল।
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর ।। ৪ ।।" ইত্যাদি

অলঙ্কার।

বাঙ্গালাভাষা অতিদুঃখিনী। ইহার নিজের কিছুমাত্র অলঙ্কার নাই। যাহা ২।৪ খান ইহার গাত্রে দেখাযায়, তাহা মাতামহীর (সংস্কৃতভাষার) নিকট প্রাপ্ত। বাঙ্গালা যখন্ বালিকা ছিল, তখন্ মাতামহীর ভারী ভারী মোটা মোটা যে সকল অলঙ্কার (অনুপ্রাস উপমা রূপকাদি) তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট ছিল—এখন্ যুবতী হইয়াছে, এখন্ আর সে সকল পুরাতন মোটা অলঙ্কারে উঁহার মন উঠেনা।—এখন্ জড়াও অলঙ্কারের (প্রতিবস্তূপমা নিদর্শনা সমাসোক্তি প্রভৃতির) প্রতি লোভ হইয়াছে, এবং ছলে বলে কৌশলে এক এক খানি করিয়া বৃদ্ধার অনেক অলঙ্কারই আত্মসাৎ করিতেছে। কামিনীগণের অলঙ্কার পরিবার সাধ পাঠকদিগের অবিদিত নাই। 'মল্' বলিয়া দশ সের রূপার বেড়ী দিলেও মনের সুখে পরিবেন; কাণ ছিঁড়িয়া যায়—তবু

সোণা পরিবেন—শেষে না হয় সোনার কাণ গড়াইবেন। ভাগ্যবন্ত গৃহের অনেক গৃহিণী অলঙ্কারের ভরে চলিতে পারেননা—ভাল দেখায় না, তবু অলঙ্কারে সাজিয়া 'আহ্লাদে পুতুল' হইয়া বসিয়া থাকিবেন! বুড়া আর্য্যীর গাএর সমস্ত অলঙ্কার বাঙ্গলার গাএ সাজিবে না—জবড়জঙ্গী হইবে—ইহা বাঙ্গালা বোঝে না, তাহা নহে; তবু যে, সে অলঙ্কারের ঝুড়ি মাথায় করিতে চাহে, সে তাহার জাতির গুণ!

আদ্য ও মধ্যকালে অনুপ্রাস উপমা রূপক প্রভৃতি কয়েকটীমাত্র অলঙ্কার বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে ক্রমে অনেকগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার ইহাতে গৃহীত হইতেছে। এখন অনেকে বাঙ্গালা ব্যাকরণের শেষে একটী অলঙ্কারপরিচ্ছেদ বিনিবিষ্ট করিতেছেন। এই বিষয়ে ২। ১ খানি পৃথক্ গ্রন্থও প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কাব্যনির্ণয় নামক পুস্তকে শ্লেষ, অনুপ্রাস, যমক, ভাষাসম, পুনরুক্তবদাভাস; উপমা, রূপক, ভ্রান্তিমান্, অসঙ্গতি, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অর্থান্তরন্যাস, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, বিরোধ, নিদর্শনা, ব্যাঘাত, কাব্যলিঙ্গ, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, পরিবৃত্তি, ব্যাজস্তুতি, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তূপমা, তুল্যযোগিতা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, সন্দেহ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, বিশেষোক্তি, প্রভৃতি অনেকগুলি অলঙ্কার সলক্ষণ সোদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃতেই এই সকল অলঙ্কারের অনেকগুলি বিশেষ বৈচিত্র্যাধায়ক নহে—বাঙ্গালার কথা সুদূর পরাহত।

ভাষা।

আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তনকালে বাঙ্গালাভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ক্রমে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে, তাহা তত্তৎকালরচিত গ্রন্থচয়ের সমালোচনাবসরেই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাষার সহিত ভাষান্তরের মিশ্রণ কোথায় কিরূপ হইয়াছে,

সে কথা সর্ব্বস্থলে বলা হয়নাই, এক্ষণে সঙ্ক্ষেপে তদ্বিষয়েই দুই এক কথা বলা যাইতেছে।—আদ্যকালের ভাষায় হিন্দী বল—ব্রজভাষা বল—প্রাকৃত বল—অপর ভাষা বল—যাঁহা কিছু মিশ্রিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে ইহার মধ্যে আরবী, পারসী, ইঙ্গরেজী প্রভৃতি কোন বিদেশীয় ভাষা লব্ধপ্রবেশ হয় নাই, কারণ তৎকালে কোন বিদেশীয় জাতি বহুলরূপে দেশমধ্যে অবস্থান করেন নাই। কিন্তু মধ্যকালীন ভাষার যে সকল উদাহরণ এই গ্রন্থেই পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপাঠে সুস্পষ্ট দৃষ্টহইবে যে, মুসলমানদিগের আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ তৎকালীন বাঙ্গালার মধ্যে আরবী, পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতির ভাষাস্থ প্রচুর শব্দের বহুল মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে—এত মিশ্রণ যে, আমরা উহাদের অনেক শব্দকে ভিন্নভাষার শব্দ বলিয়া বুঝিতেই পারিনা। বর্ত্তমানকালে আবার ইঙ্গরেজ বাহাদুরদিগের রাজত্বনিবন্ধন দিন দিন ভূরি ভূরি ইঙ্গরেজি শব্দ বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবী, পারসী, ইঙ্গরেজীপ্রভৃতি কত ভাষায় মিশ্রিত হইয়া যে, কিরূপ খেচরী হইতেছে, তাহা বলাযায়না। মধ্যে কয়েক বৎসর কতিপয় কৃতবিদ্যলোকের যত্নে ইহা বিলক্ষণ সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধ, ও উন্নতিশালিনী হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার রাজপুরুষদিগের বাঙ্গালাবিদ্যালয়সমস্তের প্রতি যেরূপ নূতনবিধ নিয়মসকল প্রচারিত হইতেছে—যদি ইহা অপরিবর্ত্তিত থাকে তবে আবার যে, ইহা অচিরেই অধোগামিনী হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

কথোপকথনে চলিতভাষা কিম্বা সংস্কৃতগর্ভক ভাষা এখন্ পুস্তকাদিতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? এ বিষয়ে এক্ষণে যে বিচার উঠিয়াছে, পূর্ব্বে একস্থলে* তাহার যথামতি মীমাংসাকরা গিয়াছে। অতএব

* ৩১৮ পৃষ্ঠস্থ ২৩ পঙ্ক্তি হইতে দেখ।

তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এক্ষণে ভাষার রচনাপ্রণালী লইয়া ২।৪ কথা বলা আবশ্যক হইতেছে—বাঙ্গালাভাষার রচনাপ্রণালী-শিক্ষার্থ রচনাবলী প্রভৃতি ২।১ খানি পুস্তক প্রস্তুতহইয়াছে, অতএব তৎপাঠে ঐ বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব। আমরা সে সকল বিষয়ে অধিক হস্তক্ষেপ করিবনা—স্থূলরূপে কেবল এই কথা বলিব যে, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, ইহার রচনাপ্রণালী শিক্ষা-করিবার জন্য পুস্তকগত নিয়মাবলী অভ্যাসকরিতেহয়না; এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাশয় বাঙ্গালারচনা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহা-দের কেহই ঐরূপ পুস্তক অধ্যয়নকরেননাই। অশ্লীল, দুশ্রব, দুর্ব্বোধ ও ব্যাকরণদুষ্ট নাহয়, এইরূপ বুঝিয়া বাক্যবিন্যাস করিতে পারিলেই উৎকৃষ্টরচয়িতৃমধ্যে গণ্য হইতে পারাযায়। ফলকথা বাঙ্গালা রচনা করিতে হইলে—"বাক্যমধ্যে প্রথমে কর্ত্তা, শেষে ক্রিয়া ও মধ্যভাগে কর্ম্ম করণ প্রভৃতি অপরাপর কারক ও অসমাপিকা ক্রিয়া পদাদি বসাইতে হইবে। সঙ্খ্যাবাচক ও বিশেষণপদসকল বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বসিবে।—বিশেষণ যদি বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে বিশেষ্যের পরে বসিবে, যথা নন্দ বড় মূর্খ; এখানে মূর্খ পদ বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে।—বিশেষণ, বিশেষ্যের সমলিঙ্গ হয়, কিন্তু পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে বিশেষণের রূপভেদ হয়না, যথা সুন্দর ফল বা সুন্দর পুরুষ। স্ত্রীলিঙ্গে বিশেষণের রূপভেদ হয়, যথা সুন্দরী নারী। যেখানে বিশেষণপদ স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করিলে দুশ্রব হয় বা বক্তার পাণ্ডিত্যপ্রকাশ দেখায়, সেখানে তাহাদিগকে অমনি বিন্যস্তকরাই সৎপরামর্শ; ক্ষুদ্রা নৌকা বা মেঘাচ্ছন্না রজনী ইত্যাদি না বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা বা মেঘাচ্ছন্ন রজনী ইত্যাদি বলাই ভাল। কিন্তু যেখানে বিশেষণপদ এরূপ যে, তাহাকে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত না করিলে সে পদ পুংলিঙ্গের মত হইয়া পড়ে, সেখানে তাহাদিগকে অবশ্যই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করিতে হইবে; যথা গতিশালী নৌকা ও জ্যোৎস্নাবান

রজনী ইত্যাদি না বলিয়া গতিশালিনী নৌকা ও জ্যোৎস্নাবতী রজনী ইত্যাদি বলিতেই হইবে। বাঙ্গালারচনায় এই নিয়মের প্রতি কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নচেৎ অনেকস্থলে ভ্রম হইয়া পড়ে'' —ইত্যাদি প্রকারে নিয়মসকল প্রতিপালন করিতে হইবে, এবম্বিধ বাক্যবিন্যাস ও নিয়মনির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থবাহুল্য করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, এই জন্য সে বিষয়ে নিরস্ত থাকিয়া বাঙ্গালা রচনায় বা বাঙ্গালা কথোপকথনে শব্দগত যে সকল সাধারণভ্রম আছে—এমন কি, বিশেষ বিজ্ঞলোকেরাও কখনও কখনও অজ্ঞাতভাবে যে সকল ভ্রমে পতিত হয়েন, এখন তাদৃশ কতিপয় ভ্রমের উল্লেখ করিয়াই এ প্রকরণ পরিত্যাগ করিব। সে সকল ভ্রম এই ———

(১) "অত্র আদালতের বিচারে''—বিশেষ্য ও বিশেষণপদ সমবিভক্তিক হওয়া চাই; এস্থলে 'আদালতের' এই বিশেষ্যপদ সম্বন্ধবোধক ৬ষ্ঠ্যন্ত এবং 'অত্র' এই সর্ব্বনাম বিশেষণপদ অধিকরণবোধক ৭ম্যন্ত; সুতরাং ইহাদের পরস্পর অন্বয় হইতে পারেনা—'অত্র আদালতে'—বলিলে চলিত। (২) "অধীনী''—ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অধীনা হয়। (৩) "অলস''—ইহা বিশেষণ শব্দ; কিন্তু অনেকে ইহা বিশেষ্যবোধে প্রয়োগকরেন যথা 'তাহার অলস নাই' এস্থলে 'আলস্য নাই' হইবে। (৪) "আগত দিনে যাইব''—আ-পূর্ব্বক গম ধাতুর উত্তর অতীতকালে ত প্রত্যয় করিয়া 'আগত' পদ সিদ্ধ হইয়াছে; উহার অর্থ যাহা আসিয়াছে—যাহা আসিবে—নহে; কিন্তু যেদিন পরে আসিবে সেই দিনে যাইব, এই অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়, সুতরাং সে প্রয়োগ অশুদ্ধ; ঐ অর্থে 'আগামী দিনে যাইব' এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। (৫) "কায়া''—কায় শব্দ অকারান্ত পুংলিঙ্গ; আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ নহে। (৬) "একথা গ্রাহ্যযোগ্য নহে''—'গ্রাহ্য' এই পদের অর্থ গ্রহণযোগ্য, অতএব তৎসহ আবার 'যোগ্য' পদের প্রয়োগ অনাবশ্যক 'একথা গ্রাহ্য নহে' এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়।

(৭) "চন্দ্রিমা"—চন্দ্রিকা—চন্দ্রকিরণ—জ্যোৎস্না—এই অর্থে অনেকে চন্দ্রিমা শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু 'চন্দ্রিমা" এরূপ শব্দই নাই। (৮) "তৎকালীন সে ছিল না"—'তৎকালীন' এই পদ বিশেষণ, উহা বিশেষ্যসাপেক্ষ, কিন্তু উক্তরূপ বাক্যে উহার বিশেষ্য কেহ থাকে না; 'তৎকালে সে ছিল না' এই বলিলেই হয়। (৮) "দারা-সুত নাই"—অনেকের বোধ আছে যে 'দারা' শব্দে পত্নী বুঝায়, উহা আকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; 'দার' এই অকারান্ত পুংলিঙ্গশব্দের অর্থ পত্নী—দারপরিগ্রহ, পরদারহরণ ইত্যাদি প্রয়োগে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। (৯) "দাসী—দাস্যাঃ"—আদালতসম্পৃক্ত অনেক লোকেরই সংস্কার এই যে, শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোকের নামের পর 'দাসী' পদ থাকিলে তাহাকে সধবা এবং 'দাস্যাঃ' পদ থাকিলে তাহাকে বিধবা বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহা যে কিরূপ ভ্রম, তাহা অতি অল্পমাত্রও সংস্কৃতবোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। দাসী পদ কর্ত্তৃকারকবোধক প্রথমান্ত এবং দাস্যাঃ পদ সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠ্যন্ত, এতদ্ভিন্ন ঐ উভয়পদের অর্থগত আর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। যদি দাসী বলিলে 'সধবা' বুঝায়, তবে দাস্যাঃ বলিলে 'সধবা' ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইবে না, ফলতঃ এটী নিতান্ত স্থূল ভ্রম। "দেবী—দেব্যাঃ" "শ্রীমতী—শ্রীমত্যাঃ" ইত্যাদি স্থলেও অনেকের ঐরূপ ভ্রম আছে। (১০) "নিরাকরণ"—নির্ণয়রূপ অর্থবোধার্থ অনেকে নিরাকরণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; যথা 'এবিষয়ের এখনও নিরাকরণ হয়নাই' কিন্তু নিরাকরণ শব্দে নির্ণয়—মীমাংসা—বুঝায় না, উহার অর্থ দূরীকরণ—প্রত্যাখ্যান। বোধহয় 'সংশয়-নিরাকরণ' শব্দে সন্দেহভঞ্জন—মীমাংসা—বুঝায়, তাহা হইতেই ঐ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। (১১) "নিশি"—অনেক বিজ্ঞ লোকেও 'নিশির শিশির পড়ে' ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত নিশা শব্দের সপ্তমীর এক-

বচনে 'নিশি' পদ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু ' নিশি ' এরূপ শব্দ কুত্রাপি নাই, সুতরাং উহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'নিশির' এরূপ সম্বন্ধপদ হইতে প্যারেনা। (১২) "মনান্তর"—মনঃ+অন্তর—এই দুই পদের সন্ধি হইলে মনোন্তর হয়—মনান্তর হয়না, অতএব ' মনান্তর শব্দ অসাধু। (১৩) " যদ্যপিও "—সংস্কৃত অপি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ 'ও,' সুতরাং যদ্যপি শব্দের অর্থ যদিও, অতএব ঐ 'যদ্যপি'র উত্তর আবার 'ও' দেওয়া কেবল পৌনরুক্ত্য। যদ্যপিওর ন্যায় 'তথাপিও' 'অদ্যাপিও' ভ্রান্তপ্রয়োগ। (১৪) " যদ্যপি স্যাৎ সে ভাল হয়"—যদ্যপিস্যাৎ একেবারে অব্যয় পদ নহে, ' যদ্যপি ' অব্যয়—'স্যাৎ' সংস্কৃত ক্রিয়াপদ—উহার অর্থ ' হয় ' ; অতএব যদ্যপিস্যাৎ সে ভাল হয়—এই বাক্যকে অন্যরূপে বলিতে গেলে—যদ্যপি হয় সে ভাল হয়—এইরূপ হইয়া পড়ে। অতএব বাঙ্গালায় ' যদ্যপিস্যাৎ ' না বলিয়া ' যদ্যপি ' বলাই বিধেয়। (১৬) " সতীত্ব "—এই শব্দটী এক্ষণে বাঙ্গালায় বিস্তীর্ণরূপে প্রচলিত, কিন্তু ব্যাকরণানুসারে ইহা সাধুশব্দ নহে। সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সতী হয়, তাহার উত্তর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ঐ ত্ব পরেতে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীপ্রত্যয় ঈকারের লোপ হইয়া 'সত্ত্ব' পদ হইয়াপড়ে ; কিন্তু তাহাও শুনিতে ভাল লাগে না, এই জন্য চতুরেরা 'সত্ত্ব' 'সতীত্ব' এ উভয়েরই পরিহার করিয়া সতীভাব, সতীধর্ম্ম, পাতিব্রত্য ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐ অর্থের প্রকাশ করিয়াথাকেন। (১৭) সবিনয়পূর্ব্বক নিবেদন "—এই বাক্য এরূপে নাবলিয়া 'সবিনয়নিবেদন ' বা ' বিনয়পূর্ব্বকনিবেদন ' এই বলাই কর্ত্তব্য। কারণ সবিনয় ও বিনয়পূর্ব্বক বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন এই দুইটী পদ 'নিবেদন' এই পদের বিশেষণ হইতে পারে; সবিনয়পূর্ব্বক—ইহা কোনরূপে বিশেষণ হইতেপারেনা; উহার সমাস ও অর্থসঙ্গতি হয়না। (১৮) "সন্তানসন্ততি"—অনেকের বোধ আছে, সন্তান শব্দের অর্থ পুত্র এবং সন্ততি শব্দের অর্থ কন্যা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—ঐ দুই শব্দেরই

অর্থ পুত্রকন্যা উভয়। সংপূর্ব্বক তন ধাতুর উত্তর ঘণ্ প্রত্যয়করিয়া সিদ্ধ 'সন্তান' শব্দটী পুংলিঙ্গ, এবং ক্তি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 'সন্ততি' শব্দটী স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং শব্দদ্বয়ের লিঙ্গগত ভেদ ভিন্ন অর্থগত কোন ভেদ নাই। (১৯) 'সাক্ষী'—এইটী বিশেষণ বা ধর্ম্মিপদ—ধর্ম্মপদ নহে; এজন্য 'তিনি ইহাতে সাক্ষী আছেন' এরূপ বলাযায়, কিন্তু 'তাঁহাকে সাক্ষী দিতে হইবে' এরূপ বলাযাইতে পারেনা। ধর্ম্মপদ করিতে হইলে উহার উত্তর ভাবার্থপ্রত্যয় করিয়া সাক্ষিত্ব বা সাক্ষ্য করিতে হয়, যথা তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে ইত্যাদি। (২০) "সৌজন্যতা"—সুজন শব্দের উত্তর ভাবার্থক ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া সৌজন্য হয়, উহার অর্থ সুজনতা; অতএব ঐ সৌজন্য শব্দের উত্তর আবার ভাবার্থক তা প্রত্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই—সৌজন্য বা সুজনতা ইহার অন্যতর বলিলেই বক্তার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। বাহুল্যতা, গৌরবতা, লাঘবতা, দারিদ্র্যতা, সৌহৃদ্যতা, ইত্যাদি পদও ঐরূপ। (২১) "সৃজন"—এই শব্দটী এত প্রচলিত যে, ইহাকে অশুদ্ধ বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সৃজধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিলে কোনরূপেই 'সৃজন' পদ সিদ্ধ হয়না—'সর্জ্জন' হইয়াপড়ে, কিন্তু তাহা অব্যবহারনিবন্ধন ভাল শুনায় না। যাহাহউক, যখন্ সৃজন পদ অসিদ্ধই হইতেছে, তথন্ উহা প্রচলিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—বরং সৃজন ও সর্জ্জন উভয়েরই পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রভৃতি শব্দদ্বারা তৎস্থান পূরণ করা কর্ত্তব্য, অতএব "সৃজন করেছ তুমি করিছ পালন" এরূপ না বলিয়া "করিয়াছ সৃষ্টি তুমি করিছ পালন" ইত্যাদিরূপ বলাই ভাল। (২২) "সম্মত"—সং+মত এই দুই শব্দের সন্ধিতে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ং অনুস্বার স্থানে ম্ হইয়া সম্মত হয়—সন্মত হয়না। সন্মতি ও সন্মান এইরূপ অশুদ্ধ। (২৩) "সিঞ্চন"—এই পদ ব্যাকরণে সিদ্ধ হয়না সেচন হয়।

উক্তরূপ যে সকল অসাধু প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হইল, গবর্ণমেণ্টের আদালতসকলেই ইহাদের সমধিক প্রচলন; অতএব তথাকার কৃতবিদ্য মহাশয়েরা যত্নবান্ না হইলে এসকলের সংশোধনের উপায় নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমাদের প্রদর্শিত অসাধু-প্রয়োগ সকল কুশাগ্রমতি বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের কূটতাসাহায্যে সাধু করিতে না পারেন এমত নহে, কিন্তু চলিত ভাষায় ব্যাকরণের কূটতাযোজনা করিয়া অনার্ষ অপপ্রয়োগ রক্ষাকরা আমাদিগের অভিমত নহে। এই জন্যই আমরা ঐ সকলকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

উপসংহার।

আমাদিগের আরব্ধ পুস্তকখানি ক্রমে বহ্বায়ত হইয়াউঠিল, এজন্য এক্ষণে আমরা ৺জয়নারায়ণতর্কপঞ্চানন, শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্রশিরোমণি, তারানাথতর্কবাচস্পতি, ৺তারাশঙ্করভট্টাচার্য্য, ৺রামকমলভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমলভট্টাচার্য্য, গিরীশচন্দ্রবিদ্যারত্ন, হরিনাথন্যায়রত্ন, জগন্মোহনতর্কালঙ্কার, ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুগোপালচট্টোপাধ্যায়, ৺নীলমণি বসাক, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, লোহারাম শিরোরত্ন, মধুসূদনমুখোপাধ্যায়, ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিমাইচাঁদ শীল, দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো, ৺মুক্তারামবিদ্যাবাগীশ,

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্রচক্রবর্ত্তী, জয়গোপালগোস্বামী, হরিমোহনমুখোপাধ্যায়, শ্রীমন্তবিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকিশোরবন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরানাথ তর্করত্ন, হেমচন্দ্রভট্টাচার্য্য, সাতকড়িদত্ত, মধুসূদনবাচস্পতি, রামসদয় ভট্টাচার্য্য, হরানন্দভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্তবাবু শিবচন্দ্রদেব, ব্রজমোহন মল্লিক, দ্বারকানাথরায়, শিবনাথভট্টাচার্য্য, রাজকুমারসর্ব্বাধিকারী, হরিমোহনগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্রমজুমদার, রামনারায়ণমিত্র, সোমনাথমুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্রগুপ্ত, রাজনারায়ণবসু, নৃসিংহচন্দ্রমুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি বাঙ্গালাগ্রন্থরচয়িতা অনেকানেক মহাশয়দিগের বিষয়ে এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলবিষয়ে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। যদি শরীর সুস্থ থাকে—যদি পাঠকদিগের অনুরাগ দেখিতে পাই—যদি সাহস পাই—তবে এবিষয়ে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিব—নচেৎ এই পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৯	৭	সাজ	সমাজ
২২৪	১৯	বসরাঙ্ক	বসরাজ
২২৯	১৪	অহরৎ	অর্হৎ
২৩০	২৭	তথই	তখনই
২৩২	৬	তিনিও বিধবা হইয়া অনেক দিন	তিনিও অনেক দিন
১২৩	১৪	খনিত	নিখাত
২৩৪	১০	বয়ক্রম	বয়ঃক্রম
ঐ	১৭	১৭৪৬	১৮৪১
২৮৭	৪	ময়ূরক্ত	ময়ূরতক্ত
২৮৮	২৩	সত্ব	স্বত্ব
ঐ	ঐ	গর্ণ	গবর্ণ
৩৩৭	২২	অনুসরণ	অনুমরণ
৩৬২	১০	প্রভৃতির	প্রভৃতি

রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি

এই স্থলে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে
উৎকীর্ণ একটী দেবীমূর্ত্তি কীলক-
দ্বারা সম্বদ্ধ আছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্‌যস্য মণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োহঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপ-ভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ॥ ১॥

আনন্দাম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যান্তিকী-
রুদ্ধাবেহতমোহতারতিপতাবেবাহ মেবেতিধীঃ। (?)
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ-
ত্যত্রের্ধ্যানপরস্য বা পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাংমুদে॥ ২॥

সেবাবনতনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্ ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধনাথবংশে॥৩

আকৌমারবিকস্বরৈর্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ-
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী-
শালিশ্লাঘাবিপাকপীবরগুণ স্তেস্য মভূদ্বংশজঃ॥ ৪॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ র্যশোভিঃশোভন্তেপরিধিপরি
[ণদ্ধাঃ করদিশঃ। (?)
ততঃকাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরীপরীতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়-
[সেনঃ স বিজয়ী ॥ ৫ ॥

প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদা মনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সন্ধ্যামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতি রভূ দ্বল্লালসেন স্তুতঃ।
যশ্চেতো যমমেব শৌর্য্যবিজয়ী দত্তোৎষধং তৎক্ষণা
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগণাভোগপ্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুস্মাক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ (?)
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥ ৭ ॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধবীরান্মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেনপাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম বীরসিংহপরম স্তম্ভাবক মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজন্যক-রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিক্ষত অন্তর দুর্ভয়দ পরিক মহাক্ষপাটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীঠপতি মহাগণপ দৌঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাঘৃতরুগৌল্মিক দণ্ডপানিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽক্ষধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চড়ভচ্ছজাতীয়ান্ জানপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ। মত মস্তু ভবতাম্—যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্তকান্তঃপাতিনি খাড়ীমণ্ডলিকান্তল্লপুরচতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিকপ্রভাসশাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশব গড়োলীভূমী সীমা—ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ শ্রীমদুগ্রমাধবপাদীয়স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাঙ্গুলাধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিতা ন্মানেনাবস্তয়া সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যান্মানোত্তর খাববক-সমেত ভূদ্রোণত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎপুরাণোপত্তিকঃ সবাস্তুচিহ্নঃ মেগুলগ্রামীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ সমাটবিষ্টঃ সজল স্থলঃ সগ-

লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত সনন্দের প্রতিলিপি।

স্তোদরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সক্ষদশাপবাধঃ পরিহৃতসর্ব্বপীড়োঽচড় ভচ্ছপ্রবেশোঽকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য স্তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তঃ জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যসগোত্রায় অঙ্গিরো বৃহস্পতি শিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্যাগারিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যা-চন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রান্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ, সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং—ভাবিভিরপি নৃপতিভি রপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎপালনীয়ম্। ভবন্তিচাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। ভূমিং যঃপ্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌপুণ্যকর্ম্মাণৌনিয়তং স্বর্গগামিনৌ ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমি ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ কতিকমলদলাম্বু বিন্দুলোল মিদমনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকলমি দমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্বা নহিপুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌণী ভানু সান্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্র বাধিনা রঙ্করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সংঽমাঘদিনে ১০ মানে মতাসাতিঃ॥